নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৬৪ সাল
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীঅজিত কুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯।

ভার্যাং মনোরমাং মনোবৃত্ত্যানুসারিণীম্

লেখকের অন্য বই

শংকর-নর্মদা

মন মধুকর

আবার নর্মদা

বাণী বারকরী

খাজুরাহো চন্দেল্লস্মৃতি

১

এতো বিরাট অগ্নিকাণ্ড স্মরণকালের মধ্যে কখনো ঘটে নি। এমনি সর্ব-ধ্বংসী বহ্ন্যুৎসব। প্রকৃতির খেয়ালে নয়, দৈব দুর্বিপাকে নয়। মানুষের হাতে, মানুষের ইচ্ছায়।

ছাই হলো নগর, ছাই হলো প্রাসাদ। দাউদাউ আগুনে ভস্ম হলো বিরাট রাজ্য, বিশাল সংস্কৃতি। মানুষই শেষ করল মানুষকে, মানুষের মহান সৃষ্টিকে। একটি মানুষও আর রইল না। হয় ডুবল রক্তের বন্যায়—না হয় আগুনের অঙ্গারে। বাকি সব পালিয়ে আত্মগোপন করল চক্র-বালের অন্ধকারে। লেলিহান অগ্নিশিখা সমস্ত মাটিকে দগ্ধ করে দূর আকাশের দিকে রক্তাক্ত জিহ্বা মেলে দিল, দিগন্তের তারারা আতঙ্কে কাঁপতে লাগল থরথর করে।

স্বর্ণপ্রসবিনী ধরিত্রীর শ্যামল আঁচল। সুনীল সমুদ্রের তীরে সোনালি বেলাভূমি। একদিকে গম্ভীর পাহাড়ের অরণ্যসানু—অন্যদিক থেকে একটি স্নিগ্ধ নদী বয়ে এসে সমুদ্রে মিশেছে। পর্বত-শিখর যেন পিতা আর মা জননী যেন স্রোতস্বিনী। তাদের মাঝখানে স্নেহক্রোড়। হরিৎ-হলুদের আদর ভরা উপত্যকা।

কালের কোন্ অজ্ঞাত প্রত্যূষে এই সুন্দর উপত্যকায় বসবাস শুরু করেছিল এক সুন্দর ও বীর্যবান মানবগোষ্ঠী। অদম্য শক্তি দিয়ে তারা এই উপত্যকাকে কেন্দ্র করে গড়েছিল এক সংহত রাষ্ট্র। আর সমুদ্রের তীরে গড়েছিল এক শোভন নগর। সেই নগরে কতো প্রাসাদ, কতো হর্ম-অট্টালিকা, কতো দেবমন্দির।

সমুদ্রের নাম ঈজিয়ান, নদীর নাম স্ক্যামাণ্ডার, নগরের নাম ট্রয়। এশিয়া

মাইনরের পশ্চিম উপকূলে। সেই ট্রয় কতো সমৃদ্ধ ছিল কতো মহান ছিল ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না। ট্রয়ের রাজকোষ সর্বদা ধনরত্নে উপছে পড়ত, ট্রয়ের রাজপ্রাসাদে প্রতিদিন উৎসবের মুখরতা, ট্রয়ের মন্দিরে মন্দিরে দিনরাত দেবতার পূজারতি। দেশবিদেশের রাজারা ট্রয়ের আতিথ্যলাভের জন্যে ব্যাকুল হতো, সাগরপারের বণিকরা রাজার হাতে মহার্ঘ উপঢৌকন তুলে দিয়ে ট্রয়ের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কে ধন্য হতো। ট্রয়ের পুরুষরা ছিল যেমন সমর্থদেহী বীর, মেয়েরা ছিল তেমন সুন্দরী আর কোমলাঙ্গী। ট্রয়ের কাননে ফুটত সবচেয়ে মধুগন্ধ ফুল, ট্রয়ের পাখিদের গানে সবচেয়ে মধুচ্ছন্দ সুর।

প্রাচীন এশিয়া মাইনরের মানচিত্রে একটি দেশের নাম খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়। দেশটির নাম ফ্রিজিয়া। ট্রয় ছিল এই ফ্রিজিয়াবাসীদের রাজধানী। রাজধানীর নামেই রাজ্যের নাম ট্রয়। প্রজাদের নাম ট্রয়ান বা ট্রোজান। এশিয়া মাইনরে আরো অনেক রাজ্য ছিল—তাঁরা প্রত্যেকে ট্রয়কে ভয় করত, ভক্তিও করত। তার কারণ শক্তিমান হয়েও ট্রয় ছিল সকল প্রতিবেশী রাজ্যের বন্ধু। আশপাশের কোনো প্রতিবেশী রাজ্যের ওপর ট্রয় কোনোদিন অত্যাচার করে নি—পরের দেশ কাড়তে চায় নি। বরং সে তার সমৃদ্ধিকে বিলিয়েছে, তার সংস্কৃতিকে ছড়িয়েছে। সেই সোনার শহর ট্রয়কে কেউ আর কখনো খুঁজে পাবে না। ট্রয় কোথাও নেই—শুধু আছে স্বপ্নে আর কল্পনায়। কাব্যে আর গল্পে।

কোথায় গেল ট্রয়?

লালয়িত্রী ঈজিয়ান সমুদ্র। তার দুপারে দুই জাতি। মায়ের কোলের দুপাশে দুটি সন্তানের মতো। পূর্ব তীরে ফ্রিজিয়ান আর পশ্চিম তীরে এখিয়ান। একই সমুদ্রের ঢেউ পূর্ব-পশ্চিমের দুই তটে এসে লাগে—তেমনি দুই জাতি একই সংস্কৃতির কোলে মানুষ। একই রকম ভাষা, একই সভ্যতা। একই ধর্ম, একই বিশ্বাস, একই দেবতার পূজা। কিন্তু দুই তীরের বাঁশি একই সুরে বাজল না।

পশ্চিমের দেশের নাম গ্রীস—এখিয়ানদের বাসভূমি। নানা রাজ্যে ভাগ করা। সে সব রাজ্য থেকে বাণিজ্যতরী এপারে আসে—ট্রয়ের সমুদ্র-তীরে নোঙর ফেলে। শুধু ধনপতি শ্রেষ্ঠীরা নয়, রাজ্যপতিরাও আসেন। ট্রয়ের প্রাসাদে আতিথ্য নেন। অর্ণবপোত ভেসে ভেসে এপার ওপারের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে।

একদিন ওপার থেকে সহস্র জাহাজ পুবদিকে যাত্রা করল। বাণিজ্য-পোত নয়—রণতরী। তরী ভরা পণ্যদ্রব্য নয়—মারণাস্ত্র। নিরীহ বণিকের সাগরযাত্রা নয়—অভিযাত্রীর সমর-অভিযান। লক্ষ্য ট্রয়।

ট্রয়ের তীরে এসে গ্রীক রণতরীর দল ভিড়ল। একে একে নোঙর ফেলল। সোনালি সমুদ্রবেলা শত্রুর ভিড়ে ভরে গেল। সেনাপতিদের শিবির বসল, সৈন্যদের তাঁবু পড়ল। সামনে ট্রয় নগরী—চারদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ঐ প্রাচীর চূর্ণ করতে হবে। ধ্বংস করতে হবে ট্রয়।

প্রাচীরের তোরণ শিখর থেকে গ্রীকদের নৌবাহিনী আর রণসম্ভার লক্ষ্য করলেন ট্রয়ের রাজা। তিনি স্থিতধী, প্রাজ্ঞ, শান্ত তাঁর চরিত্র। এই অভিযানের উদ্দেশ্য বুঝতে তাঁর দেরি হলো না। সেনাপতিদের আদেশ দিলেন—

যুদ্ধ করো, ছারখার করে দাও ঐ বিদেশী শত্রুদের, আগুনে পুড়িয়ে দাও ওদের প্রত্যেকটা জাহাজ!

তোরণদ্বার খুলল। নগর থেকে সাগরবেলায় ছুটে এলো ট্রয়ের যোদ্ধারা। যুদ্ধ শুরু হলো।

সেই যুদ্ধ একদিনে শেষ হলো না—চলল দীর্ঘ দশ বছর ধরে।

এখিয়ানরা এসেছিল দল বেঁধে, গ্রীসের সব রাজ্য একজোট হয়ে। প্রত্যেক রাজ্য থেকে জোগাড় হয়েছিল সৈন্য আর যুদ্ধের রসদ। সব নগরের সব বীর একই প্রতিজ্ঞা করেছিল। হাজার রণতরী ভাগ ভাগ করে দিয়েছিল সব রাজারা। ঈজিয়ান সমুদ্রের দ্বীপরাজ্যগুলোও ওদের সব রকমে সাহায্য করেছিল—জাহাজ দিয়ে সৈন্য দিয়ে রসদ দিয়ে।

ওদের এই সম্মিলিত অভিযান সাগরপারের একটি মাত্র রাজ্যের একটি মাত্র নগরের বিরুদ্ধে।

তাই বলে ট্রয় ভয় পায় নি, ট্রয় মাথা নিচু করে নি, হীন সন্ধি-প্রস্তাব মেনে নিয়ে কাপুরুষের মতো নিজের পিঠ বাঁচায় নি। বুক ফুলিয়ে যুদ্ধ করেছে দশ বছর ধরে। কেননা ট্রয়েরও ছিল অমিত শক্তি। দেশপ্রেমিক বীর যোদ্ধার অভাব ছিল না তার। অভাব ছিল না রক্ষীদের আর সৈন্যসামন্তের। কিছু কিছু বন্ধুরাষ্ট্রের অকৃত্রিম ভালবাসাও ট্রয় পেয়েছিল শেষ দিন পর্যন্ত।

ট্রয়ের সবচেয়ে বড়ো শক্তি তার পাথরের প্রাচীর। সে প্রাচীর মানুষের তৈরি নয়, দেবতার হাতে গড়া। অতুলনীয় তার দৃঢ়তা। মানুষের তো দূরের কথা, দেবদানবেরও সাধ্য নেই ঘা মেরে তার এক টুকরো পাথর খসাবার। সেই প্রাচীরের পাহারাকে অতিক্রম করে নগরের মধ্যে এক পা বাড়ানো অসম্ভব।

তাই ন-বছর ধরে গ্রীক-ট্রোজানের যতো লড়াই তা হলো প্রাচীরের বাইরে—সমুদ্রতীরে। নগরের একটি ইঁটকাঠে কারুর আঙুল ছোয়ানো অসম্ভব—যতো দাপট নগরের বাইরে। সমুদ্রবেলায় আর গ্রামাঞ্চলে দুর্বল নিরস্ত্র মানুষের উপর অত্যাচার। আশেপাশের নিরপেক্ষ রাজ্যেও হামলা। গ্রীকরা লুটপাট করল নিরীহ প্রজাদের গ্রাম আর জনপদ, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করল তাদের ঘরবাড়ি, তছনছ করল তাদের চাষের খেত।

ট্রয়ের রাজশক্তি প্রাচীরের আড়ালে লুকিয়ে বসে থেকে হামলাবাজদের কাণ্ডকারখানা সহ্য করতে পারে না। তাই মাঝে মাঝে ট্রয়ের যোদ্ধারা বেলাভূমিতে ছুটে এসে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দারুণ লড়াই হয় দুপক্ষে। কিন্তু সে রকম লড়াইতে যুদ্ধ শেষ হয় না।

ট্রয়ের তোরণদ্বারের সামনে ওৎ পেতে ন-বছর বসে রইল গ্রীক সৈন্যরা। তারপর আসল যুদ্ধ শুরু হলো দশম বৎসরে। আর অপেক্ষা করা

চলে না—মিটমাটের কোনো আশাই আর নেই। তাই গ্রীকরা পাকা করল অবরোধ। লক্ষ্য ট্রয়ের পতন। ট্রয়ের যোদ্ধারাও ঝাঁপিয়ে পড়ল সম্মুখ যুদ্ধে। ঐ অবরোধ ভাঙতে হবে। তাদের নোঙর-ফেলা জাহাজ সমেত ঐ গ্রীক শত্রুদের ঝাঁটিয়ে বিদেয় করে দিতে হবে সামনের সমুদ্র-তীর থেকে।

দশ বছর পরে শেষ পর্যন্ত ট্রোজানরা হারল—বলে নয়, ছলে। ছলের সুযোগে এক সর্বনাশা রাত্রে সকলের অগোচরে ট্রয়ের সিংহদ্বার গ্রীকরা খুলল। ঘুমন্ত পুরী—শত্রুকে বাধা দেবার জন্যে কেউ জেগে নেই। নিশ্চিন্ত নিদ্রায় প্রত্যেকটি নগরবাসী অভিভূত।

তারপর যা হবার তাই হলো। দশ বছর অপেক্ষার পর প্রতিটি গ্রীক দস্যু স্বর্গ হাতে পেয়েছে—জয়ের স্বর্গ, সাফল্যের স্বর্গ। স্বর্গকে জয় করেছে নরক—হিংসার নরক, নৃশংসতার নরক। করায়ত্ত স্বর্গকে এবার চূর্ণ করতে হবে নারকীয় বীভৎসতায়।

ট্রয়ের প্রতিটি গৃহে গ্রীকরা আগুন লাগাল—প্রতিটি প্রাসাদে, প্রতিটি মন্দিরে। প্রত্যেকটি পুরুষকে হত্যা করল—আর্ত বৃদ্ধকে খুন করল দেবতার প্রাঙ্গণে, শিশুকে ছুঁড়ে মারল মায়ের চোখের সামনে। জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করল বন্দীদের—আর শিকলের বাঁধনে নারীদের করল বন্দিনী। পরাজিত প্রাচীর আর মাথা উঁচু করে রইল না—ভেঙে পড়ল খানখান হয়ে।

রক্তে লাল ট্রয়ের মাটি, আগুনে লাল ট্রয়ের আকাশ। বন্দিনী নারীদের নিয়ে গ্রীকদের রণতরী যখন আবার নিজের দেশে যাত্রা করল—তখন শুধু একটি নগর নয়, একটি সভ্যতা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

এ যুদ্ধ কেন হয়েছিল? কেন ধ্বংস হলো ট্রয়—শ্মশান হয়ে গেল চিরদিনের মতো?

ইতিহাসের পাতা হাতড়ে বেড়াও—এ প্রশ্নের কোনো উত্তর পাবে না।

ইতিহাস মহান্ সাক্ষী। ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে কতো সভ্যতার উত্থান পতন, কতো রাজ্যের ভাঙাগড়া, কতো জয়োচ্ছ্বাস, কতো সর্বনাশ। ইতিহাস কতো কিছু মনে রাখে।

কিন্তু যা ঘটে গেছে ইতিহাসেরও আগে? ইতিহাস যখন জন্ম নেয় নি মানুষের মস্তিষ্কে? তখনকার ঘটনা আর চেতনা পুঞ্জিত থাকে কোথায়? মানুষের হৃদয়ে। ভাবনার নিভৃত মুক্তোর মতো হৃদয়ের সমুদ্র-গভীরে। পুরাণে আর মহাকাব্যে, শ্লোকে আর গাথায়। আত্মবিস্মৃত জাতি যদি বা ইতিহাসকে ভুলে যায়, পুরাণকে ভোলে না। তার আদিম প্রতীতি আর সংশয়, আদিম বেদনা আর দ্যোতনা চিরসঞ্জীবিত থাকে পুরাণের কোলে। মানুষের মস্তিষ্ক অনেক কিছু মনে রেখেছে আবার অনেক কিছু ভুলেছে। ইতিহাস এক যুগে যে ঘটনাকে পরম সম্পদ বলে আঁকড়ে ধরেছে, অন্য যুগে তাকে বিসর্জন দিয়েছে হেলায়। কিন্তু হৃদয় ভোলে না। ট্রয় যুদ্ধ ইতিহাসে নেই– ট্রয় যুদ্ধের পুরাণস্মৃতি মানুষের হৃদয়ে চির-অম্লান।

যুদ্ধ প্রকৃতির বিরোধী। প্রকৃতি ফুল ফোটায়, ফুলকে ঝরায়। ডাল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তার পাপড়িগুলিকে কুচিকুচি করে ছেঁড়ে না। প্রকৃতি ধ্বংস করে না, হত্যা করে না, তার নিজের সৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধ করে না। যুদ্ধ করে মানুষ—ধ্বংসের জন্যে, হত্যার জন্যে।

মানুষে মানুষে যেমন হানাহানি, রাজ্যে রাজ্যে জাতিতে জাতিতেও তেমনি। তোমাকে আমার পছন্দ হয় না, সুবিধা পেলে তোমাকে আমি দেখে নেব। তোমার ওপর আমার রাগ, সুযোগ পেলে সেই রাগের ঝাল আমি মিটিয়ে নেব। তোমার দেশে মাটির নিচে সোনা আর মাটির বুকে সোনার ফসল, একটা অছিলা করে তোমার ওপর চড়াও হব। সাধের সম্পদ তোমার হাত থেকে ছিনিয়ে এনে ভরব আমার রাজকোষে। সঙ্গে বিশাল বাহিনী আর মনে দিগন্ত ছোঁয়া অভীপ্সা নিয়ে ছুটে যাব দূর-দূরান্তে, জয় করব রাজ্যের পর রাজ্য।

মাথায় পরব সম্রাটের জয়মুকুট। কিংবা হয়তো সাগরপারে এক পর-দেশের হাটে গুটি গুটি গিয়ে মানদণ্ডটি হাতে নিয়ে বণিক সেজে বসব। পোহালে শর্বরী সেই মানদণ্ড ভীম-ভয়ঙ্কর রাজদণ্ডে পরিণত হবে।
কিন্তু এমনি কোনো কারণের ইঙ্গিত পুরাণ দেয় না। পুরাণ বলে অন্য কথা। গ্রীসের সহস্র রণতরী কেন ভেসেছিল সমুদ্র জলে ? অস্ত্রে বর্মে সজ্জিত হয়ে কেন অগণিত গ্রীক সৈন্য গিয়েছিল পরপারের অদেখা অজানা রাজ্যে ? দশ বছর ধরে মরে মরে যুদ্ধ চালিয়ে কেন শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করেছিল সোনার ট্রয় ?
সোনার জন্যে নয়, রাজ্যের জন্যে নয়।
একটি মুখের জন্যে।
ট্রয়বাসীরাও কেন বা যুদ্ধ করেছিল দশ বছর ধরে ? সন্ধি করেনি, ভয় করেনি, চরম সর্বনাশের মুখেও আত্মসমর্পণ করেনি ? নৃশংস তাণ্ডবের প্রতিরোধে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে কেন মৃত্যুবরণ করেছিল শেষ পর্যন্ত ? কেন তাদের সোনার নগরের চিহ্নটুকু মুছে গিয়েছিল ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ?
একটি মুখের জন্যে।
ঐ মুখ হেলেনের।

২

ট্রয় যুদ্ধের কাহিনী এক বিরাট মহীরুহের মতো। মূল কাহিনীকে ঘিরে অসংখ্য উপকাহিনী—ঠিক যেন মহীরুহের মহাকাণ্ড ঘিরে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা। যুগ যুগ ধরে কতো চারণ মূল কাহিনীর সঙ্গে কতো শাখা কাহিনী যুক্ত করেছেন, কতো কবি নাট্যকার তাঁদের কল্পনাকে মিশিয়েছেন। কতো ভাস্কর পাথর কেটে সৃষ্টি করেছেন কতো অনুপম মূর্তি, কতো চিত্রকর রং-তুলিতে এঁকেছেন কতো বিমোহন চিত্র। সাহিত্য ও শিল্পের যুগল ধারায় ট্রয় কাহিনী যুগ যুগ ধরে উৎসারিত, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভরে রসাস্বাদন।

কিন্তু যে অঙ্কুরে এই মহীরুহের সৃষ্টি—তার বুকে বাস্তব সত্য কি কিছু আছে? হাল আমল পর্যন্ত ইতিহাসবেত্তারা ট্রয় যুদ্ধকে বাস্তব বলে মেনে নিতে দ্বিধা করেছেন—প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকদের রচনায় এই পৌরাণিক ঘটনার উল্লেখ থাকলেও। পুরাণের স্বপ্ন-প্রাসাদে ট্রয় যুদ্ধ চির-আসীন, কিন্তু ইতিহাসের বাস্তব কক্ষে তার আশ্রয় কই?

পুরাণের আকর্ষণ নিত্যকালীন ও সর্বজনীন। প্রতি সভ্য জাতির নিজস্ব পুরাণ আছে। পুরাণে আছে সে জাতির বিস্ময় ও প্রতীতির, ধ্যান ও ধারণার, প্রতিজ্ঞা ও মূল্যবোধের সশ্রদ্ধ সঞ্চয়। কোনো কোনো জাতির বুকে জন্ম নিয়েছেন মহাকবি—তাঁরা পুরাণের শ্রেষ্ঠ রত্নগুলি চয়ন করে তা নিয়ে গ্রন্থন করেছেন মহাকাব্য।

ইউরোপীয় সভ্যতার জন্মভূমি গ্রীস। গ্রীসদেশের প্রাচীন পুরাণ সারা ইউরোপের সাংস্কৃতিক সম্পদ। হোমারের দুই মহাকাব্য ইলিয়াড আর অডিসি প্রতীচ্য মনের চিরকালীন অনুপ্রেরণা।

আমাদেরও পুরাণ আছে। গ্রীসের মতো আমাদেরও আছে দুই মহাকাব্য—রামায়ণ আর মহাভারত। এই দুই মহাকাব্য ভারত-ভাবনার মহাকোষ। ভারতের চিরন্তন আদর্শ এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে নিহিত। গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াডের কাহিনীর মূলে গ্রীক-ট্রোজানের যুদ্ধ। আমাদের দুই মহাকাব্যের পটভূমিও যুদ্ধ—রাম-রাবণের আর কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ।

মহাকাব্যের এই সব যুদ্ধকাহিনী নিয়ে ইতিহাসের অধ্যায় রচনা করতে পণ্ডিতদের দারুণ দ্বিধা। ইতিহাসের বিজ্ঞানী পথিকৃৎ থিউকিডিডেসই দ্বিধার প্রাচীর খাড়া করে দিয়ে গেছেন। তিনি ঘোষণা করে গেছেন—ইতিহাসে নারীর স্থান নেই, দেবতার স্থান নেই, কেন না নারী আর দেবতা দুইই বিচারবুদ্ধিহীন। ইলিয়াড আর রামায়ণ—দুই-এরই কাহিনী আবর্তিত হচ্ছে নারীর ভাগ্য নিয়ে। ট্রয় যুদ্ধের প্রত্যেকটি ভবিতব্যের মূলে দেবতাদের কলকাঠি। আর লঙ্কা যুদ্ধে যিনি জিতেছেন—তিনি নিজেই তো অতিমানব, নররূপী নারায়ণ।

ঐতিহাসিকের পক্ষে ট্রয় যুদ্ধকে মেনে নেওয়ার সবচেয়ে বড়ো বাধা ছিল—ট্রয় কোথাও নেই। ট্রয় অভিযানে গ্রীসের যে রাজ্য ছিল পুরোধা—সেই মাইকেনি রাজ্যও কোথাও নেই। পৃথিবীতে কোথাও কোনো চিহ্ন নেই এ দুটি স্থানের। কল্পনার মানচিত্রেই ওদের অবস্থিতি।

আর লঙ্কা?

সোনার ট্রয়ের মতো স্বর্ণলঙ্কা তো ধ্বংস হয় নি। আগুনে পোড়ে নি রাবণের রাজধানী আর প্রাসাদ। হনুমানের ল্যাজের আগুনে একটু আধটু কালিঝুলি মাখলেও রাবণবধের পর রামের হাতে লঙ্কাপুরীতে আঁচড়টি লাগে নি।

সে স্বর্ণলঙ্কা কোথায় ছিল? কোথায় গেল? প্রত্নতাত্ত্বিকরা যার কোনো হদিস পান না—ইতিহাস তাকে খুঁজে আনবে কোথা থেকে?

ছাত্র হিসেবেই স্লীম্যানকে গ্রীক মহাকাব্য পড়তে হয়েছিল, হোমারের ইলিয়াড ছিল তাঁর পাঠ্য পুস্তক। তবে গ্রীক ভাষায় নয়—গ্রীক তখন তিনি জানতেন না—পড়েছিলেন জার্মান অনুবাদে ছাত্রবোধ্য সংস্করণে। ছাত্ররা পড়ার বইকে সাধারণত কুইনিনের মতো দেখে—এ ছাত্রটি কিন্তু ইলিয়াডের প্রেমে পড়ে গেল। কিশোর কালের প্রেম, যার ছাপ সারা জীবনেও মোছে না।

পুরো নাম হাইনরিখ স্লীম্যান—জন্ম ১৮২২ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর মেকলেনবার্গ অঞ্চলের এক ছোট জনপদে। বাপ ছিলেন ধর্মযাজক—দরিদ্র হলেও সুশিক্ষিত—বিশেষ করে গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যে। প্রাচীন পুরাণের নানান কাহিনী বাবার কাছে স্লীম্যান শুনেছিলেন, বাবার আলমারি থেকে নামিয়ে অনেক ছবির বইএর পাতা উলটিয়েছিলেন। ছেলেবেলাতেই ইলিয়াড অডিসির কাহিনী কণ্ঠস্থ।

কিন্তু ইতিহাসের পাতায় ট্রয় যুদ্ধের কোনো কথা নেই। ট্রয় যুদ্ধ কবে হয়েছিল? কোন্ দেশে, কোন্ সমুদ্রতীরে? প্রত্নতাত্ত্বিকরা নীরব কেন? ইতিহাস মূক কেন? ট্রয় কোথায়? সত্যিই কি ট্রয় কোথাও ছিল?

এইসব প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল কিশোর স্লীম্যানের মনে। মনে মনে ভেবেছিলেন, নিশ্চয়ই ছিল—নিশ্চয়ই আছে ট্রয়। কালের ঘোমটার আড়ালে। সেই ঘোমটা আমি খুলব, ট্রয়ের মুখ আমি দেখব।

সংকল্প নয়, প্রতিজ্ঞা নয়—দিবাস্বপ্ন। স্বপ্নে দেখা নগর আর প্রাচীর, স্বপ্নে দেখা সমুদ্রতীর, নোঙর ফেলা শত শত জাহাজ—স্বপ্নে দেখা ঘোর লড়াই আব ধ্বংসতাণ্ডব। দাউদাউ আগুনের শিখার মধ্যে স্বপ্নে দেখা হেলেনের মুখ।

বালক বয়সে দেখা এমনি স্বপ্ন উত্তরকালে মিলিয়ে যায়। বিশেষ করে অবস্থার ফেরে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে এক মুদীর দোকানে শিক্ষানবিশী করে যার কর্মজীবনের শুরু। স্লীম্যানের পক্ষে মিলিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল।

আঠারো বছরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ঘরছাড়া। কাজের খোঁজে হামবুর্গ বন্দরে। ভাগ্যের টানে সেখান থেকে দেশছাড়া। হল্যাণ্ডের সমুদ্রতীরে আমস্টারডাম শহরে আশ্রয়। সেখানে কোনো এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে একটা চাকরি জোগাড় করে শহরের এক কোণে একটা খুপরি ভাড়া করে বাসা বাঁধলেন স্লীম্যান।

সারাদিন কাজ—আর সন্ধ্যেবেলা খুপরিতে ফিরে গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশুনো। একলা ঘরে বসে নিজে নিজে নানান দেশের ভাষা শেখা। যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন তাদের ছিল দেশে দেশে মাল রপ্তানির ব্যবসা। ভাষাবিদ কর্মচারীর উন্নতির সুযোগ। একে একে ডাচ, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান আর পর্টুগিজ ভাষা স্লীম্যান শিখলেন। তাছাড়া জার্মান তো মাতৃভাষা। বিদেশী ভাষায় চিঠিপত্র লেখার কাজ পেলেন স্লীম্যান। তারপর শিখলেন রাশিয়ান ভাষা। মালিকের কাছে খাতির আরো বেড়ে গেল।

ক-বছরে ব্যবসার কলকাঠিও স্লীম্যানের হাতের মুঠোয়। এবার চাকরি ছেড়ে নিজের ব্যবসা শুরু করলেন স্লীম্যান। রাশিয়ান ভাষাটা খুব কাজে লাগল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে মিলিটারি কনট্র্যাক্টে অনেক টাকা কামালেন। এবার ইংরেজি ভাষা শেখার পালা। আমদানি রপ্তানি শুরু করলেন অ্যামেরিকার সঙ্গে।

এতোদিনে সমুদ্রপারের দূর বিদেশে পাড়ি দেবার সময় এলো। তখন অ্যামেরিকায় সোনার খনির হদিস পাওয়া গেছে। দুনিয়ার লোক তখন সোনার খোঁজে নব মহাদেশে ছুটছে। স্লীম্যানও ছুটলেন। সোনার খনি না পেলেও অ্যামেরিকার সোনার ধুলোয় জুটল সোনার ভাগ্য।

কয়েক বছরে বিপুল সম্পদের মালিক হলেন স্লীম্যান। চল্লিশের কোঠা পার হতে না হতেই স্থির করলেন—আর না, অনেক রোজগার করেছি। এবার খরচ করতে হবে।

কী করে খরচ করব ? কী ভাবে ব্যয় করব জীবনের বাকি বছরগুলি ?

কেন ? মন তো স্থির করাই আছে। খুঁজব ট্রয়কে—সন্ধান করব কিশোর কালের স্বপ্নপ্রেয়সীর।

ইতিমধ্যে কবে গ্রীক ভাষা শিখেছেন স্লীম্যান। শুধু আধুনিক গ্রীক নয়—প্রাচীন গ্রীক। যে ভাষায় হোমারের লেখা। হোমারের ভাষায় শব্দের পর শব্দ বাক্যের পর বাক্য মিলিয়ে পড়লেন ইলিয়াড আর অডিসি। এই দুই মহাকাব্যের ভৌগোলিক বর্ণনাগুলি দিনের পর দিন ধরে বিচার করলেন।

তারপর একদিন ব্যবসা বাণিজ্য গুটিয়ে কাজকর্ম সব ছেড়ে কৈশোরের প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্যে বার হলেন নিরুদ্দেশ যাত্রায়।

তখন স্লীম্যানের বয়েস ছেচল্লিশ।

৩

নিজের অতীতকে অনুসন্ধান করা মানুষের স্বধর্ম, এ প্রজন্মের মানুষ তার পূর্ব প্রজন্মের খবর জানতে চায়,—সেই জানার মধ্যে দিয়ে সে তার আত্মবিকাশের ধারাকে অনুসরণ করে। নদী যেন ফিরে যেতে চায় উৎসমুখে। তেমনি মানুষ সন্ধান করে তার পিছনে ফেলে আসা পথকে —সময়ের উজানে ইতিহাসের তরীতে চেপে।

কিন্তু মানব সভ্যতার বিবর্তনের সামান্য অংশই ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। লিখিত ও বোদ্ধ ভাষায় যা কিছু লেখা হয়েছে তাই ইতিহাসের মুখ্য অবদান। কিন্তু যখন অক্ষর ছিল না, লিপি ছিল না? বা এমন সব অক্ষর বা সংকেত ছিল যা আমরা পড়তেই পারিনে? ইতিহাসের সূচনার হাজার হাজার বছর আগে থেকে মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করে আসছে। সেই মানুষের খবর পাওয়া যাবে কেমন করে? সেই ইতিহাস-পূর্বতন মানুষের জীবনযাত্রার হদিস যাঁরা করেন তাঁরা প্রত্নবিদ। মানুষের প্রাণ আছে বলেই সে মরণশীল, তার রক্ত-মাংসের দেহাবশেষ কদিন যেতে না যেতেই নিঃশেষ হয়ে যায়। বড়ো জোর স্থায়ী হয় তার কঙ্কাল-করোটি। আর নিষ্প্রাণ বলেই স্থায়িত্ব লাভ করে তার জিনিসপত্র, তার অস্ত্র, তার যন্ত্রপাতি, অলঙ্কার, তৈজস, গৃহ, মন্দির, সমাধি। হাজার হাজার বছর ধরে টিকে থাকে মাটির কন্দরে, অরণ্যের অন্ধকারে, সমুদ্রের গভীরে। সেই সমস্ত স্থাবর বস্তু খুঁড়ে খুঁড়ে বার করেন প্রত্নবিদরা। প্রত্নতত্ত্বের আলোয় মানুষের অজানা যুগের জীবনযাত্রার নানা ইঙ্গিত মেলে, যার ভিত্তিতে ইতিহাসের উপক্রমণিকায় নতুন নতুন অধ্যায় রচিত হয়। নীল ইউফ্রেটিস

টাইগ্রিস সিন্ধু প্রভৃতি নদীর উপত্যকায় মানব সভ্যতার উন্মেষের পরিচয় প্রত্নবিদদের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি।

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের পেছনে দৈবের প্রভাব অনস্বীকার্য। মিশরের বেলায় অবশ্য একথা খাটে না। সেখানে সাড়ে চারশো ফুট উঁচু গির্জের পিরামিড সাড়ে চার হাজার বছর ধরে আকাশে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিশরের বিজয়-অভিযানে নেপোলিয়নের মনে আর এক উদ্দেশ্য ছিল। তা হলো পিরামিডের রহস্য উদ্ঘাটন করা। তাই তিনি বাছা বাছা সৈন্য সামন্তের সঙ্গে ফ্রান্সের একদল বাঘা বাঘা পণ্ডিতকেও অভিযানের সামিল করেছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে পৌঁছনো মাত্র একদিন দেরি না করে এই সব পণ্ডিতদের সোজা হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন কায়রোয়। পিরামিডের সামনে তাঁদের সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে নেপোলিয়ন চড়া গলায় হেঁকেছিলেন—

দেখুন, ঐ পিরামিডের মাথা থেকে চল্লিশটি শতাব্দী আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। দেখুন, ঐ পিরামিডকে বুঝতে বা চিনতে আপনারা পারেন কি না।

কিন্তু ব্যাবিলন আর অ্যাসীরিয়া? তাদের সভ্যতার কোনো নিদর্শন তো তুঙ্গস্পর্শী রূপ ধারণ করে এ যুগের মানুষের চোখের সামনে খাড়া ছিল না? তাদের কে আবিষ্কার করল? কোন্ পণ্ডিত?

টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদী পাশাপাশি দক্ষিণ-পুব দিকে বয়ে চলেছে। তাদের স্রোতোধারার এপারে ওপারের উপত্যকাভূমি মেসোপটেমিয়া,—যার আধুনিক নাম ইরাক। রাজধানী বাগদাদ।

গত শতাব্দীর গোড়ার দিক। বৃটিশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি হয়ে বাগদাদে গেলেন ক্লডিয়াস রিচ। বয়েসে তরুণ—আচারে ব্যবহারে মার্জিত, আরবী ফারশিতে ব্যুৎপন্ন। সঙ্গে নববিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রী। ব্যবসাদারী কোম্পানীর উপযুক্ত স্থানীয় প্রতিনিধি। তবে ঐতিহাসিকও নন, প্রত্নতাত্ত্বিকও নন।

আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, কচিৎ স্বজাতীয় লোকের দেখা মেলে। বাগদাদে এই তরুণ ইংরেজ দম্পতির যেন নির্বাসিত জীবন। তার ওপর সারা গ্রীষ্মকাল জুড়ে একশো বাইশ ডিগ্রি তাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত। তবু চাকরি চাকরি, হুট করে ফেলে পালানো অসম্ভব।

শীতকালটা যেন তবু সহ্য হয়। তখন দিনমানে পথে বার হওয়া যায়। আকাশের হলকায় একটু কুয়াশার আস্তরণ পড়ে, বাতাসে একটু লাগে ঠাণ্ডার ছোঁওয়া। তখন রিচ দম্পতি ঘোড়ায় চেপে শহরের বাইরে দূরে দূরে বেড়াতে বেরোন। অজানা প্রান্তরে নিরুদ্দেশ ভ্রমণ করতে করতে একদিন ঘোড়ার খুর এক পাথরে ঠোক্কর খেল। রিচ দম্পতি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন প্রাচীন ব্যাবিলনের সংকেত।

ইউফ্রেটিস নদীর তীরে।

আর একজন ইংরেজ—নাম তাঁর হেনরি লেয়ার্ড। লণ্ডনের কেরানী। তিনিও ফারশি ভাষা শিখেছিলেন—সেই সঙ্গে মনে ছিল দেশভ্রমণের বাসনা। সিংহলে একটা ভালো চাকরি জোগাড় হলো। প্রাণে খুব ফুর্তি, এক ঢিলে দু-পাখি মারা হবে। বিদেশে মোটা টাকা তো রোজগার হবেই। সেই সঙ্গে সিংহল পর্যন্ত স্থলপথে পাড়ি দিতে পারলে দেশভ্রমণও হবে প্রচুর।

যাত্রা শুরু হলো—কিন্তু ঐ টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস অঞ্চলে পৌঁছে আটকে গেলেন লেয়ার্ড। রিচের ব্যাবিলন আবিষ্কারের কাহিনী তিনি পড়েছিলেন। রিচ যে অঞ্চলে ঘুরতেন সেই সব এলাকায় তিনিও ঘুরতে লাগলেন।

টাইগ্রিস নদীর ওপর দিয়ে এক জেলে নৌকোয় ঘুরতে ঘুরতে একদিন তাঁর চোখে পড়ল পুব তীরে বিরাট একটা ঢিবি। মাঝিদের জিজ্ঞাসা করলেন—ও ঢিবিটা কিসের?

কে জানে? লোকে বলে ঐ ঢিবির নিচে নাকি নিনেভে আছে!

নিনেভে? নৌকো থেকে তীরে নামলেন লেয়ার্ড। ঘাঁটি করলেন ঐ

ঢিবির পাশে। আর এগোনো হোলো না। সিংহলের মালিকের খাতায় নাম কাটা গেল। লেয়ার্ডের চেষ্টায় ঐ ঢিবি খুঁড়ে বার হলো অ্যাসীরিয়ার সম্রাট আসুর-বানি-পালের রাজধানী।

সিন্ধু নদের তীরে প্রাক-আর্য সভ্যতার পীঠভূমি মহেঞ্জোদারোও নিতান্ত দৈবক্রমেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। আবিষ্কর্তা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য লেয়ার্ড-রিচের মতো অর্বাচীন ছিলেন না। নামকরা ঐতিহাসিক, তবে প্রাগৈতিহাসের সন্ধানে তিনি সিন্ধুতীরে যান নি। মহেঞ্জোদারো নামটাও কেউ তখন শোনে নি।

রাখালদাস তখন ঐ অঞ্চলের প্রাচীন বৌদ্ধ নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করে বেড়াচ্ছিলেন। নদীতীরের একটি বড়ো বিহার পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁর চোখে একটু অন্যরকম ঠেকল। এই বিহারটির দেওয়াল অনেক পাতলা, —পাতলা পাতলা ইঁট দিয়ে তৈরি। ভাঁটির আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করা ইঁট—ঠিক আজকালকার ইঁটের মতো। বৌদ্ধ শ্রমণরা এই ধরনের ইঁট পেল কোথা থেকে ? একটি দেওয়ালের দু-পাশ তিনি খুঁড়লেন। ভিত পর্যন্ত সেই একই রকমের ইঁট। এমনি ইঁটের তৈরি কোনো বৌদ্ধ বিহার তিনি কাছেপিঠে দেখেন নি।

সমস্ত বিহারের তলদেশ খুঁড়ে ফেললেন রাখালদাস। আস্তে আস্তে বার হলো প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদারো। মহেঞ্জোদারোর কুড়োনো ইঁট দিয়েই কয়েক হাজার বছর পরে বৌদ্ধ শ্রমণরা তাদের বিহারটি বানিয়েছিল।

ট্রয়ের আবিষ্কার দৈবপ্রভাবহীন। আবার কোনো প্রত্নবেত্তা পণ্ডিতের গবেষণার ফলও নয়। প্রথমে স্বপ্ন, তারপর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার প্রয়াস। প্রথমে প্রত্যয়, তারপর সেই প্রত্যয়কে সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা। এক দৃঢ়নিষ্ঠ মানুষের প্রতিজ্ঞাপূরণ।

হোমার একটা ভৌগোলিক ইঙ্গিত দিয়েছেন—ট্রয়ের উপস্থিতি ঈজিয়ান

সমুদ্রতীরে। হেলিস্পণ্ট প্রণালীর খুব কাছে। যার আধুনিক নাম ডার্ডানেলিস। ট্রয়ের কাছে দুই নদ, উত্তরে সিমিয়স দক্ষিণে স্ক্যামাণ্ডার। স্ক্যামাণ্ডারের জলেই ট্রয়ের উপত্যকা শস্যশ্যামল, এই নদকে ট্রোজানরা দেবতা বলে মান্য করে। এই নদের দক্ষিণে পর্বতমালা—যার প্রধান শিখরের নাম আইডা। উপকূল থেকে সবচেয়ে কাছাকাছি সমুদ্রের বুকে টেনেডস দ্বীপ। তার উত্তরে হেলিস্পণ্টের মোহানা ছাড়িয়ে ইমব্রস দ্বীপ। তারও উত্তরে স্যামোথ্রেস—আকাশ পরিষ্কার থাকলে যার অ্যাথস পাহাড়ের চূড়া সহজেই ট্রয়বাসীর চোখে পড়ে।

অ্যামেরিকা থেকে ফিরে এলেন স্লীম্যান। গেলেন এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিম কোণায়। কোথায় ট্রয়? বুনারবাসি নামে একটি গ্রাম—স্থানীয় লোকরা বললে এইখানেই ট্রয় ছিল। জায়গাটি ভালো করে দেখলেন স্লীম্যান—খুব একটা পছন্দ হলো না। এখানে একটা ঢিবি আছে বটে, তবে ঢিবিটা নিতান্ত ছোটখাটো। এতোটুকু ঢিবির নিচে চাপা আছে বিশাল ট্রয় নগর? বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হলো না। তাছাড়া এখান থেকে সমুদ্র অনেক দূর।

আরো এগোলেন স্লীম্যান। স্থানীয় কিংবদন্তীকে অগ্রাহ্য করে চার-পাশের ভিড় এগিয়ে। পৌছলেন একেবারে সমুদ্রতীরে। জায়গার নাম হিসারলিক। সামনে বালুকাবেলা, তার পেছনে মস্ত একটা ঢিবি। মাপলে দেড়শো মিটার চওড়া, দুশো মিটার লম্বা। প্রায় চল্লিশ মিটার উঁচু। নির্জন ঢিবির মাথায় মনুষ্যবাসের নিদর্শন। তাছাড়া বলতে গেলে জনমানবহীন।

এইখানেই নিশ্চয় ছিল ট্রয়—ডার্ডানেলিস প্রণালী থেকে মাইল চারেক দক্ষিণে। এই ঢিবির নিচেই আছে ট্রয়ের ভিত্তি। সেই ভিত্তি ঘিরেই ছিল তার দুর্মদ প্রাচীর। সেই প্রাচীরের সামনে বেলাভূমি যেখানে ঘটেছিল মহাকাব্যের অবিস্মরণীয় যুদ্ধ। ঐ তো দক্ষিণে কয়েক মাইল দূরেই স্ক্যামাণ্ডার আর দেবরাজ জুপিটারের প্রিয় পর্বত শিখর আইডা।

৪

তখন গ্রীসে যে জাতি বাস করত সে জাতির নাম এখিয়ান। এখিয়ান গ্রাস নানা রাজ্যে ভাগ করা— শ্রেষ্ঠ রাজ্য মাইকেনি। ট্রয় যুদ্ধে গ্রীক বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মাইকেনিরাজ অ্যাগামেমনন। তাঁরই ডাকে বিভিন্ন এখিয়ান রাজ্য একজোট হয়ে ট্রয় অভিযানে যোগ দিয়েছিল, রণতরী ভাসিয়ে ঈজিয়ান সাগর পার হয়ে ট্রয় উপকূল অবরুদ্ধ করেছিল।

সেই মাইকেনিই বা কোথায়? সমসাময়িক মানচিত্রে গ্রীসের পুরোনো কালের অনেক রাজ্যের নাম পরিচয় আছে কিন্তু মাইকেনি? তার নাম নেই। অ্যাগামেমননের সেই মাইকেনিও মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে নাকি?

ট্রয় থেকে ঈজিয়ান সমুদ্র পার হয়ে দক্ষিণ গ্রীসে পৌঁছলেন স্লীম্যান। তারপর খুঁজতে লাগলেন হারানো মাইকেনিকে। এই সন্ধানে তাঁকে সাহায্য করল ষোলোশো বছর আগে লেখা পসেনিয়াসের গ্রন্থাবলী। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত ভ্রমণ-সাহিত্যিক পসোনিয়াস। নিজের দেশ গ্রীসকে তিনি তন্নতন্ন করে দেখেছিলেন। তাঁর সব অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ দশ খণ্ডের গ্রন্থাবলীতে। ভৌগোলিক বিবরণ, পৌরাণিক কাহিনী আর ঐতিহাসিক বৃত্তান্তে ভরা তাঁর রচনা। সে গ্রীস আর আজকের গ্রীসে অনেক তফাত। সেই সোনার গ্রীসের স্বর্ণাভা তাঁর রচনার আলোতেই আধুনিক লোকের চোখে ছটা লাগায়।

পসেনিয়াস মাইকেনি দেখেছিলেন, মাইকেনির বর্ণনা দিয়েছিলেন। সেই বর্ণনা অনুসরণ করে স্লীম্যান এগোলেন। পদে [illegible] খুঁজে খুঁজে
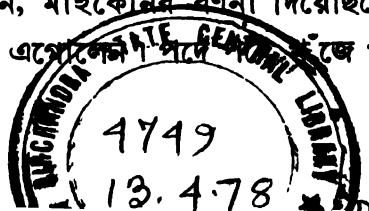
বেড়ালেন। এক পরিত্যক্ত এলাকায় দেখলেন কয়েকটা ছোট ছোট মাটির ঢিবি—তাঁর সামনে রয়েছে ভাঙাচোরা প্রাচীন এক পাথুরে গেট। গেটের মাথায় জোড়া সিংহ বসানো। আবার খুঁটিয়ে মনে করলেন পসেনিয়াসের বর্ণনা। এই নাকি অ্যাগামেমননের প্রাসাদ তোরণ? রাজধানী গেছে, প্রাসাদ গেছে, তোরণদ্বারের চিহ্নটুকু গেছে! সেই জায়গাটা চিহ্নিত করে তিনি খুঁড়তে শুরু করলেন। এবারও ভুল হলো না। মাটির ভিতর থেকে বার হলো মাইকেনি নগরের ধ্বংসাবশেষ।

ট্রয়-মাইকেনি আবিষ্কারের পর সারা পৃথিবীর প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে সাড়া পড়ে গেল। নানান দেশের পণ্ডিতরা ছুটিলেন মধ্য প্রাচ্যে, ট্রয়-মাইকেনির সমসাময়িক সভ্যতার প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান আর গবেষণা করতে। হোমারের উল্লেখিত নগরগুলির সন্ধান চলল। নানা নিদর্শন আবিষ্কৃত হলো। পুরাতত্ত্ব আর প্রত্নতত্ত্ব মিলে ইতিহাসের এক অজ্ঞাত অধ্যায় নতুন করে আবার রচনা করল। এই অধ্যায়ের শিরোনাম মাইকেনিয়ান সভ্যতা। গ্রীসের যে অধিবাসীদের হোমার এখিয়ান নামে ডেকেছেন তারা যে কল্পিত কোনো জাতি নয়, হোমারের মহাকাব্যে যে সভ্যতার বর্ণনা সেই সভ্যতা যে বাস্তব—এ কথা আস্থার সঙ্গে ঘোষিত হলো। আর মোটামুটি নির্ণিত হলো সেই সভ্যতার কাল। সভ্যতার ইতিহাসে ব্রোঞ্জ যুগের শেষ পাদ।

গ্রীসের পুবপারে যেমন ট্রয়—দক্ষিণে ক্রীট। ঈজিয়ান সাগরের একটি দ্বীপ। মানচিত্রে মনে হয় সুনীল সাগরে ভাসমান খয়েরি সবুজ একটি নৌকা যেন। গ্রীকদের প্রাচীন পুরাণে ক্রীটের মস্ত নাম। দেবরাজ জুপিটারের জন্মভূমি। মাতা ধরিত্রী শিশু জুপিটারকে লালন করেন ক্রীটের আইডা পর্বত শিখরে। দেবরাজের সম্মানে ট্রয়ের পর্বতচূড়ারও নাম আইডা। ক্রীটের রাজা মাইনস জুপিটারের ঔরষজাত মানবপুত্র। বিশাল তাঁর ঐশ্বর্য, প্রচণ্ড তাঁর প্রতাপ। ভূখণ্ড গ্রীসের রাজারা তাঁর ভয়ে কাঁপে। তাঁর রাজধানীর নাম নসাস।

এই নসাসের প্রগল্‌ভ বর্ণনা গ্রীক পুরাণে! মহাবৈভবমণ্ডিত নগরী, কেন্দ্র-স্থলে রাজা মাইনসের আকাশচুম্বী প্রাসাদ। রাজপুরী অবর্ণনীয় ঐশ্বর্যের প্রতীক। বিরাট রাজসভা—মণিমাণিক্য খচিত তায় ছাদ, স্ফটিক নির্মিত স্তম্ভের সারি, রক্তবর্ণ হর্ম্যতল। রাজার জন্য মরকত খচিত স্বর্ণ সিংহাসন, পাত্রমিত্র অমাত্যদের জন্যে রঙিন মিনাকরা রৌপ্যময় বেদী।

এই নসাস কি সত্যই ছিল? না শুধু পুরাণকারের কল্পনা? স্লীম্যান বিশ্বাস করেছিলেন যে ট্রয়-মাইকেনির মতো নসাসও সত্য। ক্রীট দ্বীপে গিয়ে নসাস নগরীর এলাকাও তিনি চিহ্নিত করেছিলেন। ট্রয় মাইকেনির চেয়ে নসাস যে প্রাচীনতর তাও তিনি ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সেই প্রাচীন নগরকে খুঁড়ে বার করার সময় তিনি পান নি। নসাস আবিষ্কারের কৃতিত্ব ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিক আর্থার ইভানসের। ট্রয় আবিষ্কারের বছর তিরিশ পরে। ক্রীটের এই প্রাচীনতর সভ্যতার নাম ইভানস দিয়েছিলেন মিনোয়ান সভ্যতা—রাজা মাইনসের নামে নামকরণ।

ঈজিয়ান সাগর অঞ্চলে নগরভিত্তিক সভ্যতার আলো প্রথম জ্বলেছিল ক্রীট দ্বীপে। খৃষ্টজন্মের তিন হাজার বছর আগে ক্রীটের মানুষরা পৌঁছেছিল পাথরের যুগ থেকে ধাতুর যুগে, কৃষির যুগ থেকে শিল্পের যুগে। ধীরে ধীরে এই সভ্যতা বিস্তৃত হোলো। ছড়িয়ে গেল অন্যান্য দ্বীপে, তারপর গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে। গ্রীসে এই সভ্যতাকে যারা বরণ করে নিল তারা এখিয়ান জাতি। মিনোয়ান সভ্যতা থেকেই মাইকেনিয়ান সভ্যতার উদ্ভব।

গ্রীসে এখিয়ানরাও বহিরাগত। সমুদ্র পার হয়ে তারা এসেছিল, সমুদ্র পারের ক্রীটানদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে তাদের অসুবিধা হয় নি। ক্রীটানদের কাছে থেকে তারা ধাতুর ব্যবহার শিখেছিল। শিল্পসৃষ্টির হাতে খড়ি নিয়েছিল—কৃষিভিত্তিক গোষ্ঠীজীবন থেকে নগরভিত্তিক

রাজ্যবাসী হবার শিক্ষা লাভ করেছিল।

এখিয়ানরা ঠিক কোথা থেকে গ্রীসে এসেছিল তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। পুরাণ কাহিনী অনুসারে কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ তীরে এখিয়ানদের আদি বাসভূমি। সেই আদি নিবাস ছেড়ে তারা নেমে এসেছিল ঈজিয়ানের উপকূলে। সেখান থেকে দলে দলে সমুদ্রযাত্রা করেছিল নতুন দেশের খোঁজে। সেই দেশ গ্রীস।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে এখিয়ান গ্রীকরা ক্রীটের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার একশো বছরের মধ্যে গ্রীসের অধিকাংশ অঞ্চলেরই তারা মালিক।—সারা গ্রীসের প্রধান প্রধান রাজবংশগুলি এখিয়ান জাতির। আলাদা আলাদা রাজ্যে ভাগ হলেও জাতিগত আর সংস্কৃতিগত বন্ধনে এখিয়ানরা এক। সেই একতার বলে তারা দারুণ বলীয়ান। খৃষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এখিয়ানবাসীরা একজোট হয়ে মিশর আক্রমণ করেছিল। পরবর্তী শতাব্দীর শুরুতে সেই অনন্যসাধারণ ঘটনা, যার জন্য এখিয়ানদের নাম অবিস্মরণীয়—ট্রয় যুদ্ধ। দক্ষিণ গ্রীসের আর্গোলিস অঞ্চলের এখিয়ানরা শৌর্য সম্পদে সবচেয়ে বড়ো হয়েছিল। তাদেরই রাজধানী মাইকেনি—রাজা ট্রয় যুদ্ধের অধিনায়ক অ্যাগামেমনন। গ্রীসের প্রাচীন পুরাণ মহাকাব্য এই এখিয়ান জাতি আর তাদের মাইকেনিয়ান সভ্যতার দর্পণ।

দ্বীপময় সমুদ্র ঈজিয়ান। মাইকেনিয়ান সভ্যতা দ্বীপের পর দ্বীপে আলো জ্বেলে একদা এশিয়া মাইনরের তীরে গিয়ে পৌঁছেছিল। সেখানে সেই সভ্যতার প্রধান ধারক ছিল ট্রয়। ভাষা এক, সংস্কৃতি এক। একই রকমের কৃষি, শিল্প, সামাজিক রীতিনীতি। রাজ্যশাসন ব্যবস্থাও একই রকমের। সবচেয়ে বড়ো ঐক্য ধর্মের ঐক্য। মাইকেনির মন্দিরে যে দেবতার পুজা, ট্রয়ের মন্দিরেও তিনি পুজনীয়।

ট্রয়ের মাটি খুঁড়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা যে সাতটি নগরের নিদর্শন পেয়েছেন তা থেকে সভ্যতার এক ধারাবাহিক বিবর্তনকে চমৎকার লক্ষ্য করা

যায়। কৃষিজীবী ফ্রিজিয়ানদের এক অগ্রগামী গোষ্ঠী সমুদ্রতীরে নাগরিক সভ্যতার ভিত্তি গেড়েছিল, প্রতিষ্ঠা করেছিল আদি ট্রয় নগর, নগরের নামে গর্বভরে নিজেদের অভিহিত করেছিল ট্রোজান বলে। ক্রীট-নসাসের মতো ট্রয়ও পৌঁছেছিল পাথরের যুগ থেকে ধাতুর যুগে, কৃষির যুগ থেকে শিল্পের যুগে। খ্রীষ্টজন্ম পূর্বের তিন হাজার বছর থেকে বারোশো বছরের মধ্যে সাতটি ট্রয় একে একে মাথা তুলেছিল, আবার মিলিয়ে ছিল মাটিতে। ব্রোঞ্জ যুগের শুরু থেকে শেষ পাদ পর্যন্ত। মিনোয়ান-মাইকেনিয়ান সভ্যতার সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিল।

ট্রয়ের সপ্তম নগর রাজা প্রায়ামের রাজধানী। এই রাজধানীর পত্তন করেছিলেন প্রায়ামের পূর্বপুরুষ। এই রাজধানীর রাজবংশের সঙ্গে এখিয়ান গ্রীসের বিভিন্ন রাজবংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কী ভাষায়, কী সংস্কৃতিতে কী ধর্মবিশ্বাসে আচার ব্যবহারে গ্রীসের এখিয়ানরা ট্রোজান-দেরই স্বজন।

স্বজন বলেই দুর্জন। স্বজন বলেই পুরুষানুক্রম ধরে হিংসাদ্বেষ হানা-হানি। শেষ পর্যন্ত মহাযুদ্ধ। স্বজন বলেই এখিয়ান গ্রীকদের হাতে ট্রয়ের ধ্বংস—খৃষ্টপূর্ব ১১৮৪ অব্দে।

কেন এই যুদ্ধ?

পুরাণকার বলেছেন—

হেলেনের জন্যে।

ট্রয়ের প্রাসাদ থেকে এখিয়ান রাজবধূ হেলেনকে উদ্ধার করে আনবার জন্যে।

এই রচনাও হেলেনের জন্য।

হেলেনকে খুঁজবার হেলেনকে বুঝবার জন্যে।

হেলেন ট্রয়েরই মতো। ট্রয়ের সেই দুর্মদ প্রাচীর আর আকাশছোঁয়া প্রাসাদচূড়া আর আমরা দেখব না। তেমনি দেখব না হেলেনের মূর্তি, হেলেনের রূপ। ট্রয়েরই মতো হেলেন আছে পুরাণ-মহাকাব্যের বর্ণনায়, প্রত্নতত্ত্বের ইঙ্গিতে-আভাসে আর মানুষের ভাবনা-কল্পনায়। সেই উপাদানেই হেলেনের চিন্ময়ী প্রতিমা আমরা গড়ব।

পুরাণের আরম্ভ কবে ?

মানব চেতনার প্রভাতী যুগকে কল্পনা করি। সে যুগে এই বিরাট ও প্রচণ্ড বিশ্বপ্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ কতো দুর্বল কতো অসহায় ! নির্বোধ নিরস্ত্র সে—প্রকৃতির খেয়ালখুশির হাতে ক্রীড়নক মাত্র সে। অশেষ তার বিস্ময়, অসীম তার আতঙ্ক। বজ্ররূপে প্রকৃতি তাকে দগ্ধ করে, ঝঞ্ঝারূপে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, বন্যারূপে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তার আশ্রয়। প্রকৃতি করুণাও করে বৃষ্টিরূপে শস্যরূপে। সেও তার খেয়াল। কখনো সে মিত্র, কখনো শত্রু—কখন সে হাসে, কখনো সে কাঁদায়।

প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে গ্রীকরা দেবত্বে ভূষিত করেছিল। প্রকৃতির শক্তি মানুষের চেয়ে বেশি, অতএব দেবতারা মানুষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। প্রকৃতির রূপ মানুষের চেয়ে মহত্তর, অতএব দেবতারা মানুষের চেয়ে

সুন্দরতর। কিন্তু এই সৌন্দর্যকে লাভ করাই মানুষের সাধনা, শক্তির বিকাশই মানুষের উত্তরাধিকার। তাই গ্রীক দেবদেবীর অপরূপ মনুষ্য-কান্তি।

প্রকৃতি অসীম, তেমনি আর এক অসীম হলো মানুষের মন। যেন এক অনন্ত সাগর, এই সাগর অনির্বাণ তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মতো মুহূর্তে মুহূর্তে বৃত্তিনিচয়ের আলোড়ন। মানবমনের বিচিত্র উদ্বেলন প্রকৃতিরই মতো অবোধ্য আর অপ্রতিরোধ্য।

বাসনা কামনা প্রেম স্নেহ ক্রোধ লোভ দম্ভ, নানা সুকুমার ও কুটিল বৃত্তি—এরা মানুষকে বড়ো করে ছোট করে, আকাশে তোলে আবার নিক্ষেপ করে দুর্ভাগ্যের অন্ধকারে। প্রাচীন গ্রীক তার অন্তরের প্রধান বৃত্তিগুলিকে আলাদা আলাদা করে বোঝবার চেষ্টা করেছে এবং এদের মূলে এক একজন প্রত্যক্ষ মনুষ্যরূপী দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

পৌরাণিক গ্রীস নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তারূপে কোনো অপ্রত্যক্ষ নিরাকার সর্বশক্তিমান একেশ্বরের কল্পনা করে নি। যে একেশ্বর মানব-ইন্দ্রিয়ের অগোচর, মানবভাগ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন—মানুষের ভয়ার্ত প্রার্থনা যার অরূপ অস্তিত্বকে স্পর্শ করে না। প্রকৃতির হাসিকান্না আর অন্তরের আনন্দবেদনাকে পৌরাণিক গ্রীস দেবদেবীরূপে কল্পনা করেছে এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধির উপচারে সংসার-সীমানার মধ্যে আসীন করেছে। ধারণা করেছে যে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, রুচি, প্রবৃত্তি দেবদেবীর মধ্যেও আছে, মানবোচিত কামনা-বাসনা দেবীদেবীরই প্রসাদ, আর মানুষের চেয়ে দেবতা শুধু শক্তিতে বড়ো নয়, রিপুর আকর্ষণেও বড়ো।

দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব তার অমরত্বে। মানুষ মরণশীল, কিন্তু দেবতা চিরঞ্জীব। এই পৃথিবী মানুষের মরজীবনের আবাস, কিন্তু দেবতার চিরন্তন লীলা-ক্ষেত্র। লীলার আস্বাদন দেবতারই অধিকার, দেবদেবীর দয়ায় তার কিছুটা প্রসাদ মানুষে বর্তেছে। কিন্তু তার ফল হয়েছে বিষময়।

দেবতার পক্ষে যা অমৃত, মানুষের পক্ষে তা হলাহল। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য, এই ষড়গুণে দেবতারা গুণান্বিত। এই গুণের ভাগ পেয়েই মানুষ ষড়রিপুর তাড়নায় ভাগ্যহত। রিপুতাড়িত মানুষের ভাগ্য নিয়ে দেবতাদের নিষ্ঠুর খেলা। এই খেলা কখনো আশীর্বাদ, কখনো অভিশাপ। মনুষ্য জীবনের সব প্রচেষ্টা আর সব পুরুষাকারের পিছনে দেবতার মুচকি হাসি—নিয়তি। দৈব-ইচ্ছার উপরে মানুষের কোনো হাত নেই। কোনো শক্তি নেই সেই ইচ্ছাকে অবহেলা করার। মরভাগ্যে দৈব ইচ্ছার ফল হেলেন।

দক্ষিণ গ্রীসের বিখ্যাত নগররাজ্য স্পার্টা। রাজার নাম টিণ্ডেরাস, রানীর নাম লেডা। ইউরোটাস নদীর জলে একদিন সুন্দরী রানী লেডা স্নান করছেন—তাঁর নগ্নতনু দেখে বিমোহিত হলেন দেবরাজ জুপিটার। স্বর্গরাজপুরী অলিম্পাস থেকে মর্তবিহারের জন্য দেবরাজ এসেছেন। সুন্দরী মর্তমানবীকে নিয়ে খেলা করতে দেবরাজের খুবই আগ্রহ। লেডার বর অঙ্গের দিকে তাকিয়ে তাঁর মন খেলার লোভে আকুল হোলো।

লেডার চোখে পড়ল নদীর তীরে সুন্দর একটি রাজহাঁস—তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রকাণ্ড এক বাজপাখি। রাজহাঁস উড়তে পারে না, বড়ো বড়ো পাখা ঝাপটিয়ে সে প্রাণভয়ে দৌড়য় আর সোনালি হলুদ ঠোঁট দুটি হাঁ করে ভয়ার্ত চীৎকার করে।

রাজহাঁসটিকে বাঁচাবার জন্যে ছুটে গেলেন করুণাময়ী লেডা। দুহাত বাড়িয়ে তাকে বুকে তুলে নিলেন। আর্ত আশ্রিত পাখি কাঁপতে কাঁপতে ঘন হয়ে এলো তাঁর কাছে।

আর ভয় নেই। আর বাজপাখি তাড়া করবে না তোমাকে। ঐ তো দূরদিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে তার কালো পাখা। এবার নামো বুক থেকে, নির্ভয়ে চলে যাও!

কিন্তু এ কী হোলো ? এ কেমন ব্যবহার রাজহাঁসের ? তার লম্বা গলা দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে লেডার গলা, তার দুই বিরাট ডানা বিস্তার করে ঢেকে দিয়েছে লেডার নগ্ন দেহ। কোথায় তার হলুদ ঠোঁট ? দুটি কামার্ত ওষ্ঠ নেমে এসেছে লেডার মুখের ওপর। দৃঢ় আলিঙ্গনে অপূর্ব শিহরণ জাগিয়েছে লেডার প্রতি অঙ্গে। ভাগ্য তার অনির্বার স্পর্শ রেখেছে উরুসন্ধিমূলে—লেডার আর উপায় নেই।

শ্রান্ত বিপর্যস্ত নারীর মুখ থেকে বার হোলো সুখকম্পিত অস্ফুট স্বর—

কে তুমি ?

পরিতৃপ্ত পুরুষ মেঘগম্ভীর কণ্ঠে আত্মপরিচয় দিল—

আমি জুপিটার !

জুপিটারের ঔরষে গর্ভবতী হলেন স্পার্টার রাণী লেডা। সময়ে প্রসব করলেন একটি সোনার ডিম। সেই ডিম ফেটে ভূমিষ্ঠ হলো কন্যা। স্পার্টার রাজকুমারী হেলেন।

হেলেনের জন্মবৃত্তান্ত অলৌকিক। কিন্তু তা নিয়ে লজ্জার কিছু নেই। দেবভুক্তিতা মানবীর ভাগ্য তো গৌরবময়। কুন্তীর মতো গরবিনী মাতা আর দ্বিতীয় আছে নাকি ভারতীয় পুরাণে ? তাঁর ছয় সন্তানের প্রতিটিরই জন্ম তো দেব ঔরষে। পঞ্চপাণ্ডবের জন্মদাতা না হলেও পাণ্ডুর পিতৃত্বগর্ব বিন্দুমাত্র খর্ব হয় নি। তেমনি গর্বের শেষ নেই রাজা টিণ্ডেরাসের। দেবাদিদেব জুপিটার—স্বর্গমর্তের রাজাধিরাজ—বিমোহিত হয়েছেন তাঁর রাণীর রূপে—একি কম ভাগ্যের ?

মর্তের মানবীদের প্রতি স্বর্গের দেবতাদের আকর্ষণ চিরন্তন। বিশেষ করে জুপিটারের। স্বর্গপতি ইন্দ্রেরই মতো। কামুকতায় উভয়েই সমকীর্তি। রাণীলাভও দুজনের একই পদ্ধতিতে। জুপিটারের রাণী জুনো আর ইন্দ্রের রাণী ইন্দ্রানী শচী—দুজনেরই অসুর বিবাহ।

অসুর বিবাহের ভর্তার কাছে একনিষ্ঠতা আশা করা বৃথা। স্ত্রীর বশংবদ হওয়া এমনি স্বামীর চরিত্রবিরোধী—বিশেষ করে স্বামী যদি হন স্বর্গ-

মর্তের অধিপতি। জুনো আর শচীর বুকে একই জ্বালা।
কিন্তু টিণ্ডেরাসের মনে কোনো জ্বালা নেই। জুপিটারের কৃপায় রানী তাঁকে হেলেনের মতো কন্যা উপহার দিয়েছেন তাতে তিনি কৃতার্থ। লেডার মতো ট্রোয়েজেনের রানী আলকৃমিনার কাছেও জুপিটার এসে ছিলেন ছদ্মবেশে। দেবতার সেই সান্নিধ্য-বিলাসের ফলে সন্তানবতী হয়েছিলেন আলকৃমিনা। সেই সন্তান শ্রেষ্ঠ বীর—হারকিউলিস। তাঁর হেলেনও যখন বড়ো হবে, সে কি বিশ্বভূবন আলো করবে না শ্রেষ্ঠা সুন্দরীরূপে?

পশ্চিমদিকে টেগিটস পর্বত, পূর্বদিকে ইউরোটাস নদী। মাঝখানে উপত্যকার ওপর নগররাজ্য স্পার্টা। বসন্ত ঋতু যখন আসে, টেগিটস শিখরের তুষার গলতে থাকে, শিলাগাত্র থেকে ঝরে পড়ে ঝরণার জল। অসংখ্য স্রোতোধারা উপত্যকার ওপর দিয়ে বয়ে যায়, রুক্ষ মাটি রূপ নেয় শ্যামলিনী। ফুল ফোটে, ফল পাকে। সেই সঙ্গে ঢল নামে ইউরোটাস নদীর জলে। প্রথমে ছলছল কলকল, দেখতে না দেখতে বাঁধভাঙা বন্যা।
তেমনি বসন্ত একদিন এলো রাজকুমারী হেলেনের অঙ্গে অঙ্গে। ঝাউ পাতার মতো মর্মরিত হলো তার কেশরাশি, নীলোৎপলের মতো চোখ, বুকে একজোড়া সোনালি নধর আপেলের বাসা। টুকটুকে ডালিম রং ফুটে উঠেছে গালে আর সারা অবয়ব থেকে ঝরে পড়ছে পাকা আঙুরের সুবাস। সেই সুবাসে বাতাসের প্রাণে খুশির নেশা লাগল। কুহেলিবিহীন নীলাকাশে ছড়িয়ে গেল বাঁশির সুর। সেই সুরে খুলল যৌবনের কুঞ্জদ্বার, বাজল হেলেনের বিয়ের আগমনী।
কাকে তুমি বিয়ে করবে হেলেন?
জানি না তো?
আমি কি উপযুক্ত বর পছন্দ করে আনব তোমার জন্যে?

তা কেন ?

তবে ?

আমার বর পছন্দ করব আমি।

কী করে করবে হেলেন ?

কেন ? ডাকো না স্বয়ংবর সভা। আমি স্বয়ংবরা হব।

টিণ্ডেরাস্ তাই করলেন। কন্যার জন্যে স্বয়ংবর সভা ডাকলেন। লিপি হাতে তাঁর দূত প্রত্যেক রাজধানীতে উপস্থিত হোলো। সারা গ্রীসে তাঁর আমন্ত্রণ ছড়ালো। এ আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করবে কে ? হেলেনের রূপসৌরভ যে বাতাসে বাতাসে ছড়িয়েছে, সবাই জেনেছে হেলেন সুন্দরীশ্রেষ্ঠা।

সমস্ত গ্রীসের বিভিন্ন রাজ্যের রাজপুত্ররা স্পার্টায় ছুটে এলো। রাজ-বেশে, যোদ্ধবেশে। মাথায় মুকুট, কোমরে তলোয়ার আর হাতে ঢাল। কারো কাঁধে ধনুর্বাণ। নামকরা একজনও বাদ রইল না। প্রত্যেকেব প্রত্যেকের দিকে রোষকষায়িত চোখ—প্রত্যেকের দাঁতে কিড়িমিড়ি।

স্বয়ংবর সভা খুব একটা নিশ্চিন্ত অনুষ্ঠান নয়। এখানকার বাতাসে ঝড়ের সংকেত। স্বয়ংবর সভার মাটিতে উপ্ত থাকে ভয়ংকরের বীজ, আমন্ত্রণের বাঁশি অস্ত্রের ঝনঝনি হয়ে উঠতে দেরি হয় না। বরমাল্য লোভী কণ্ঠের স্কন্দচ্যুত হবার সম্ভাবনা থাকে।

স্বয়ংবর সভায় এসেছিলেন পাঞ্চালী, মালা দিয়েছিলেন ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনের গলায়। কুরুপাণ্ডবের শত্রুতায় আর এক ঘৃতাহুতি, ভারত-যুদ্ধের আর এক পরোক্ষ কারণ। সেই সভায় দ্রৌপদী যদি সমর্থ প্রার্থী কর্ণকে সূতপুত্র বলে অপমান না করতেন তাহলে কৌরব সভায় সেই কর্ণ দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের জন্যে উৎসাহ দিতেন না। কুরুক্ষেত্রের রণ-ক্ষেত্রে ভীম দুঃশাসনের রক্তপান আর দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করতেন না। স্বয়ংবর মানুষকে অমানুষে পরিবর্তন করতে পারে। শান্তির নীলাকাশে যুদ্ধের কালো মেঘকে ঘনিয়ে আনতে পারে।

স্বয়ংবর সভার অতিথিদের মন মেজাজ দেখে প্রমাদ গণলেন টিণ্ডেরাস। এমনটি তিনি আশা করেন নি। প্রত্যেক রাজপুত্রের পরুষকণ্ঠে আত্মপ্রশংসার ঢক্কানিনাদ, একের নাকের সামনে অপরের বিঘূর্ণিত তরবারি। প্রত্যেক রাজপুত্র মন ভেজাবার জন্যে এনেছে সেরা উপঢৌকন। চোখে না দেখলেও প্রত্যেকেই হেলেনের জন্যে পাগল। কার উপঢৌকন হেলেন নেবে, কার গলায় পরাবে মালা? মেয়েকে টুকরো টুকরো করে বিলিয়ে দিতে তো টিণ্ডেরাস পারেন না? একজনকেই সে বরণ করবে, একজনই হবে তার স্বামী। আর তখন বিফল-মনোরথ বাকি পাণিপ্রার্থীরা? তারা কি খাপের তলোয়ার খাপে রেখে হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে? আর মুখ বুঁজে কান পেতে সানাই শুনবে? বিয়ের আগে দক্ষযজ্ঞ লেগে যাবে যে!

স্বয়ংবরসভা আর বসে না। অতিথিশালায় শুধু দিনের পর দিন ভূরিভোজ। হেলেন থাকে অন্তঃপুরে—মুখটি সে বার করে না। আর সকাল-বিকেল। উতলা অতিথিদের মেজাজ দেখে রাজা টিণ্ডেরাসের বুক শুকিয়ে যায়!

৬

পাণিপ্রার্থীদেরই একজন বুদ্ধি দিল। ইথাকার রাজা ইউলিসিস'। উত্তর আর দক্ষিণ গ্রীসকে প্রায় আড়াআড়িভাবে দুভাগ করেছে করিন্থ উপসাগর। সেই উপসাগরের পশ্চিমে সমুদ্রের ওপর ছোট্ট একটি দ্বীপ ইথাকা। পাহাড়ী দ্বীপ, শক্ত পাথুরে মাটি। যতো না সবুজ খেত তার অনেক বেশি ঊষর বালুকাবেলা, কিছু কিছু চাষবাস বাদে পশুপালনই প্রজাদের পেশা।

ইথাকাপতি ইউলিসিস শৌর্যসম্পদে না হোক বুদ্ধিবিবেচনায় সকলের বড়ো। প্রতিদ্বন্দ্বীদের এক পলক দেখেই বুঝল, এ দলে পাত্তা পাওয়া অসম্ভব। হেলেন তার ভাগ্যে নেই। কিন্তু দূর দ্বীপরাজ্য থেকে বিয়ের রাজকন্যা সংগ্রহ করতে এসেছে, শুধুহাতে ফিরে গেলে প্রজারা বলবে কী? সমুদ্র পেরিয়ে দিগ্‌বিজয় করতে গিয়েছে তাদের রাজা, দিগ্‌-বিজয়ের নিদর্শন কই? তবে যদি টিণ্ডেরাসের সমস্যার সমাধান করতে পারে তাহলে সত্যিই দিগ্‌বিজয় করা হবে। বুদ্ধির দিগ্‌বিজয়।

এক ঢিলে দু-পাখি মারতে হবে, ভাবল ইউলিসিস। তারপর কথা পাড়ল টিণ্ডেরাসের কাছে, ভেবে ভেবে যাঁর রাতের ঘুম উধাও।

মহারাজ, তোমার শুকনো মুখ, রক্তবর্ণ চক্ষু, বলিরেখাঙ্কিত কপাল, তোমার বিপুল দুশ্চিন্তার কথা আমি জানি।

জানো?

হেলেন সভায় এলেই তোমার রাজ্যে আগুন জ্বলবে। তবে হ্যাঁ, তোমার এই সমস্যার সমাধান আমি সহজেই করে দিতে পারি।

পারো? ভেবে ভেবে মরে যাচ্ছি আমি—পারো আমাকে বাঁচাতে?

নিশ্চয় পারি।
অকুল সমুদ্রে তীরের আশ্বাস ফুটল টিণ্ডেরাসের চোখে।
ঠিক বলছ?
ঠিক।
দু হাত বাড়িয়ে ইউলিসিসের ডানহাতটা জোরে চেপে ধরতে গেলেন টিণ্ডেরাস। এক পা পিছু হেঁটে হাত সরিয়ে নিল ইউলিসিস। ফস্ করে বললে—
তার আগে কথা দাও!
কথা দেব? কী কথা?
প্রতিজ্ঞা করো তোমার ভাইঝি পেনিলোপিকে আমার হাতে দেবে! আমি তাকে রানী করে নিয়ে যাব।
কথা দিলেন টিণ্ডেরাস।
ইউলিসিস তখন ভাঙল।
রাজা, ভয় পেয়ো না। সভা ডাকো। সভার মাঝখানে জুপিটারের নামে অশ্ববলি দাও। হেলেনকে যারা বিয়ে করতে চায় প্রত্যেককে বলো ঐ বলির সামনে দাঁড়িয়ে জুপিটারের নামে শপথ করতে, হেলেন যাকেই বিয়ে করুক, প্রত্যেকে হবে তার স্বামীর পরম বন্ধু। যে কোনো প্রয়োজনে যে কোনো বিপদে প্রত্যেকে তার স্বামীর পাশে দাঁড়াবে, সর্বশক্তি দিয়ে তাকে সাহায্য করবে। ঐ প্রতিশ্রুতি আদায়ের পর হেলেনকে নিয়ে এস সভায়।
টিণ্ডেরাস ইউলিসিসের বুদ্ধি নিলেন। সর্বসমক্ষে প্রত্যেকটি রাজপুত্র অঙ্গীকার করল সে হবে হেলেনের স্বামীর দুঃখবিপদের পরম বন্ধু।
তখন হেলেন সভায় এলো। তার রূপের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল সকলের। অন্ধ চোখে ভালো করে দৃষ্টি ফুটবার আগেই হেলেন তার হাতের বরণমালা পরিয়ে দিল মাইকেনির রাজপুত্র মেনিলাওসের গলায়।

সারা গ্রীক পুরাণে হেলেন ছাড়া আর কোনো নারীর স্বয়ংবরের উল্লেখ নেই। সভায় দাঁড়িয়ে বহু প্রার্থীব মধ্যে থেকে ইচ্ছামর্ত স্বামী নির্বাচন, এই গৌরবময় অধিকার শুধু হেলেনের। হেলেন শুধু সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নয়, এ দিক থেকে হেলেন অনুপমা।

হেলেনকে পাবার জন্যে সবাই পাগল। কিন্তু হেলেন নেবে কাকে? যে সে নির্বাচন নয়, স্বামী নির্বাচন। প্রেম নয়, পছন্দ—বিহ্বলতা নয়, বুদ্ধি আর বিচক্ষণতা। হেলেন যে পরম রূপবতী তা তো বিশ্বসুদ্ধ জানে, স্বামী নির্বাচন করে হেলেন দেখিয়ে দিল সে বুদ্ধিমতীও কম নয়!

স্বয়ংবর সভায় ঢুকে সারি সারি রাজপুত্রদের দেখে মাথা ঘুরে যায়নি হেলেনের। রূপবতী কন্যা রূপের মোহে মজে নি। তাহলে তো ক্রীটের রাজা আইডোমিনিউসের গলাতেই মালা দিত—তার চেয়ে রূপবান পাণিপ্রার্থী কে? বীরত্বকে যদি স্বামীত্বের ভূষণ মনে করত তাহলে আর্গস-সবাজ ডায়ামিডিস কিংবা স্যালামিসের রাজপুত্র অ্যাজাক্সকে বরণ করার কথা—এই দুই প্রার্থী তো বীরত্বে অতুলনীয়। তাছাড়া তাদের পাশে ফিলকটেটিসও তো ছিল, তার হাতেই তো হারকিউলিসের অজেয় ধনুর্বাণ। বুদ্ধিমতী হেলেন খুব একটা বুদ্ধিমান স্বামীও চায় নি, সেই বুঝেই তো স্বয়ংবর সভায় মুখও দেখায় নি ইথাকারাজ ইউলিসিস!

কন্যার স্বামী নির্বাচনে পিতার প্রত্যক্ষ প্রভাব কতোটা ছিল তা আমরা জানিনে। কিন্তু হেলেন ভালো মতোই জানত রাজা টিণ্ডেরাসের মনের খবর। হেলেনের দুই ভাই, ক্যাস্টর আর পোলাকস—যেমন সাহসী তেমনি শক্তিধর। কোথাও কোনো বিপদের ডাক শুনলেই ছুটে যায়, অকুতোভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পিতৃরাজ্যের প্রতি কোনো টান নেই তাদের। নজর নেই পিতৃসিংহাসনের ওপর। আর এক বোন, ক্লিটেমনেস্ট্রা। দারুণ বিয়ে হয়েছে তার—মাইকেনির রাজা অ্যাগামেমননের সে রানী। নয়নের মণি বলতে হেলেন, তাকে নিয়েই বাপের সাধ-আহ্লাদ, ঐ মেয়েই ভবিষ্যৎ। টিণ্ডেরাস চান বিয়ের পরও আদরিণী হেলেন পিতৃ-

প্রাসাদ আলো করে থাকবে—হেলেনের স্বামীকেই আবার তিনি বসাবেন স্পার্টার সিংহাসনে।
হেলেন বিচারে ভুল করে নি। তাকে শুধু স্বামী নির্বাচন করতে হয় নি, নির্বাচন করতে হয়েছে স্পার্টার সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে। শুধু হৃদয়ের রাজা নয়, দেশের রাজাকে। তাই সে ভেবে রেখেছে এমন স্বামী তার চাই যে হবে বংশগরিমায় তার নিজের চেয়েও গরীয়ান। মানে মর্যাদায় কনেকে ছাড়িয়ে যাবে এমন বর চাই। যাকে বিয়ে করলে হেলেন হবে সারা গ্রীসের শ্রেষ্ঠ রাজপরিবারের রাজবধূ আর স্পার্টা পাবে রাজার মতো রাজা।
এমন বর আসবে কোথা থেকে ?
মাইকেনি থেকে।
মেনিলাওস কোনো বীর্যশুল্কা নন্দিনীর পাণিগ্রহণ করে নি। রামের মতো সে হরধনু ভঙ্গ করে নি, অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদ করে নি। দ্রুপদ রাজার সভায় প্রতিদ্বন্দ্বী বা রাজারা শ্বাপদের হিংস্রতায় ঘিরে ধরেছিল ব্রাহ্মণ-বেশী অর্জুনকে। সিংহের মতো যুদ্ধ করে তাকে পরাভূত করতে হয়েছিল বিফল প্রতিদ্বন্দ্বীদের। তেমন যুদ্ধ করতে হয় নি মেনিলাওসকে। তার বিয়ের বংশীধ্বনি অস্ত্রের পরুষ ঝঞ্চনায় কলুষিত হয় নি।
দানবরূপী অত্যাচাবীর হাত থেকে ভয়ার্তা কামিনীকে রক্ষা করা সর্ব যুগের কাহিনী-কিংবদন্তীর নায়কদের আকৃছার কাজ। প্রতিদানে কৃতজ্ঞা কুমারীদের আলিঙ্গন বীর নায়কের কণ্ঠহার। কিন্তু এমন ভূষণ মেনিলাওস গলায় পরে নি। বিশ্বসুন্দরী হেলেনকে লাভ করবার জন্যে তাকে কপালের ঘাম এক বিন্দু ঝরাতে হয়নি। এ হেন মেনিলাওসের গলায় যখন হেলেন অকুণ্ঠ বিচারে মালা দিল, তখন রাজা টিণ্ডেরাসের আনন্দের সীমা নেই। মনে মনে বলছেন—
ছাখো ছাখো, পছন্দ ছাখো। আমার মেয়ের বর এসেছে কোথা থেকে ? মাইকেনি থেকে।

মাইকেনি শুধু একটি নগর নয়, রাজ্য নয়—মাইকেনি এক বিশাল সভ্যতার বিজয়স্তম্ভ। সারাগ্রীস মাইকেনির মহান নেতৃত্ব মানে। সেই মাইকেনিরই রাজনন্দন মেনিলাওস। সিংহাসনে আসীন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অ্যাগামেমননে, তিনি গ্রীসের সবচেয়ে সম্মানীয় নরপতি। সম্রাট না হয়েও সম্রাটের মতোই সম্মান। তিনি আবার টিণ্ডেরাসের বড়ো জামাতা। হেলেনের বোনের স্বামী। এবার ছোট জামাতা হবে মাইকেনিরই রাজ-ভ্রাতা রাজকুমার মেনিলাওস।

এই বিবাহে স্পার্টা আর মাইকেনির সখ্যসূত্রে আর এক মঙ্গলগ্রন্থি পড়ল। হেলেন-মেনিলাওসের পরিণয়ে উৎসবমুখর হোলো দুই রাজ্য।

তারপর অবসর নিলেন রাজা টিণ্ডেরাস। পরমাসুন্দরী রানী হেলেনকে পাশে নিয়ে স্পার্টার সিংহাসনে বসল নবীন রাজা মেনিলাওস।

৭

রাজা মেনিলাওস আর রানী হেলেনের রাজধানী আমরা দেখব না। সেই নামের নগর এখনো আছে। জনবহুল আধুনিক স্পার্টা। এই স্পার্টার কাছাকাছি মাটির নিচে হেলেন-মেনিলাওসের স্পার্টা ঘুমিয়ে আছে কোথাও। ধূলিসাৎ প্রাসাদ ধূলির নিচে ঢাকা পড়েছে। সেই আস্তরণ সরিয়ে সে যুগের স্পার্টাকে আবিষ্কার করা অসম্ভব। তাহলে এ যুগের স্পার্টাকে তো গুঁড়িয়ে চুরমার করতে হয়! প্রত্নতত্ত্বের এমনি আবদার মানলেই হোলো!

সেই তিন হাজার বছর আগেকার স্পার্টার সন্ধান না মিললেও গ্রীসের অন্যান্য পুরাণ-প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরের সন্ধান পাওয়া গেছে। সব চেয়ে বড়ো আবিষ্কার স্লীম্যানের—মাইকেনি আর টাইরিনস। একই যুগের অন্য নগরের নিদর্শন থেকে আমরা এখিয়ান জাতির বাস্তব সংস্কৃতির একটা উজ্জ্বল চিত্র পাই, তার সঙ্গে পুরাণকারদের বর্ণনাও আমরা পড়ি। প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কারের সঙ্গে কাব্যের বর্ণনাকে মিলিয়ে আমরা স্পার্টার রাজারানীর জীবনও কল্পনা করতে পারি। এ কল্পনা বাস্তবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ।

যে সমস্ত শিল্পীদের হাতে মাইকেনিয়ান সভ্যতা রূপ নিয়েছিল তার প্রথম সারিতে ছিল বাস্তুশিল্পীর দল। তারা বানিয়েছিল রাজার প্রাসাদ, রাজসমাধি আর দেবতার মন্দির। ইঁটকাঠ দিয়ে নয়—পাথর দিয়ে। মাইকেনির প্রাসাদের সিংহতোরণ আর টাইরিনসের ভিত্তিতল দেখে আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে উপলব্ধি করি কী রকম বিরাট বিরাট পাথর খাড়া করে এই সব শিলাহর্ম্য নির্মিত হয়েছিল, আর যারা নির্মাণ করেছিল কী তাদের

দুর্মদ শক্তি! পাহাড়ের গা থেকে বিশাল বিশাল চাঙড় খসিয়ে আনা আর সেইসব চাঙড়কে কেটে ঘসে চতুষ্কোণ করে একের পর আর একটা তুলে বসিয়ে ভিত্তি বানানো দেয়াল বানানো খিলান আর ছাদ বানানো অমিত ক্ষমতার পরিচয়।

এইসব ভীম বাস্তুশিল্পীদের পূর্বপুরুষের নাম সাইক্লপস। সে নাকি নিজে হাতে তৈরি করেছিল জুপিটারের বজ্র, প্লুটোর শিরস্ত্রাণ আর নেপচুনের ত্রিশূল। আদি জনক সাইক্লপসের কাছ থেকে তারা শিখেছিল পাহাড়কে টুকরো টুকরো করে বাস্তু পাথর বানাবার কৌশল। টাইরিনস আর মাইকেনির বিশাল শিলাপ্রাচীরও তারা বানিয়েছিল।

স্পার্টা নগরের আয়তন ঘিরে এমনি প্রাচীর মনে হয় ছিল না। দরকার ছিল না—কেননা প্রতিবেশী সব রাজ্যের সঙ্গে স্পার্টার সখ্যতা। বিপদের বন্ধু শ্রেষ্ঠ এখিয়ান রাজ্য মাইকেনি। স্পার্টার প্রাসাদদ্বারও ছিল উন্মুক্ত, রাজ্যের প্রজা আর বহিরাগত দূত যাতে নির্বাধে রাজসকাশে আসতে পারে। তবে মাইকেনির মতো স্পার্টার প্রাসাদ-তোরণেও সম্ভবত ছিল যুগল সিংহমূর্তি।

মাইকেনি আর টাইরিনস প্রাসাদের হর্ম্যতলের অনুসরণে মেনিলাওস রাজার প্রাসাদের চেহারাও আমরা কল্পনা করতে পারি। প্রাসাদের ঠিক কেন্দ্রে একটি বিরাট হল, মাঝখানে গোলাকার যজ্ঞবেদী। সেই যজ্ঞ-বেদীর ডানদিকে রাজসিংহাসন। এই হলই প্রাসাদের দেওয়ানি-খাস। এইখানে পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে রাজা বসেন, দূত ও অতিথিদের আপ্যায়ন করেন, দেবতাদের পূজার্ঘ নিবেদন করেন। রানী অসূর্যম্পশ্যা অবরোধবাসিনী নন, তাঁর সিংহাসন রাজার পাশেই। দরকার মতো তিনি রাজসভা আলো করেন, পাত্রমিত্রের সম্মান ও প্রজার প্রণতি গ্রহণ করেন।

সভাকক্ষকে ঘিরে কক্ষের পর কক্ষ। রাজার কক্ষ, রানীর কক্ষ, রাজা-রানীর শয়নকক্ষ, পুরুষদের কক্ষ, মেয়েদের কক্ষ, অতিথিদের জন্যে

বিশেষ কক্ষ। তাছাড়া দাসদাসীদের কক্ষ। বিশিষ্ট বিশিষ্ট কক্ষের সংলগ্ন স্নানাগার।

প্রাসাদ থেকে দূরে পাহাড়ের কোলে রাজপরিবারের সমাধিমন্দির। সেই মন্দিরের নিম্নতলে মাটির নিচে দেহের সমাধি, তার ওপর মর্মরপীঠ—মৃত আত্মার সম্মানে নানা ঐশ্বর্যে ভরা।

যে শিল্পের জন্যে বিশ্বজগতে গ্রীসের এতো নাম তা হোলো ভাস্কর্যশিল্প। সারা ইউরোপ তথা সারা পৃথিবী ভাস্কর্যশিল্পের পাঠ গ্রীসের কাছ থেকে নিয়েছে। কিন্তু সে গ্রীস ক্ল্যাসিকাল গ্রীস, এথিয়ান গ্রীস নয়। পাথরে কোঁদা অনুপম মনুষ্যমূর্তি মিনোয়ান-মাইকেনিয়ান সভ্যতার দান নয়। গ্রীসে ভাস্কর্যশিল্পের স্ফুরণ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ। ফিডিয়াস জন্মেছিলেন খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। প্র্যাক্সিলেটিসের কাল আরো একশো বছর পরে। জুপিটারের বিক্রম, অ্যাপোলোর পৌরুষ, মিনার্ভার তেজস্বিনী দীপ্তি আর ভিনাসের চিত্তবিহারিণী মাধুরী মানসপটে কল্পিত হলেও এথিয়ান শিল্পে শিলীভূত রেখায় বাঁধা পড়ে নি। সে যুগের প্রমুখ চারুশিল্পী চিত্রকর। মিনোয়ান আর মাইকেনিয়ান উভয় সভ্যতার ক্ষেত্রেই চিত্রকলার সুপ্রতিষ্ঠিত কদর।

রাজারানীর প্রাসাদকক্ষের দেয়ালে দেয়ালে ফ্রেস্কোর ছড়াছড়ি। বাদামী হলুদ, ঘন নীল আর কালো রঙের বাহার। ছবির বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। বীর চলছেন যুদ্ধে—গায়ে বর্ম এঁটে, অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। রথ প্রস্তুত। বর্ণাঢ্য পোশাকে আর ঝকঝকে অলঙ্কারে শোভিত হয়ে নরনারীরা চলেছেন উৎসবে। যুদ্ধবিদ্যার প্রতিযোগিতা করছে তরুণদল, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে নানা প্রকারের ক্রীড়াকৌশল। বীণকার তুলছে মধুর তান—কবিকণ্ঠ মিলেছে তার সঙ্গে।

প্রাচীর চিত্রে জীবজন্তুরও ছড়াছড়ি। শুধু গৃহপালিত পশু নয়—এমন সব আশ্চর্য প্রাণী, যাদের আঁকতে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার সমন্বয়। জলচরদের মধ্যে নানা বিচিত্রদর্শন মাছ শুশুক অক্টোপাস। সিংহ শার্দুল বৃষ

প্রভৃতি স্থলচর। আর সেই অদ্ভুত উভচর গ্রিফিন—পক্ষী-সিংহ মিলিয়ে যার চেহারা।

শুধু চিত্রশোভিত দেওয়ালই নয়, প্রাসাদের কক্ষতলও অতি মনোহর। পাথরের মেঝে স্ফটিকের মতো মসৃণ, তার ওপর পাকা রঙের বিচিত্র আলপনা—যেন কার্পেট বিছানো। মেঝে জুড়ে হরেকরকমের আসবাব, রাজারানীর সিংহাসন চকচকে পাথরের, পাথর কুঁদে তার মধ্যে পাকা সোনার আর মণিমাণিক্যের ঝকঝকে কাজ—তাছাড়া ঘরে ঘরে পালঙ্ক, মেজ, কেদারা, পা-দানি। বাস্তুকার, সূত্রধর আর স্বর্ণকার—তিন জাতের শিল্পী মিলে প্রসাদের আসবাব বানিয়েছে। এদের কোনোটি পাথরের, কোনোটি হস্তীদন্তের, কোনোটি আবলুস কাঠের—প্রত্যেকটির গায়ে সোনা-রূপো আর ব্রোঞ্জের কারুকার্য।

রাজগৃহিনীর প্রধান কর্তৃত্ব রাজভাণ্ডারের ওপর। ভাণ্ডারে উপছে পড়া সামগ্রী। স্পার্টার রানী হেলেনের নিখুঁত গৃহিনীপনা। দাসদাসীদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বিশ্বস্ত—তাদের দিয়ে হেলেন এই ভাণ্ডার নিত্য পরিচালনা করে। পৈত্রিক আমলের সাধের ভাণ্ডার—নতুন রাজা মেনিলাওস তার সঞ্চয়কে অনেকগুণ বাড়িয়েছে। রানীর ভাণ্ডারে প্রধান সঞ্চিত ধন পেটির পর পেটি ভর্তি তাল তাল সোনা আর রূপো। তার পরই জালার পর জালা ভর্তি নির্জলা মদ আর সুগন্ধী তেল।

রানীর ভাণ্ডারে ছোট বড়ো কতো রকমের পাত্র। পাশাপাশি সাজানো, মাথায় মাথায় বসানো। খাদ্যদ্রব্যের জন্যে, পানীয়ের জন্যে, সুমিষ্ট জল আর সুগন্ধি তেলের জন্যে, মন মাতানো আরক আর আসবের জন্যে। তাছাড়া খাবার জন্যে থালা বাটি পানপাত্র। বড়ো ছোট বিচিত্র দর্শন —মিনে করা ছিলে কাটা, ছবি ফোটানো। এসব পাত্র কী দিয়ে তৈরি? সোনা রূপো দিয়ে। তাছাড়া পোড়ামাটির পাত্রও অজস্র—যাদের গায়ে রংবাহার আঁকিবুকি।

পর্বতসানু থেকে নদীতীর পর্যন্ত সমস্ত জমি রাজার অধিকারে—রাজার

চাষীরা সে জমিতে চাষ করে। গৃহপালিত পশুও রাজার হাজার হাজার,—রাজার পশুপালকরা তাদের পালন করে। শীতের মুখে রানীর ভাণ্ডারে জমা পড়ে শস্য, শীতের শেষে জমা পড়ে পশম।

তাছাড়া সমুদ্রপারের প্রাচ্যদেশ থেকে জাহাজবন্দী হয়ে আমদানি হয় রেশম আর কার্পাস। তৈরি হয় রানীর উষ্ণঋতুর চিকন পোষাক। রাণীর পোশাক সুদীর্ঘ, কোমর থেকে নিতম্ব পর্যন্ত গায়ের সঙ্গে আঁটা—নিম্নাঙ্গের দেহরেখা উদ্ভাসিত। উরুদেশ থেকে পা পর্যন্ত নানা রঙের ঝালরের পর ঝালর।

রানীর পোশাকে বক্ষাবরণ না থাকাই ফ্যাসন। অন্তত মিনোয়ান চিত্রাবলী দেখে সেই ধারণা করা চলে। সেই পোষাকে সুন্দরীর দেহের সব কিছু ঢাকা থাকে—কেবল ভুজবল্লরী কম্বুকণ্ঠ আর ফুল্ল পয়োধর ছাড়া। বিমুগ্ধ পুরুষের দৃষ্টি থেকে তার কমনীয় উর্ধ্বাঙ্গকে রেখে ঢেকে রাখতে হবে, এমন কোনো বারণ নেই রানীর। তার মেঘধূসর কুন্তল, চন্দ্রশোভার মতো ললাট, পদ্মনালের মতো কণ্ঠ আর যুগল কমলের মতো বুক চোখকে আরো ঝলসে দেয় অলঙ্কারের দীপ্তিতে।

মাইকেনি রাজ্যকে একটিমাত্র বিশেষণে ভূষিত করেছেন হোমার—সোনার মাইকেনি। একই সভ্যতায় লালিত, একই রাজবংশে শাসিত প্রতিবেশী বন্ধুরাজ্য স্পার্টাতেও সোনার অপ্রতুলতা থাকবে কেন? রানীর অলঙ্কার সোনা ছাড়া আর কিছু দিয়ে হয় নাকি—সোনার মাইকেনিতে, সোনার স্পার্টায়?

এখিয়ান রানীর স্বর্ণালঙ্কারের শেষ নেই। কপালে টায়রা, হাতে বাজু আর কঙ্কন, গলায় হারের লহর। চুল কাঁটা চিরুনি আর ফুল। সব সোনার। সোনার ওপর জড়োয়ার কাজ। চুনির পাশে পান্না। মরকতের গায়ে পদ্মরাগ। এছাড়া স্ফটিক আর অ্যাম্বারের ছড়াছড়ি।

সোনা ছোটাছুটি করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে, বিশ্রাম পায় রমণীর অলঙ্কারে। এই বাণিজ্যবলেই মাইকেনিয়ান গ্রীসের বনেদী রাজবংশরা

প্রাসাদে প্রাসাদে সোনার পাহাড় জমিয়েছে। কিন্তু বাণিজ্য করতে শক্তি লাগে। পুরুষের পরুষ শক্তি। অলঙ্কার গরবিনী হেলেনের যে যুগে বাস সে যুগ পুরুষের পক্ষে ব্রোঞ্জের যুগ। তা দিয়ে তৈরি হয় লড়াই-এর অস্ত্রশস্ত্র। তলোয়ার ছোরা তীর আর বল্লমের ফলা। শিরস্ত্রাণ বক্ষস্ত্রাণ আর বর্ম। রথের চাকার ব্রোঞ্জের ফলা। ঘোড়ার ক্ষুরের ব্রোঞ্জের পেরেক। জাহাজের গলুই আর হাল ব্রোঞ্জের পাত দিয়ে মোড়া। নিন্দিত ধাতু লোহার তখন আবিষ্কারই হয় নি।

রূপ রমণীর ঐশ্বর্য—ভূষণ সে ঐশ্বর্যের দ্যুতি। হেলেন পরম রূপবতী—সাজসজ্জায় আর অলঙ্কারে বরভূষণা। কিন্তু শুধু রূপে আর ভূষণে মনোলোভা হওয়া যায় না। তার জন্যে আসল প্রয়োজন গুণের। হেলেন শুধু রূপবতী নয়, তার গুণেরও শেষ নেই। গুণের জন্যেই হেলেন-মেনিলাওসের মনের মতো রাণী।

রাজা টিণ্ডেরাস আদরিণী কন্যাকে সর্বগুণে গুণান্বিতা করেছেন। যে কন্যার জন্যে তাঁর এতো গর্ব সেকি শুধু কন্যার রূপ নিয়ে? হেলেনের গুণপনা কি কম?

যে দুর্বোধ্য এখিয়ান ভাষালিপির পাঠোদ্ধার সম্প্রতি হয়েছে, জানিনে হেলেন সে ভাষায় কাব্য রচনা করেছে কি না। জানিনে রাজসভার চারণ কবিদের সুরে সুর মিলিয়ে গান করেছে কি না। তবে সুর আর ছন্দ নিশ্চয়ই হেলেনের মতো মেয়েকে এড়িয়ে যায় নি। রাজসভায় কবিরা পাঠ করেছে কবিতা, সঙ্গীতশিল্পীরা শুনিয়েছে গান—হেলেন সিংহাসনে বসে নিবিষ্ট মনে তা শুনেছে। তখনকার প্রধান বাদ্যযন্ত্র ছিল বীণা। এ যন্ত্রটিকে হেলেন নিশ্চয় কোলে তুলেছে—বিশেষ করে একান্ত অবসরে, মেনিলাওস যখন স্বরাজ্য ছেড়ে দূরে ভ্রমণরত—তখন প্রাসাদের বাতায়ন প্রান্তে বসে সে আপন মনে বীণার তারে আঙুল ছুঁইয়েছে, কণ্ঠে নিয়েছে গুনগুন তান,— এ খুব কষ্ট কল্পনা নয়।

মাইকেনিয়ান সভ্যতায় বস্ত্রশিল্প ছিল খুব উন্নত—নারীরাই ছিল প্রধানত

এ শিল্পের শিল্পী। পশম রেশম আর কাপাস থেকে মিহি সুতো তৈরি আর বস্ত্রবয়ন ছিল রমণীদের কাজ। সুতোর সূক্ষ্মতা আর বুননের চমৎকারিত্ব—অভিজাত এথিয়ান মহিলাদের প্রিয় শিল্প। এ শিল্পে স্পার্টার রানী হেলেনেরও পারদর্শিতার তুলনা নেই। সুতো কাটার একটি সোনার তকলি তার নিত্য সাথী। আর ক্যাস্টর কাঠের একটি সুমোহন পেটিকা —জড়োয়া বসানো সোনার পাত দিয়ে মোড়া। একটু পা ছড়িয়ে বসলেই এই পেটিকাটিও তার পাশে এসে বসে—রঙিন পশম নরম কাপাস আর সুচিক্কন সুতোয় ভর্তি। বোনা কাপড়ে সুঁচ সুতো দিয়ে ফুলকারি বুননের মধ্যে দিয়ে হেলেন ফুল ফোটায়, ছবি আঁকে। সার্থক শিল্পী সে—অতুলনীয় তার প্রতিভা। রেশমের কাপড় সে দিনের পর দিন বোনে, সেই কাপড়ের ওপর দিনে দিনে চিত্রিত হয় ফুল ফল, লতা পাতা, পশু পাখি, পুরুষ নারী—নানা বাস্তব দৃশ্য।

সব শিল্প মিলিয়ে সংসার শিল্প। রাজরানী হেলেনের সংসার শুধু প্রাচুর্যে মোড়া নয়, শ্রীমণ্ডিত। শুধু সংসার বা প্রাসাদটুকুব নয়—রাজ্যেরও অনেক দায়িত্ব হেলেনের। এ রাজ্য তো তারই। সে শুধু রাজবধূ নয়, রাজকন্যা। প্রাসাদের পুরোনো দাসদাসী আর রাজ্যের প্রধান কর্মচারীরা তার বশংবদ—রানী হবার আগে থেকেই। হেলেনের কর্তৃত্ব আর পরিচালনা স্বাভাবিক ভাবেই তারা মান্য করে। তাই রানীর ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করে মাঝে মাঝে বিদেশে পাড়ি দিতে অসুবিধে হয় না নবীন রাজা মেনিলাওসের।

হেলেনের শ্রীময়ী মূর্তির অনিন্দ্য প্রকাশ আমন্ত্রিতের পরিচর্যায়। তার মরমী মনের মধুর বিকাশ আহুত অনাহুত অতিথির আন্তরিক আমন্ত্রণে। অতিথিরা উৎসবে আসে, উৎসবের শেষে হৃষ্টচিত্তে রানীর প্রশংসা করে বিদায় নেয়। আবার আসে অনিমন্ত্রিত আগন্তুকও—কোনো ভাগ্যহারা রাজপুত্র। সেই অভিশপ্ত অতিথিকে দেখে করুণায় হেলেনের বুক ভরে যায়। তাকে মিষ্ট কথা শোনায়, কাছে বসিয়ে সুখাদ্য খাওয়ায়, নিজের

হাতে ক্লান্তিহর ঘুমের ওসুধ মিশিয়ে দেয় তার পানীয়ে, হাত ধরে নিয়ে যায় শয়নকক্ষে। স্নেহভরা হাতে রচনা করে অতিথির রাতের শয্যা।

সারাদিনের শেষে গভীর রাতে হেলেন যায় শয়নকক্ষে। রাজারানীর শয়নকক্ষ, সুগন্ধি তৈলবর্তিকার মৃদু আলো। বিশাল পালঙ্ক, কোমল-নির্মল শয্যা। স্বামী-সোহাগিনী স্বামীর কাছ ঘেঁসে শোয়।
কাটছে পরিতৃপ্ত কাল মেনিলাওসের ঘরণী স্পার্টার রানী হেলেনের। নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ত জীবন। ঐশ্বর্য ভরা রাজপ্রাসাদ, শান্তিময় রাজ্য, মুগ্ধ স্বামী। শুধু তাই নয়, সার্থক নারী জীবন পরিপূর্ণ হয়েছে মাতৃত্বে। কোলে এসেছে ফুটফুটে মেয়ে—নাম তার হারমিওনি।

৮

এমন সময়ে হেলেনের জীবনে এক নবীন অতিথির আবির্ভাব। ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিস।

অবাঞ্ছিত অতিথি নয়। মেনিলাওসের আমন্ত্রণেই সমুদ্র পার হয়ে এই তরুণ রাজকুমার স্পার্টায় এসেছে। প্রাসাদদ্বারে তাকে অভ্যর্থনা করেছে রাজা মেনিলাওস, হাত ধরে প্রাসাদ কক্ষে নিয়ে এসেছে, সেখানে রানীর সাজ সেজে অপেক্ষা করছে হেলেন অতিথি-বরণের জন্যে।

হেলেন চোখ তুলে দেখল প্যারিসকে, প্যারিস দেখল হেলেনকে। দুজনের চোখের পলক আর পড়ে না। স্বর্গের দেবতারা সেই দৃশ্য দেখে বিচিত্র হাসি হাসলেন।

এমনি হাসি তাঁরা হেসেছিলেন প্যারিসের জন্মলগ্নেও। তা নইলে ট্রয়ের রানী রত্নগর্ভা হেকিউবা প্যারিসকে জঠরে নিয়ে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখবেন কেন—তিনি যেন এক জ্বলন্ত মশালকে প্রসব করছেন—যার আগুনে প্রাসাদ পুড়ছে, নগর জ্বলছে, দাউ দাউ হুতাশন আইডার সানুবর্তী অরণ্যকে খাক করে দিচ্ছে।

চমকে জেগে উঠে স্বামীকে তিনি জাগালেন। একী স্বপ্ন আমি দেখলাম? কী অর্থ এই ভীষণ দুঃস্বপ্নের? সে রাত্রে রাজা প্রায়ামেরও আর ঘুম হোলো না।

সকাল হোতে না হোতে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ গণৎকারদের ডাকলেন রাজা-রানী। গণৎকাররা একবাক্যে বললেন—

এ স্বপ্নের একটি মাত্র অর্থ, রানীর গর্ভের সন্তান আগুন জ্বালাবে রাজ্যে,

ধ্বংস করবে রাজপরিবার, ছারখার করে দেবে রাজপ্রাসাদ।
রাজারানীর ছুজনেরই মুখ পাংশু হয়ে গেল।
মনকে শক্ত করতে হবে, মূর্তিমান সর্বনাশকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে হবে। এমনি আরো অনেক সন্তান রাণীর গর্ভে জন্মাবে।
কিন্তু বাপ-মা হয়ে নিজের হাতে নিজের সন্তানকে বধ করেন কী করে? সে পাপ কী কম? সদ্যোজাত পুত্রকে এক মেষপালকের হাতে তুলে দিলেন রাজারানী।
যাও একে আইডা পাহাড়ের মাথায় ফেলে এসো। সেখানে নৃশংস বন্যপ্রাণীরাই একে সাবাড় করুক। আমরা বাঁচি, রাজ্য বাঁচুক।
ট্রয়ের এই সদ্য-ভূমিষ্ঠ রাজনন্দন কিন্তু মরল না। বেঁচে রইল রানীর স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করবার জন্যে। আঁতুড়ঘর থেকে শিশুকে কোলে নিয়ে মেষপালক নিভৃতে বার হোলো। পার হোলো নগরের সীমানা। ট্রয়ের দক্ষিণে স্ক্যামাণ্ডার নদ, ছুপারে চাষের ক্ষেত, শ্যামল উপত্যকা। নদী উপত্যকা ছাড়িয়ে গভীর বন আইডা পর্বতকে ঘিরে। সেই পাহাড়ে ফেলে রেখে এলো শিশুকে।
ভাগ্য তার প্রসন্ন। এক মাদী ভাল্লুক স্তন্যছুগ্ধ দিয়ে তাকে বাঁচাল। তারপর আরণ্যকদের ঘরে সে আশ্রয় পেল। পশুপালক সমাজে সে মানুষ হতে লাগল। পালকপিতা তার নাম দিল প্যারিস।
ক্রমে বাল্য আর কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে পৌঁছল বনবাসী প্যারিস। বনের গভীরে আর পাহাড়ের গুহায় হিংস্র জন্তু শিকার করা তার খেলা। পাহাড়ের ঢালুতে আর বনের প্রান্তে গৃহপালিত পশুদের চরিয়ে নিয়ে বেড়ানো তার কাজ। কিন্তু শিরায় তার রাজরক্ত, রাজার ছেলে সে। যেমন তার রূপ, তেমন তার শক্তি। তার সুন্দর মুখ কুঞ্চিত কালো কেশ আর দীঘল চোখের ঘনপল্লব দেখে পল্লীবালারা ভোলে, তার দীর্ঘ দেহ, কবাট বক্ষ আর কঠিন মাংসপেশী দেখে গ্রাম্য যুবকরা তাকে হিংসা করে। শান্ত সরল বনবাসীরা তার দিকে তাকিয়ে ভাবে স্বর্গের কোন্

পথভ্রষ্ট দেবতা বুঝি সে।

কে বলে দেবতা আর মানুষে মিল নেই? স্বর্গের দেবতারা মর্তের মানুষের বাসনা কামনার অনেক উর্ধ্বে? স্বর্গনগচূড়া অলিম্পাসের মতো উন্নত উদার তাঁদের হৃদয়? দেবসমাজে প্রধানা দেবী জুনো, মিনার্ভা আর ভিনাস। তিন দেবীর মধ্যে হিংসাদ্বেষের শেষ নেই। কেউ কাউকে দেখতে পারেন না। ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে—আর তার ঝক্কি পোয়াবার জন্যে আছে মাটির মানুষ। মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধা আর পূজা-উপচার নিয়েই তাঁদের কাড়াকাড়ি।

জুনো ঐশ্বর্যের দেবী, দেবরানী তিনি। লোকে তাঁকে পূজা করে ধনের আশায়, মানের আশায়। মিনার্ভা শৌর্যবীর্যের দেবী—তাঁর বরে মানুষ বীর হয়, বিজয়ী হয়। আর প্রেমের দেবী ভিনাস। যে মূর্খ ধন চায় না, মান চায় না, বীরখ্যাতি চায় না, শুধু প্রেম চায়, প্রেমে পাগল হতে চায়—সেই করে ভিনাসের আরাধনা।

তিন দেবীর মনে তুষের আগুন। আমি বড়ো না তুমি বড়ো—আমার বেশি ভক্ত না তোমার? সেই সঙ্গে নারীসুলভ সনাতনী হিংসা—আমি বেশি সুন্দরী না তুমি? অলিম্পাসে রূপসী কে সবাকার চেয়ে?

এই আগুনে সোনার আপেলের ঘৃতাহুতি। দেবোদ্যানে আপেলের ছড়াছড়ি আর দেবতাদের প্রাসাদচূড়াও সোনা দিয়ে মোড়া। কিন্তু এ আপেল যে সে আপেল নয়। সোনার আপেলের গায়ে সোনার অক্ষরে লেখা—শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর জন্যে!

আর যায় কোথায়?

পসেনিয়াস দেখেছিলেন সোনা আর হাতির দাঁতে গড়া দেবী জুনোর বিরাট মূর্তি আর্গসের মন্দিরে। শিল্পীর নাম পলিক্লিটাস। এথেন্সের পার্থেননে ছিল দেবী মিনার্ভার বিশাল স্বর্ণবিগ্রহ, ফিডিয়াসের হাতে

গড়া। আমরা এসব দেখতে পাব না। প্র্যাক্সিলেটিস রচিত দেবী ভিনা-সের মূর্তি দেখার অমৃত স্বাদও এ যুগের মানুষের নিতান্ত ঘোলে মেটে, রোমান অনুকৃতি আর তস্য কপির ওপর চোখ বুলিয়ে। কিন্তু এই তিন দেবীকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়েছেন চিত্রশিল্পী রুবেন্‌স।

সুন্দরের সাধনা আর শিল্পের প্রেরণার জন্যে গ্রীক পুরাণের প্রতি রুবে-ন্‌সের আকর্ষণ। পৌরাণিক দেবদেবীকে নিয়ে ভয় ভক্তি নেই। শুধু সুন্দরের অনুভূতি। তাই বর্ণহীনা শিলাময়ী শ্রদ্ধাবন্দিতা স্বর্গদেবী তিনি সৃষ্টি করেন নি।

রুবেন্‌সের বিখ্যাত তৈলচিত্র 'প্যারিসের বিচার'। সেই চিত্রে অলি-ম্পাসের দেবীরা তপ্ত ক্যানভাসের ওপর চোখ ধাঁধানো রঙে আর মনমাতানো রসে টইটম্বুর হয়ে এক বিহ্বলদৃষ্টি তরুণের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। জুনো, মিনার্ভা আর ভিনাস—পাশাপাশি তিন দেবী—সোনার রঙের চুল, ডালিমের মতো রঙ, আপেলের মতো যুগল বুক, সমুদ্র ঢেউয়ের মতো শ্রোণী আর শঙ্খের মতো উরুসন্ধি। সুনীল আকাশের নিচে দিনের প্রশান্ত আলোয় সুস্পষ্ট নগ্নতায় উদ্ভাসিত। মাথা থেকে পা পর্যন্ত দিগ্‌বসনা নিটোল দেহের প্রতিটি উচ্ছল রেখায় বাসনার আমন্ত্রণ উচ্চারিত।

বলো তরুণ, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী কে?

ঐ তরুণ প্যারিস।

দেবরাজ জুপিটারের নির্দেশ। আইডা পাহাড়ের নির্জন সানুদেশে এক ঝাঁকড়া অলিভগাছের ছায়ায় মেষপালকের পালিত পুত্র প্যারিস পা ছড়িয়ে বসে আছে.—দূতের হাতে জুপিটার তার কাছে পৌঁছে দিলেন ঐ সোনার আপেল। তিন দেবীকে নির্দেশ দিলেন—

যাও, ঐ প্যারিসের কাছে যাও! সেই বিচার করে দেবে তোমাদের মধ্যে সুন্দরীতমা কে?

তিন দেবী তিন দিক থেকে প্যারিসকে ধরেছেন। পেছন দিকে মোটা গাছের গুঁড়ি। দেবীদর্শনে দিশেহারা প্যারিস—পালাবার উপায় নেই। চোখের সামনে নগ্ন উজ্জ্বল তিনটি বহ্নিশিখা যেন। নেহাত জুপিটারের নির্দেশ—নইলে এক ঝলকেই অন্ধ হয়ে যেত বেচারী মর্তমানুষের চোখ।
আমি ?
আমি আপনাদের রূপের পরীক্ষা করব ? কেমন করে ? কী যোগ্যতা আমার ?
দেবীদের চোখের দর্পণে প্যারিস নিজেকে দেখলেন, দেবীদের কথায় আত্মপরিচয় লাভ করলেন।
দেবীরা বললেন—
তুমি তরুণ, তুমি শ্রেষ্ঠ রূপবান, তুমি আত্মবিস্মৃত রাজপুত্র। তোমার চোখে বিভোল যৌবনের বিভা। দেবরাজ ঠিকই ধরেছেন। আমাদের রূপের বিচার তোমার চেয়ে ভালো করবে কে ?
কিন্তু অনেক রত্ন না ঘাঁটলে কি রত্ন চেনা যায় ? দেবী তো স্বপ্নদুর্লভা, এই পৃথিবীর নাগরিকা কামিনীদেরও কাউকেই প্যারিস চোখে দেখে নি এ পর্যন্ত। বনেই তার বাস। মেয়ে বলতে একটি মাত্র বনবাসিনীর সঙ্গেই তার একটু ভাব-ভালবাসা। মেয়েটি অবশ্য অসুন্দরী নয়। নামটিও মিষ্টি—ইনোনি। একলা থাকলে প্যারিস এই একটি নামই উচ্চারণ করে, গাছের গুঁড়িতে ছুরি দিয়ে এই নামটিই খোদাই করে।
এই একটি অরণ্যকামিনীর ঘনিষ্ঠতার অভিজ্ঞতাটুকু প্যারিসের সম্বল—এই নিয়ে সে স্বর্গের দেবীদের সৌন্দর্য বিচার করবে ? এতো নেকড়ে বাঘের সঙ্গে লড়াই করা নয়, তীর মেরে ভালুক শিকার নয় !
গত তিনশো বছর ধরে রুবেন্‌সের 'আঁকা প্যারিসের বিচার' ছবির দিকে মানুষের পলকহারা চোখ তাকিয়ে আছে। জুনোর দিকে, মিনার্ভার দিকে, ভিনাসের দিকে। চিত্রের দেবীদের চোখে ভাষা, মুখে ভাষা নেই। তাই এ পর্যন্ত কেউ বিচার করে বলতে পারে নি তিনদেবীর মধ্যে

সবচেয়ে রূপসী কে !

কিন্তু প্যারিস পেরেছিল। দেবীরা তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, লোভ দেখিয়েছিলেন। প্রত্যেকেই ভেবেছিলেন অনভিজ্ঞ অপরিণত বুদ্ধি হাকিমই ভালো। মূর্খের সহায় লোভ। লোভ দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে।

স্বর্গের সম্রাজ্ঞীর মতোই জুনো বললেন—

এই সোনার আপেল তুমি যদি আমাকে দাও তাহলে তোমাকে বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করে দেব, সারা ভুবন জয়ধ্বনি করবে তোমার রাজ-মহিমায়। দুনিয়ার সব সম্পদ এনে দেব তোমার হাতের মুঠোয়।

সঙ্গে সঙ্গে দর্পিতা দেবী মিনার্ভার ঘোষণা—

বীর্যহীন রাজদর্প তো অরণ্যের আগুন! নিজে পোড়ে, অপরকেও পোড়ায়। তাতে সুখ কী ? সম্মান কী ? রাজত্ব ঘুচে যায়, গুঁড়িয়ে যায় রাজপ্রাসাদ। বীরের সর্বত্র পূজা, সর্বকালের স্মৃতিতে তার অমর আসন। সোনার আপেলটি আমার হাতে তুমি তুলে দাও—সেই অমরত্বের আসনে আমি তোমাকে বসাব।

এবার সামনে এলেন প্রেমের দেবী ভিনাস। একেবারে কাছে এসে দাঁড়ালেন। কম্প্রমধুর অস্ফুট কণ্ঠে গুঞ্জন করলেন—

ঐ সোনার আপেল আমাকে দেবে না প্যারিস ? আমি তোমাকে রাজার ঐশ্বর্য দেব না, বীরের সম্মান দেব না—আমি দেব প্রেম। যে প্রেমে সুখ যেমন আছে, দুঃখও তেমন আছে। আনন্দ যতো আছে বেদনাও আছে ততো। শ্রেষ্ঠ রাজা তুমি না হলে, না হলে শ্রেষ্ঠ বীর—আমি তোমাকে দেব মর্তের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর ভালবাসা !

ভিনাসের হাতে সোনার আপেল তুলে দিতে দ্বিধা করলেন না প্যারিস। দেবীরা অন্তর্ধান করলেন। চিহ্ন পড়ল প্যারিসের ভাগ্যে—আশীর্বাদের সঙ্গে অভিশাপের।

পলকে এক স্বর্গীয় স্বপ্ন যেন ভেঙে গেল। প্যারিস জেগে উঠল বাস্তবে।

প্রেমদেবী ভিনাসের আশীর্বাদের শিরস্ত্রাণ মাথায় পরে আর নবলব্ধ আত্মপরিচয়ের বর্মে সজ্জিত হয়ে প্যারিস দৃঢ়পায়ে নেমে এলো পর্বতসানু থেকে। অরণ্যভূমি পার হয়ে সোজা সে এগিয়ে চলল নগরের দিকে। অরণ্যবালা ইনোনির আকুল ডাক তার কানে পৌঁছল না।
পূর্ব তোরণ দিয়ে ট্রয় নগরে প্যারিস ঢুকল—আগুনের মশাল এসে ঢুকল রাজধানীতে।

পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে ট্রয় রাজ্যে। প্রতিটি প্রজার সুখ সমৃদ্ধিভরা নিশ্চিন্ত জীবন। নাগরিক যাত্রায় কোথাও ছেদ নেই, দ্বন্দ্ব বাধা নেই। রাজধানীর উন্মুক্ত মহাদ্বার। সেই দ্বার দিয়ে হাজার লোকের আনা-গোনা। যাওয়া আসা করছে প্রজা আর রাজপুরুষ, শিল্পী আর কবি, বণিক আর দূত, পর্যটক আর রাজ-অতিথি।
প্যারিস এলো।
কাউকে সে চেনে না, কেউ চেনে না তাকে। তাকে অভ্যর্থনা করার কেউ নেই, বাধা দেবারও কেউ নেই। সোজা পক্ষে সে পৌঁছল রাজপ্রাসাদে। দেবতার বরে সে জেনেছে নিজের পরিচয়, আত্মাদরের আলোয় উজ্জ্বল তার চোখ, গর্বভরা বুক।
মাথা উঁচু করে দাঁড়াল রাজা প্রায়ামের মুখোমুখি।
আমি এসেছি।
কে তুমি ?
আমি আপনার পুত্র—প্যারিস। যার মৃত্যুকামনা আপনি করেছিলেন। জন্মের মুহূর্তে যাকে আপনি মৃত্যুর মুখে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন।
তুমি ? আমাদের হারানো ছেলে ? তোমার নাম প্যারিস ?
হ্যাঁ, তবে হারানো নয়, পরিত্যক্ত। ভগ্যের কৃপায় আমি মরি নি। ভাগ্যের নির্দেশে জন্মের দাবী নিয়ে আবার আপনার কাছে ফিরে এসেছি।

তরুণ যুবা। আগুনের মতো রঙ, ফাগুনের মতো যৌবন। কী চুলের বাহার, কী চোখের দ্যুতি, কী দৃপ্ত ভঙ্গি! কে এই আশ্চর্য আগন্তুক যাকে কেউ চেনে না কেউ ডাকে নি, যার হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে রাজসভা ঝলসে উঠেছে! আর স্থির গম্ভীর কণ্ঠে কী তার ভাষা—

আমি রাজপুত্র, রাজরক্ত আমার শিরায়—রাজসম্মানে আমার জন্মগত অধিকার!

প্রায়াম আবার গণকদের ডাকলেন। এই অচেনা যুবক দাবী করছে আমার ছেলে বলে। সত্যি?

প্রাজ্ঞ গণকরা সুনিপুণ পরীক্ষা করলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করলেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উত্তর বার করলেন। প্রতি অঙ্গে লক্ষ্য করলেন রাজচিহ্ন, কণ্ঠস্বরে শুনলেন রাজকণ্ঠের প্রতিধ্বনি। তাঁরা নিঃসংশয় হয়ে ঘোষণা করলেন—

প্যারিস রাজপুত্রই বটে!

প্রৌঢ় প্রায়ামের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। বহু পুত্রের জনক তিনি, কিন্তু এক হেকটর ছাড়া এমন চেহারা এমন দীপ্তি আর কারো নেই। আর রানী হেকিউবা যেন স্বপ্ন দেখছেন! এমন আশ্চর্য সত্যি স্বপ্ন ছাড়া হয় নাকি? সত্যি বলে বিশ্বাস করতে বিস্ময়ে পুলকে বুক কেঁপে ওঠে! আপন গর্ভের সন্তান, যার মুখের দিকেও তাকান নি, কোলেও তোলেন নি। পেট থেকে পড়তে না পড়তে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, দেবতার মতো রূপ নিয়ে সে আবার কোলের কাছে ফিরে এসেছে। এই তো আমার হেলায় ফেলে দেওয়া হারানো রতন!

চকিতে সেদিনের সেই স্বপ্ন মনে পড়ল রাণীর। ঘুমের মধ্যে সেদিন যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সে তো স্বপ্নই! আজ খোলা চোখে যে স্বপ্ন তিনি দেখছেন—এই তো সত্য স্বপ্ন। সত্যিই তো জলন্ত মশাল এসেছে রাজপুরীতে। মশালের মতোই সারা রাজসভা আলোয় ভরে দিয়েছে! আলোরই মতো মিথ্যা ভয়ের তমিস্রাকে অপসরণ করে ঘোষণা

করছে—

আমি তোমার পুত্র, আমি এসেছি।

প্যারিস ? তোর নাম প্যারিস ?

প্যারিসকে বুকে টেনে নিলেন মা হেকিউবা।

এশিয়া মাইনরের পশ্চিম সমুদ্রতীরে মাটি খুঁড়ে স্লীম্যান আবিষ্কার করেছেন ট্রয়ের কঙ্কাল। সেই কঙ্কালে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হলে উচ্চারণ করতে হবে কাব্যের মন্ত্র, কল্পনার মন্ত্র।

মহাকবি হোমারের কাব্যে ট্রয়ের বর্ণনা আছে—রাজা প্রায়ামের ট্রয়। বিরাট নগর। শুধু নগর নয়, দুর্গনগর, পাথরের প্রচণ্ড প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের গায়ে গায়ে উচ্চ অট্টালিকা আর স্তম্ভশীর্ষ। প্রাচীরের মাঝে মাঝে অনেকগুলি বহির্দ্বার। তাদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা স্কীয়ান তোরণ। এই তোরণের সামনে পশ্চিম সমুদ্রতীর। স্কীয়ান তোরণের গায়েই ট্রয়ের বিরাট বুরুজ। এই বুরুজের মাথায় বসে সমুদ্র চক্রবাল পর্যন্ত চোখে পড়ে। দক্ষিণদিকের ডাডানির্য়ান তোরণটিও কাব্যে বহুবার উল্লিখিত। এই তোরণের মুখ ডার্ডানিয়া রাজ্যের দিকে, স্ক্যামাণ্ডার নদী আর আইডা পর্বত ছাড়িয়ে ডার্ডানিয়া ট্রয়ের অনুগামী মিত্র। ট্রয় রাজবংশেরই নিকট আত্মীয়ের দখলে।

ট্রয়ের অধিবাসী কারা? প্রথমেই বলতে হয় রাজা আর রাজপরিবারের কথা। তাঁরা বাস করেন বিশাল প্রাসাদে। প্রাসাদের মাঝখানে উদার সভাকক্ষ—স্তম্ভ ঘেরা চওড়া বারান্দা দিয়ে শোভিত, তাছাড়া রাজা-রানীর নিজের কক্ষ। আরো প্রায় পঞ্চাশটি কক্ষ—তাতে প্রায়ামের পঞ্চাশ জন ছেলের বাস। বাঁধানো প্রাঙ্গনের পারে মেয়েমহল—সেখানে কক্ষ অন্তত বারোটি। প্রায়ামের প্রতিটি কন্যার জন্যে এক একটি কক্ষ। এ ছাড়া প্রাসাদ-চত্বরে আরো রয়েছে কয়েকটি বড়ো বড়ো অট্টালিকা। প্রধান রাজপুত্রদের জন্যে। যেমন হেকটরের প্রাসাদ,

প্যারিসের প্রাসাদ, ডিইফোবাসের প্রাসাদ।

মন্দিরময় নগর ট্রয়। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রাজপথের মোড়ে বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির। প্রধান দুটি মন্দির অ্যাপোলো আর মিনার্ভার। এই দুই মন্দির প্রাসাদ সংলগ্ন—পূজা দেন রানী হেকিউবা আর অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলারা।

রাজপ্রাসাদের পাশে প্রশস্ত মন্ত্রণাগৃহ। এই গৃহে বসে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য ও মন্ত্রীদের সঙ্গে রাজ্যশাসন বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা করেন রাজা।

বিশাল নগর পশ্চিম থেকে পূব দিকে ছড়ানো। পশ্চিমে স্কীয়ান গেটের পেছনে নগরের সম্ভ্রান্ত অংশ। শক্তিমান আর বিত্তশালী নাগরিকদের বাস। সারা শহরে চওড়া চওড়া পাকা রাস্তার জাল বিছানো। রাস্তার ধারে ধারে ছোট বড়ো অসংখ্য ঘরবাড়ি—অগুনতি দোকান বাজার। প্রচুর লোকসংখ্যার—ট্রয়ের অধিবাসীদের মধ্যে সৈন্য আছে, রাজ-কর্মচারী আছে, চারুশিল্পী কারুকার আছে, বণিক আছে, দোকানী কৃষক শ্রমিক আছে। পুরোহিত আর গণকদের খুব সম্মান। নগর-সীমানার বাইরে উদ্যান আর কৃষিক্ষেত্র। সেখানে যারা কাজ করে তাদেরও অধিকাংশ শহরে এসে রাত কাটায়। আশেপাশের রাজ্য থেকে বহু লোক ট্রয়ে এসে ভিড় জমায়। বড়ো বড়ো গোলা আর গুদাম—সৈন্য-ছাউনি, অস্ত্রশালা, অশ্বশালা, রথশালা। দুর্মদ দুর্দান্ত দুর্গনগর প্রাচীন ট্রয়ের স্মৃতি এ যুগের মানুষের মনেও আছে। তাই ট্রয়ের আধুনিক নাম হিসারলিক– যার মানে দুর্গ।

পুরাণ কাহিনী অনুসারে ট্রোজানদের পূর্বপুরুষরা এসেছিল ক্রীটদ্বীপ থেকে স্ক্যামাণ্ডার বলে এক অভিযাত্রীর নেতৃত্বে। সেই অভিযাত্রীর নামে ট্রয়ের নদীর নাম স্ক্যামাণ্ডার। পুরাণের আর এক কাহিনী অনুসারে ঈজিয়ান সমুদ্র পার হয়ে ফ্রিজিয়ায় প্রথম যিনি যান তিনি ছিলেন গ্রীসের এথেন্স রাজ্যের অধিবাসী—নাম ডার্ডানাস। ওপারে গিয়ে তিনি

ডার্ডানিয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে ঈজিয়ানের এপারে ওপারে সম্পর্কের বাঁধন পড়ে। তারপর সমুদ্রতীরে পত্তন হয় ট্রয় নগরের। ট্রয়ের আদি অধিবাসীরা এসেছিল হয় ক্রীট থেকে নঃ হয় গ্রীস থেকে। আর তারা সঙ্গে এনেছিল মিনোয়ান-মাইকেনিয়ান সভ্যতার ঐতিহ্য। ক্রীট মাইকেনি ট্রয় একই সংস্কৃতির বাঁধন। জুপিটার আবির্ভূত হয়েছিলেন ক্রীটের আইডা পর্বতের শিখরে। তাঁরই সম্মানে ট্রয়ের পর্বত শিখরেরও নাম আইডা। তাঁর আশীর্বাদপূত নগর ট্রয়। আবার এথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মিনার্ভাও ট্রয়ের বরদাত্রী। ট্রয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম ট্রস। তাঁর নামে রাজ্যের নাম ট্রয়। ট্রসের পূর্বপুরুষ ইলাস। তাঁর নামে ট্রয়ের আরএক নাম ইলিয়াম। ইলাসকে দেবী মিনার্ভা উপহার দিয়েছিলেন তাঁর নিজের হাতে গড়া এক দেবীমূর্তি—নাম প্যালেডিয়াম। মিনার্ভার মন্দির গড়ে তাতে এই প্যালেডিয়ামের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইলাস। মিনার্ভা বর দিয়েছিলেন—এই প্যালেডিয়াম যতোদিন ট্রয়ের মন্দিরে থাকবে ততোদিন বরাভয়।

এই আশীর্বাদ-ধন্য ট্রয় নগরে একবার দাস্যবৃত্তি করতে এলেন দুই দেবতা—নেপচুন আর অ্যাপোলো। দেবরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শাস্তি। কড়া শাস্তি দিয়েছিলেন জুপিটার। আপন ভাই আর প্রিয় পুত্রকে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত করে মানুষের দাসত্ব করতে পাঠিয়েছিলেন পৃথিবীতে।

কার অধীনে দাসত্ব?

ট্রয়ের রাজা লাওমেডনের।

রাজার সামনে এসে দুই দেবতা মেঘগম্ভীর গলায় হাঁকলেন—

আমরা তোমার দাস। কী করতে হবে হুকুম করো।

লাওমেডন বললেন—

আমার রাজধানী ঘিরে এমন একটা প্রাচীর বানিয়ে দিন যার একটা

পাথরও মানুষ না খসাতে পারে—শত্রু যাঁর সামনে থেকে চিরকাল মাথা নিচু করে ফিরে যায়।
প্রাচীর শেষ হবার পর ?
আপনাদের দাসত্বও শেষ হবে। আপনাদের মুক্তি তো দেবই, সঙ্গে অনেক পুরস্কারও দেব।
প্রাচীর শেষ হলো।
লাওমেডন দেখেশুনে খুশি হয়ে বললেন—
বহুৎ আচ্ছা ! এবার আপনারা বিদেয় হতে পারেন।
আমাদের পুরস্কার ?
লাওমেডন যেন আকাশ থেকে পড়লেন।
পুরস্কার ? দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্তি দিলাম। তাতে হলো না, আবার পুরস্কার চাই ? দেবতা হয়ে এতো লোভ ? ছি !
বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল মিলতে দেরি হলো না। ট্রয়ের প্রাচীরের দৈবী দুর্লঙ্ঘতার বর ফিরিয়ে নিয়ে দেবতারা অন্তর্ধান করলেন। অ্যাপোলোর অভিশাপে মড়ক লাগল রাজ্যে—বহু প্রজা উজাড় হয়ে গেল। আর নেপচুনের নির্দেশে একটা বিরাট সমুদ্র-দানব ট্রয়ের সমুদ্র-তীরে উঠে এলো। এক-বার নয়—তার আবির্ভাব প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট সময়ে। প্রতি বছর একটি করে সুন্দরী যুবতী তার চাই—তাকে পেটে পুরে শান্ত হয়ে তবে সে আবার সমুদ্রে ফিরে যায়।
বেশ কয়েক বছর ধরে অভিশাপ চলল। তারপর একদিন হারকিউলিস এলেন ট্রয় রাজ্যে। তীরে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল। এক পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে এক সুন্দরী মেয়ে, গায়ে তার শুধু শৃঙ্খলের অলঙ্কার। এই নারী রাজকুমারী হেসিয়নি, সমুদ্র-দানবের এ বছরের বলি।
বন্দিনীর শৃঙ্খল মোচন করলেন হারকিউলিস। হাত ধরে নিয়ে গেলেন ট্রয়ের প্রাসাদে। রাজা লাওমেডনকে বললেন—

সুসময়েই আপনার রাজ্যে আমি এসেছি। আর ভয় নেই—ঐ দানবকে আমি বধ করব, নেপচুনের অভিশাপ থেকে মুক্ত করব আপনাকে।
লাওমেডন গদগদ। দুহাতে চেপে ধরলেন হারকিউলিসের হাত।
যদি পারো, যা চাও তোমাকে দেব। চাই কি রাজকন্যাকেও!
রাজকন্যায় লোভ নেই হারকিউলিসের। মাথা নেড়ে বললেন—
আপনার অশ্বশালা থেকে দুটি সাদা ঘোড়া আমাকে দেবেন, তাহলেই খুশি হব। আমার অশ্বশালায় ওরা বংশবৃদ্ধি করবে। এমন জাতের ঘোড়া আমার নেই।
আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন লাওমেডন।
সমুদ্র দানবকে ধ্বংস করলেন হারকিউলিস।
কই এবার—আমার ঘোড়া?
দাম্ভিক রাজা লাওমেডন এবারও কথা রাখলেন না। কার্যসিদ্ধি হবার পর হাঁকিয়ে দিলেন হারকিউলিসকে। অপমানে রক্তমুখ হারকিউলিস ফিরে গেলেন।
জ্বালা মেটাবার সময় এলো কয়েক বছর পরে। গ্রীসের বীর সুহৃদদের একসঙ্গে জড়ো করে লাওমেডনকে শাস্তি দিতে ট্রয় যাত্রা করলেন হারকিউলিস।
এমনি অতর্কিত আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না লাওমেডন। এও হয়তো ভেবেছিলেন, দেবতাদের হাতে গড়া প্রাচীর থাকতে ভাবনা কী? সেই প্রাচীরের এক অংশের পাথর খসালেন হারকিউলিস—নগরের মধ্যে ঢুকলেন। সঙ্গে দলবল—প্রিয় সঙ্গী টেলামন, স্যালামিসের রাজপুত্র। শত্রুদলের আক্রমণে অসতর্ক ট্রোজান সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।
টেলামনের হাতে যুদ্ধবিজয়ের ভার দিয়ে হারকিউলিস ছুটলেন ট্রয়ের প্রাসাদে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে। লাওমেডনের মাথা হারকিউলিস এক কোপে কাটলেন। তারপর রাজপুত্রদের পালা। তলোয়ারের এক

একটি ঘা—আর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এক একটি ছেলের রক্তাক্ত দেহ। কনিষ্ঠ পুত্রের মাথায় যখন অস্ত্র উঠেছে ঠিক সেই মুহূর্তে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক নারীমূর্তি। হারকিউলিসের পা জড়িয়ে ধরে আর্ত চিৎকার করে উঠল—

আমার শেষ ভাইটাকে বাঁচতে দাও, তার বদলে আমাকে খুন করো।

কে এই নারী ?

রাজকুমারী হেসিয়নি। যাকে হারকিউলিস একদিন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন—এই হত্যা এই ধ্বংসের যে মূল। আবার সে হারকিউলিসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, কাতর নিবেদন করছে—

আমাকে তোমরা মারো, আমার প্রাণ নিয়ে তোমরা প্রতিহিংসার তৃষ্ণা মেটাও!

হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দিলেন হারকিউলিস। লাওমেডনের কনিষ্ঠ পুত্র প্রায়ামকে শুধু প্রাণেই রাখলেন না—বসালেন পিতৃসিংহাসনে। তার বদলে হেসিয়নিকে বাঁধলেন শেকলে। তাকে উপহার দিলেন বন্ধু টেলা মনের হাতে। টেলামন হেসিয়নিকে তুলে নিলেন জাহাজে।

প্রায়ামের দীর্ঘ রাজত্বক স ট্রয়ের স্বর্ণযুগ। প্রায়াম নতুন প্রাসাদ-নগর গড়েছেন, প্রাচীর আরো সুদৃঢ় করেছেন, আরো চমৎকার করেছেন প্যালেডিয়ামের মন্দির। ঈজিয়ান সমুদ্রের ওপর দিয়ে বাণিজ্য তরীর আনাগোনা বেড়েছে। সাগরযাত্রী বণিকদের উপঢৌকনে প্রায়ামের রাজকোষ আরো ফুলে ফেঁপে উঠেছে। দিনে দিনে প্রায়ামের ট্রয় পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ নগর-রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

প্রজাবৎসল বিচক্ষণ রাজা প্রায়াম। তিনি স্বৈরাচারী নন, বিচক্ষণ অমাত্যদের পরামর্শ মেনে রাজ্য শাসন করেন। তাঁদের সঙ্গে বয়স্য সখার মতো ব্যবহার করেন। প্রজাদের পুত্রবৎ স্নেহ করেন। রানী হেকিউবা রত্নগর্ভা। উনিশটি সন্তানের তিনি জননী। জ্যেষ্ঠ পুত্র হেকটর—

বজ্রের চেয়ে কঠোর, কুসুমের চেয়ে কোমল। শৌর্যে অতুলনীয়, তেমনি অতুলনীয় স্নেহপ্রেমের মাধুর্যে। ডার্ডানিয়া আর ট্রয় একই শাসনের অধীনে। প্রায়ামের ভ্রাতুষ্পুত্র ঈনিয়াস ডার্ডানিয়ার রাজপুত্র। ট্রয় নগরেই প্রায়াম তার প্রাসাদ বানিয়ে দিয়েছেন। সে ট্রয়েরই এক সেনাপতি--হেকটরের প্রিয় বন্ধু।

রাজকন্যাদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় ক্যাসানড্রার নাম। সে যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী। দেবতার কৃপায় সে এক আশ্চর্য শক্তির অধিকারিণী। ভবিষ্যৎ তার চোখে ভাসে। সে যা বলে তা সত্যি হয়। লোকে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক।

নিরবচ্ছিন্ন সুখশান্তির মধ্যে একটি দুঃখ কেবল রাজরানীর মনে আছে। একটি গোপন জ্বালা নিভৃত অবসরে তাঁদের মনকে পোড়ায়। পুত্র-হত্যার রক্ত অবশ্য হাতে লেগে নেই, কিন্তু নিজের এক সন্তানকে দূর করেছেন তাঁরা নিজেরাই। চোখ ফুটে সে দেখে নি পৃথিবীর আলো, মা-বাপের মুখ—তার আগেই তাকে তাঁরা ধ্বংস করেছেন।

সেই ছেলে মরে নি, এতোদিনে ফিরেছে তরুণ যুবা হয়ে। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, মা-বাবা বলে ডেকেছে।

আর কোনো দুঃখ নেই। সব আশা পুরেছে, আনন্দের বান ডেকেছে বুকে। আনন্দের উৎসব জেগেছে সারা ট্রয় রাজ্যে।

১০

যাদৃশী ভাবনার্যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। যে যেমনটি চায়, তেমনটিই সে পায়। কিন্তু চাওয়া নিতান্ত সহজ—চাইলেই পাওয়া যায় না। যা চাই তার প্রতি ভাবিত হতে হয়। প্রাপনীয়ের প্রতি একনিষ্ঠ হতে হয়।

রাজা মিডাসকে বর দিতে চেয়েছিলেন দ্রাক্ষার দেবতা ডায়োনিসাস। বলো—কী বর তুমি চাও। মেজাজী রাজা বললেই পারতেন—প্রভু, এমন একটি সুরাপাত্র দাও যার পানীয় কখনো ফুরাবে না, উলটো ভাঁড় সোজা করলেই আপনি ভরতি হবে।

তা না বলে মিডাস বললেন—

এই বর দিন, আমি একটি আঙুলে যা ছোঁব তাই যেন সোনা হয়ে যায়!

স্বর্ণসন্ধানই মিডাসের একমাত্র সাধনা, স্বর্ণই একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। সেই সাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন মিডাস, দেবতার বর সত্য হয়েছিল তাঁর জীবনে। সোনার পাহাড়কে সিংহাসন করে তার ওপর বসেছিলেন পৃথিবীর সমৃদ্ধতম নরপতি। তাঁর সৌভাগ্য দেখে দেবরানী জুনোও তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন।

আর প্যারিস? তোমার কী ভাবনা? কোন্ সাধনায় সিদ্ধি চাও তুমি? কোন্ ভাগ্য তোমার বরণীয়?

মহাভাগ্যবান প্যারিস। পুরুষের ত্রিস্রোতা আকাঙ্ক্ষা তিন দেবীমূর্তি হয়ে তার মরচক্ষের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে। চাও কি রাজার প্রতাপ আর ঐশ্বর্য? না চাইনে। চাও কি বীরের শক্তি আর মান? না, তাও চাইনে।

কী চাও তবে ?

চাই সুখদুঃখের জীবনঘটে ভরা প্রেমের অমৃত। ধন নয়, মান নয়, খ্যাতি নয়, সম্পদ নয়—শুধু ভালবাসা।

প্যারিসকে দেবী ভিনাস দিলেন এক আশ্চর্য বর—যা রাজা পায় না, বীর পায় না। প্যারিস চেয়েছিল বলেই পেয়েছিল। পরমাসুন্দরী রমণী তার করায়ত্ত হবে ছলে কিংবা বলে—এ বর ভিনাস তাকে দেন নি। পরস্ত্রী হরণের প্রলোভন তাকে দেখান নি। দেখালে জুনো আর মিনার্ভার বরের মতো সে বরও সে প্রত্যাখ্যান করত। ভিনাসের বরে প্যারিস পেয়েছিল দুর্লভ ধন—ধনৈশ্বর্যের বিনিময়ে যাকে কেনা যায় না, শক্তি দিয়ে হিংসা দিয়ে যাকে জয় করা যায় না। পুরাণের কোনো পুরুষ কখনো যা চায় নি কখনো যা পায় নি—সেই অপূর্ব ধন, হৃদয়ের প্রেম।

আকাঙ্ক্ষা তো আকাশের চাঁদ—তাকে পাওয়া কি অমনি অমনি ? সাধনা না করলে সিদ্ধ হবে কেমন করে ? যুদ্ধ না করলে বীর হওয়া যায় না, রাজ্য না জুটলে রাজা হওয়া যায় না। তেমনি প্রেম যদি পেতে চাও, প্রেমিক হও, প্রেমের সাধনে মত্ত হও, প্রেমের সন্ধান করো প্রেমময় হৃদয়ে। প্রেম আর কোথাও নেই—ফুল হয়ে ফুটে আছে প্রেমিকার হৃদয়-কাননে।

ভিনাস যে-সে বর দেন নি, বলেছেন—কাননের যে শ্রেষ্ঠ ফুল তার বুকে যেমন মধুরতম মধু, তেমনি ভুবন আলো করা যে নারী তার বুকে প্রিয়তম অমৃত। সেই অমৃতের সাধনায় তুমি সিদ্ধ হবে।

কোথায় সে রমণী কুসুম ? কী তার নাম ? কোন্ কাননে বাস ? কোথায় মিলবে তার সন্ধান ? বর দিয়েছেন যিনি, তিনিই দেবেন বরলাভের নিশানা। নইলে বর তো নিস্ফল, আশীর্বাদ তো শুধু মুখের কথা ! দেবী বললেন—

সমুদ্রের ওপারে গ্রীস দেশ। সেই দেশের মহতী নগরী স্পার্টা। স্পার্টার রাজপ্রাসাদে আছে মেনিলাওসের রানী হেলেন। তারই বুকে প্রেমের

মধু, তারই চোখে প্রেমের ভাষা। সমুদ্রে তরণী ভাসাও, তাকে জয় করে নিয়ে এস।

বাহুবলে?

না, প্রেমের বলে। জানো না প্রেমের শক্তি দিয়েই প্রেমকে জয় করা যায়, প্রেমের ফাঁদেই প্রেমের পাখি ধরা পড়ে? দেহের শক্তিতে নারীর দেহকে বন্দী করা যায়—নারী প্রেমিকা হয় অনুরাগের বাঁধনে!

বেশ যাব। কিন্তু আমার প্রেম যদি সে ফিরিয়ে দেয়?

তাহলে মিথ্যা হবে আমার আশীর্বাদ।

হেলেন? হেলেন তোমার নাম?

প্যারিস দিনরাত জপ করে হেলেনের নাম। তার শয়নে স্বপনে মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে হেলেনের মুখ।

কেমন সে মুখ? চোখে তো দেখি নি। কেমন তার রূপ? তাও তো জানিনে। সত্যিই কি সে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা? নিশ্চয়ই—সে যে মূর্তিমতী ভালবাসা! প্রেমিকের চোখে প্রেমিকার চেয়ে সুন্দরী আর কেউ আছে নাকি?

প্যারিস ভাবে, সুনীল সাগরের কোন্ দুরন্ত প্রান্তে পাথরের কোন্ দুর্মদ প্রাসাদে মূর্ছিত হয়ে আছে কোন্ ভাষাহারা প্রেম—স্পন্দনহারা শীতল তুষারের মতো। কবে তার কাছে যাব—কবে আমার প্রেমের যাদুর ছোঁয়ায় তার মূর্ছা ভাঙবে? কবে তুহিন প্রেম আমারই প্রাণে প্রবাহিনী হবে আমারই প্রেমের উত্তাপে?

হেলেন? হেলেন তার নাম?

পেতেই হবে হেলেনকে, যেতেই হবে স্পার্টায়।

সমুদ্রযাত্রার অছিলা পেতে দেরি হলো না। পরিত্যক্ত ছেলে প্যারিসকে মনে না পড়লেও দুখিনী বোন হেসিয়নিকে এক দিনের জন্যে ভোলেন নি

প্রায়াম। হেসিয়নির জন্যেই তিনি প্রাণ পেয়েছেন, রাজ্য পেয়েছেন। ভাগ্যবন্ত হয়ে সিংহাসনে বসে এই যে রাজত্ব করছেন—এই ভাগ্য তো হেসিয়নিই তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বন্দিনী হয়ে বিদেশে চলে গেছে।

হারকিউলিস তাকে প্রাণে মারে নি, এক দানবের হাত থেকে রক্ষা করে আর এক দানবের হাতে তুলে দিয়েছেন। যতোদিন যৌবন ছিল টেলামন তাকে রক্ষিতার মতো ভোগ করেছে। এখন সে তার রাজ-পুরীতে দাসীবৃত্তি করে দুঃখী জীবন কাটাচ্ছে। কতোবার স্যালামিসে দূত পাঠিয়েছেন প্রায়াম হেসিয়নিকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে। টেলামন হাঁকিয়ে দিয়েছে দূতকে। চিরবন্দিনী চিরদুঃখিনী বোনটি আমার!

শুধু রাজা প্রায়ামেরই নয়, হেসিয়নির অপহরণ সারা ট্রয়বাসীর নির্মম দুঃখ, মর্মান্তিক লজ্জা। তারা জানে হেসিয়নি ট্রয়ের নবমাতৃকা, হেসি-য়নির আত্মদানেই ট্রয়ের নবজন্ম। হেসিয়নিকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে তারা ব্যাকুল—কিন্তু শান্তিপূর্ণ উপায়ে তা কি সম্ভব?

রাজার দুঃখ প্রজার আর্তি প্যারিস বুঝল। অসম্ভবকে সে সম্ভব করবে, তাই সত্যিকারের রাজপুত্রের কাজ। গ্রীসে সে যাবে, স্যালামিসরাজ টেলামনের মুখোমুখি সে দাঁড়াবে, বলবে—হেসিয়নিকে ফিরিয়ে দাও। যুবরাজ যাবে মহামান্য রাজদূত হয়ে—দৌত্য তার সফল হবেই।

কিছুদিন আগে গ্রীস থেকে একজন মানী লোক ট্রয়ে এসেছিল, রাজ-পরিবারের অতিথি হয়ে কাটিয়েছিল কিছুদিন। আদর যত্নের কার্পণ্য হয় নি তার প্রতি। সে স্পার্টার নবীন রাজা মেনিলাওস। তার সবচেয়ে বন্ধুত্ব জমেছিল প্যারিসের সঙ্গে। হেসিয়নির জন্যে সারা ট্রয়বাসীর মর্ম-বেদনার কথাও তার জানতে বাকি থাকে নি। ট্রয়ের দূত প্যারিসকে সে সাহায্য করবে না?

তরণী সজ্জিত হলো। তরীতে প্যারিস গুছিয়ে নিল নানা রকমের দামী দামী উপহার সামগ্রী। যাত্রার আগে প্যালেডিয়াম মন্দিরে গিয়ে

মিনার্ভার পূজা করল না। জাহাজের গলুইতে প্রতিষ্ঠিত করল দেবী ভিনাসের মূর্তি। প্রেমের দেবীর বরে রঙিন পালে অনুকুল বাতাস লাগল। প্যারিস পৌঁছল গ্রীসে। স্যালামিসে গেল না। সোজা গেল স্পার্টায়—যেখানে প্রেম, যেখানে হৃদয়হরণী হেলেন।

স্পার্টার রাজা মেনিলাওস বড়ো অতিথিবৎসল। হতেই হবে—সারা রাজ্যে তাঁর মতো অতিথি যে দ্বিতীয়টি নেই—অতিথি জামাতা অতিথি রাজা। তাছাড়া ট্রয়ে গিয়ে মেনিলাওস যে সমাদর পেয়েছিল তা ভুলবার নয়। প্যারিসকে সমাদর করা আতিথ্যেরই যোগ্য প্রতিদান। ভিনদেশী রাজপুত্র সাদরে প্রাসাদে আমন্ত্রিত হলো।

প্যারিসের সম্মানে স্পার্টায় উৎসব চলল ন-দিন ধরে। প্যারিসকে দেখবার জন্যে উৎসবে সমবেত হলো রাজ্যের গণ্যমান্যরা। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি সুন্দর ব্যবহার প্যারিসের। তার প্রিয় ভাষণে তুষ্ট হয়ে দিনের পর দিন সবাই ঘিরে থাকল তাকে। কতো খানাপিনা, কতো নাচ-গান, কতো বৈঠকী আড্ডা, সব ঐ নবীন অতিথিকে নিয়ে। সমুদ্র-পারের বন্ধুকে কাছে পেয়ে মেনেলাওসও আনন্দে দিশেহারা।

অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্ব গৃহকর্ত্রীর। গৃহকর্তা মুখের ভাষায় যতো খাতিরই করুক আর দাসদাসীরা যতো পরিশ্রমই করুক, পরিচর্যার শ্রী-সৌন্দর্য গৃহকর্ত্রীর হাত থেকেই হবে। ত্রুটি হলে গৃহিণীরই ত্রুটি। অতিথির আদর যত্নে একচুল ত্রুটি রাখল না হেলেন। সেবায় স্বাচ্ছন্দ্যে আতিথেয়তার অন্তরঙ্গতায়। আর তার রূপের বিদ্যুতে ঝলসে গেল প্যারিসের চোখ, তার চকিত ছোঁয়ায় শিহরিত হলো প্যারিসের বুক, তার মদির দেহসুবাসে উতলা হলো প্যারিসের মন। মুগ্ধ প্যারিস হেলেনের বড়ো কাছে এলো এই কটি দিনে।

প্রথম দর্শনেই হেলেনের প্রেমে পড়ে গেছে প্যারিস। হেলেনই যে তার বাঞ্ছিত—তার জন্যেই তো সে সমুদ্র পার হয়ে এসেছে দেবী ভিনাসের আশীর্বাদ নিয়ে।

উপহার তুমি চাও না? তাহলে কী আমি দেব? কী পেলে তুমি খুশি হবে হেলেন?

এবার তার দুই বিশাল অপলক চোখ প্যারিসের চোখে রাখল হেলেন। সেই চোখের দৃষ্টি প্রেমের নির্ঝরিণী হয়ে প্যারিসের মনপ্রাণ প্লাবিত করে দিল।

হেলেন শান্ত গলায় বললে—

আমি চাই তোমাকে।

১১

আমি চাই তোমাকে।

এ দাবী এ পর্যন্ত কোনো নারী কোনো পুরুষের কাছে করে নি। এ দাবীর মর্যাদা এ পর্যন্ত দেয় নি কোনো পুরুষ। এ দাবী শুধু পুরুষের—কেশর ফোলানো সিংহনাদ।

পুরুষ বীর্যবান, নারী বীর্যহীনা। বীর্যের গর্বে পুরুষ নারীকে চায়, পাশব পৌরুষবলে তাকে অধিকার করতে চায়। উপঢৌকন দেব, অলঙ্কার দেব, মাথায় মুকুট পরিয়ে স্বর্ণ সিংহাসনে বসাব, স্বর্ণ পালঙ্কে শোয়াব, উজাড় করে দেব পৃথিবীর সমস্ত ভোগ্য ধন—কিন্তু নিজেকে দেবনা। বীর্য দেব, বাসনা দেব, হৃদয় দেব না।

সেই বীর্যের কাছে নত হও, বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করো। সেই পাওয়াকেই পরম প্রাপ্তি মনে করে কৃতার্থ হও।

আমি চাই তোমাকে—নারী চায় পুরুষকে, তার মনপ্রাণ আত্মাকে। এ দাবী প্রথম ধ্বনিত হেলেনের কণ্ঠে। এ দাবীকে ভাগ্যের পরম প্রসাদ বলে স্বীকৃতি দিল প্যারিস।

তারপর সেই রাতে প্যারিসের হাত ধরে ঘর ছাড়ল হেলেন। ছাড়ল স্বামী মেনিলাওসকে--নিজের মেয়ে হারমিওনির মুখ তার মনেও পড়ল না। একবার পিছন ফিরেও তাকাল না-- যেখানে তার সব ঐশ্বর্য থরে থরে সাজানো রয়েছে।

অজানা পুরুষের হাতে ভাগ্য সঁপে দিয়ে নিজের দেশ ছেড়ে সমুদ্রযাত্রা একলা শুধু হেলেনই করে নি। পৌরানিক যুগের আরো মেয়ে করে-

ছিল।

এমনি এক মেয়ে অ্যাণ্ড্রোমিডা।

নরনারীর গর্ভসঞ্জাত জুপিটার দেবের পুত্র পার্সিউস। দেবী মিনার্ভার আশীর্বাদ ধন্য বীর। পৃথিবীর পশ্চিম সীমানার প্রান্তে বৃদ্ধ অ্যাটলাস নিত্যকাল দাঁড়িয়ে আছে তার বোঝা কাঁধে নিয়ে। সেই সীমান্ত ছাড়িয়ে সোজা উত্তরে তুহিন বাতাসের উৎসমুখে মেরুরাজ্যের রাক্ষসী রানী মেডুসার মাথা কেটে এনেছিলেন মহাবীর পার্সিউস।

মেডুসার ছিন্ন শির হাতে নিয়ে ফেরবার পথে ইথিয়োপিয়ার সমুদ্রতীরে এক ভয়ংকর দৃশ্য দেখলেন পার্সিউস। যেমন হারকিউলিস দেখেছিলেন ট্রয়ের সমুদ্রতীরে। এক পাথুরে টিলায় শৃঙ্খলে বাঁধা এক পরমা সুন্দরী কন্যা। তারও ভাগ্যে নেপচুনের অভিশাপ। এক সমুদ্র-দানব তাকে খেতে আসছে।

প্রচণ্ড সম্মুখযুদ্ধে দানবকে সংহার করলেন পার্সিউস। ইথিয়োপিয়ার রাজ-কন্যা অ্যাণ্ড্রোমিডাকে উদ্ধার করে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন দেশে।

তারপর ?

তারপর অ্যাণ্ড্রোমিডার কী হলো তা কেউ জানে না। পুরাণের পট-ভূমিকা থেকে ঐ প্রবাসিনী রাজকন্যা একেবারে নির্বাসিতা। মূর্তিহীনা প্রেমহীনা অন্তরীক্ষবাসিনী তুহিন তারকা।

ইয়লকসের রাজপুত্র জেসন আর্গো জাহাজে চড়ে গিয়েছিল কলকিস রাজ্যে। ঈজিয়ান সমুদ্র পার হয়ে হেলিস্পণ্ট আর বসফরাস প্রণালীর মধ্যে এগিয়ে কৃষ্ণ সাগরের তীরে কলকিস। ফ্যাসিস নদীর মোহানায়। রাজার উদ্যানে আছে এক দৈব মেষের ছাল, স্বর্ণপশম ভরা। তাকে পাহারা দিচ্ছে এক অপলকচক্ষু ড্র্যাগন। সেই স্বর্ণ মেষছালকে সংগ্রহ করবার জন্যে জেসনের অভিযান।

জেসন কিছুতেই সফল হতে পারতেন না যদি না রাজকুমারী মিডিয়া তাঁকে সাহায্য করত। বিদেশী রাজপুত্রের দেবোপম কান্তি দেখা মাত্র

বিমোহিত হয়েছিল মিডিয়া। জেসনকে ধ্বংস করবার জন্যে চক্রান্তের পর চক্রান্ত করেছিলেন রাজা। প্রতিবার মিডিয়া তাঁকে বাঁচিয়েছিল। গভীর রাত্রে পাহারাদার ড্র্যাগনকে যাদুমন্ত্রে ঘুম পাড়িয়ে জেসনের হাতে তুলে দিয়েছিল মেষছাল। তারপর জেসনের হাত ধরে বলেছিল—

যা পেতে এসেছিলে তা তো পেলে—এবার আমাকে নেবে না?

নেব বৈকি, তুমি আমার অভিযানের অধিষ্ঠাত্রী—তোমাকে নেব না?

স্বর্ণ মেষের সঙ্গে ঐ অনুরাগিনী রাজকন্যাকেও জাহাজে তুলে নিয়েছিলেন জেসন। এনেছিলেন নিজের রাজ্যে। তারপর কয়েক বছরের সুখসম্ভোগের পর তাকে নিষ্ঠুরভাবে দূর করে দিতে দ্বিধা হয় নি জেসনের।

আর আরিয়াড্‌নি? ক্রীটের সেই অপাপবিদ্ধা কুমারী—রাজা মাইনসের নয়নমনি নন্দিনী?

এথেন্সের যুবরাজ থেসিউস গেলেন ক্রীট দ্বীপে। রাজধানী নসাসের উপকণ্ঠে এক প্রকাণ্ড গোলকধাঁধাঁ। সেই গোলকধাঁধাঁর মাঝখানে বন্দী হয়ে আছে রাজা মাইনসেরই এক ভয়ংকর সন্তান। দেহের নিম্নভাগটা মানুষের, কিন্তু কোমর থেকে মাথা ষণ্ডের। রক্তবর্ণ বিঘূর্ণিত চোখ, লালাঝরা প্রকাণ্ড মুখবিবর, মাথায় খড়্গের মতো খাড়া দুই শিং। ষণ্ডের ক্রোধ আর অসুরের হিংস্রতা—গায়ে দৈত্যের শক্তি। মানুষের সন্তান এই ষণ্ডদানবের নাম মিনোটর। গোলকধাঁধাঁয় বন্ধ করে রাখলেও সস্নেহে তার দানবীয় খোরাক জোগান রাজা। নররক্ত তার পানীয়, নরমাংস খাদ্য।

ক্রীটের রাজার কাছে এথেন্সের রাজা হীনসন্ধিতে হাত-পা বাঁধা। বার বার এক নির্দিষ্ট সময়ে একদল এথেন্সবাসী তরুণ-তরুণীকে ক্রীটে পাঠাতে বাধ্য তিনি। ঐ বৃষদানব রাজপুত্রের খোরাক হবে তারা। দানব তাদের রক্ত খাবে, মাংস খাবে, চোয়ালে চোয়াল ঘসে হাড়গোড়

চিবোবে।

নসাসের রাজপুরীতে পৌঁছে রাজা মাইনসের সামনে আত্মপরিচয় দিলেন থেসিউস। মাইনস শুধোলেন—

তুমি এসেছ মিনোটরের খোরাক হতে? কেন? তুমি রাজপুত্র, এথেন্সের ভবিষ্যৎ রাজা তুমি। তুমি কেন এই নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে আত্মবলি দিতে এসেছ?

থেসিউস উত্তর দিলেন—

আমি এসেছি মিনোটরকে বধ করতে। তা নইলে আপনার সন্ধির দাসত্ব থেকে আমার দেশবাসীর মুক্তি নেই। সেই পরাধীন প্রজার রাজা হবারও কোনো গৌরব নেই।

নিষ্পলক চোখে তরুণ রাজকুমারের দিকে তাকিয়েছিল ক্রীটের রাজকুমারী আরিয়াড্‌নি—অন্তরে তার সম্ভ্রম আর অনুরাগের গুরুগুরু। আপন মনে বললে—

না না, এ হতে পারে না! এ আমি হতে দেব না কিছুতেই!

রাতের নিভৃতে কালো ওড়নায় কম্প্র বক্ষ ঢেকে থেসিউসের সঙ্গে দেখা করল আরিয়াড্‌নি।

পালাও কুমার, জাহাজে গিয়ে ওঠো! নিজের সর্বনাশ ডেকে এনো না!

তা হয় না রাজকুমারী—ঐ মিনোটরের মুখোমুখি আমাকে হতেই হবে। ওকে আমি বধ করবই!

আমি জানি কুমার, তা তুমি পারবে। কিন্তু তারপর? ঐ গোলকধাঁধা থেকে বার হয়ে আসবে কেমন করে? মিনোটরের খাঁচা থেকে পথ চিনে ফিরে আসা দেবতাদেরও অসাধ্য।

তা হোক, তবু আমাকে যেতেই হবে।

প্রেম-পাগলিনী আরিয়াড্‌নি চেপে ধরল থেসিউসের দক্ষিণ হাত।

কাল সন্ধ্যায় ওরা তোমাকে গোলকধাঁধায় নিয়ে যাবে। বিভীষিকার সেই অন্ধকার থেকে আমি তোমাকে বের করে আনব কুমার! কিন্তু

কথা দাও, আমাকে তুমি নেবে, আমাকে তুমি নিয়ে যাবে তোমার আশ্রয়ছায়ায় !

কথা দিলাম।

ষণ্ডদানবকে ধ্বংস করার পর আরিয়াড্‌নির সাহায্যে গোলক ধাঁধাঁ থেকে মুক্তি পেলেন থেসিউস। জাহাজে তুলে নিলেন ব্যাকুলা বিহ্বলা রাজকুমারীকে। নিজের দেশে নিজের জীবনে নিয়ে আসার জন্যে নয় —ত্বরিত উপভোগের তৃপ্তি মিটিয়ে এক নির্জন দ্বীপের নিকষ অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যে।

বীরশ্রেষ্ঠ হারকিউলিস সমুদ্র পার হয়ে গিয়েছিলেন অ্যামাজন রাজ্যে। তাঁর জন্যে সেই নারীরাজ্যের রানী হিপোলিটার উৎসুক প্রতীক্ষা। তাঁকে কাছে পেয়ে সমাদর অভ্যর্থনা, মুগ্ধ পরিচর্যা।

হারকিউলিস কিন্তু আতিথ্যভোগের জন্যে আসেন নি, তিনি এসেছিলেন রানীর দামী দামী অলঙ্কারগুলি লুট করবার জন্যে। লড়াই ছাড়া লুট কববে কেমন করে ? কিন্তু কে করবে লড়াই ? কার সঙ্গে ?

প্রাসাদকুঞ্জের নিভৃত ছায়ায় হারকিউলিস হিপোলিটাকে বললেন—

তোমার রাজ্যে আমি কেন এসেছি জানো রানী ?

জানি। আমার জন্যে—তাই না ?

রানীর কোমরে মণিমানিক্য খচিত সোনার মেখলা। অপূর্ব অলঙ্কার।

সেই ক্ষীণ কোমরটি জড়িয়ে ধরে হারকিউলিস বললেন—

তোমার এই মেখলাটি আমার চাই !

সোহাগদৃষ্টিতে হারকিউলিসের দিকে তাকিয়ে হিপোলিটা বললেন—

বিদেশী বীর, শুধু এই নিষ্প্রাণ মেখলার জন্যেই তুমি সমুদ্র পার হয়ে এসেছ ? মেখলা নেবে বৈকি, কিন্তু মেখলা যার তাকে নেবে না !

রানী নিজের হাতে মেখলা খুললেন। সমর্পণ করলেন শুধু মেখলা নয়, নিজের রোমাঞ্চ-তপ্ত নগ্ন দেহ। তারপর পরিতৃপ্ত হারকিউলিস নিজের হাতে সেই দেহ বিদ্ধ করলেন তীক্ষ্ণ ছুরিকায়।

এই সব বঞ্চিতাদের কাহিনী হেলেনের অজানা ছিল না। তবু সে ভয় পায় নি। অ্যাণ্ড্রোমিডা আর মিডিয়া, আরিয়াড্‌নি আর হিপোলিটা, তারা বিহ্বল চোখ বুজে আত্মসমর্পণ করেছিল পুরুষের কাছে। হে বীর, তুমি আমাকে নাও! হেলেন সে কথা বলে নি। তুমি আমাকে নাও—এ আকুতি হেলেনের মুখের নয়। হেলেন অনন্যা, পুরুষের পায়ে আত্মসমর্পিতা সে নয়। হেলেন সৃষ্টির প্রথম নারী—যার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে পুরুষ।

হেলেন শুধিয়েছিল প্যারিসকে—

কেন তুমি এসেছ?

প্যারিস বলেছিল—

তোমার জন্যে।

ধনরত্নের জন্যে নয়? সিংহাসনের জন্যে নয়? প্রচণ্ড বিক্রমে পররাজ্য গ্রাস করে বিজিতের প্রাসাদে জয়পতাকা তুলবার জন্যে নয়?

না হেলেন, শুধু তোমার জন্যে। তোমাকে নেবার জন্যেও নয়, তোমাকে দেবার জন্যে। নেবে না হেলেন?

হ্যাঁ নেব, আমি তোমাকে চাই!

স্বচ্ছ কণ্ঠে হেলেন বলেছিল—

বলো, তুমি আমার হবে, তাহলে আমিও তোমার হব। তুমি আমাকে প্রেম দেবে, তাহলে আমিও তোমাকে প্রেম দেব। বিনামূল্যে দেহ পাওয়া যায়, প্রেম পাওয়া যায় না। প্রেম মেলে প্রেমের মূল্যে।

স্পার্টার রানী হেলেন স্বামী সন্তান রাজ্যসম্পদ সব কিছু পরিত্যাগ করে প্যারিসের হাত ধরে কেন গৃহত্যাগ করল, তার কারণ খুঁজে পাওয়া শক্ত বৈকি। ভুল বলেছে তারা যারা বলেছে প্যারিস হেলেনকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কী লোভ দেখাতে পারত প্যারিস—ছড়াতে পারত কী মোহ জাল? হেলেন কোনো লোভে গলে নি, মোহে মজে নি।

মেনিলাওসের অনুপস্থিতির সুযোগে প্যারিস জোর করে ভয় দেখিয়ে হেলেনকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে—এ কথা যারা বলেছে তাদের ভাষ্যও ভুল। রাজা বিদেশে গেলেও প্রাসাদ আর রাজধানী সুরক্ষিত ছিল। রক্ষী ছিল, সৈন্য ছিল, প্রজাকুল ছিল। প্যারিসের হাতে অস্ত্র ছিল না, সঙ্গে সৈন্যবল ছিল না। আর যারা বলেছে মেনিলাওসের ধনরত্ন পুঁটুলিতে বেঁধে পরপুরুষের হাত ধরে নির্লজ্জা হেলেন কুলটাবৃত্তির জন্যে ঘর ছেড়েছিল—তারা বলেছে নির্জলা মিথ্যা। স্পার্টার ধনরত্নের মালিক মেনিলাওস নয়, হেলেন—পিতৃসম্পদের গরবিনী উত্তরাধিকারিণী।
তাহলে এমন কাজ হেলেন কেন করল ?

তরণী চলেছে। ঈজিয়ান সমুদ্রের পশ্চিম তীর থেকে পূর্ব তীরের দিকে। পালে লেগেছে হাওয়া। দিনান্তে পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ডুবছে। অস্ত রবির আলোয় রক্তিম বরণ মেঘ। সেই রক্তিমাভা রাঙিয়েছে হেলেনের মুখ। দেবী ভিনাসের আশীর্বাদের মতো।
সত্য হয়েছে দেবীর আশীর্বাদ। প্যারিস আর হেলেন পাশাপাশি। একের চোখের তারায় অপরের প্রতিচ্ছবি। একজনের হাতে আর এক জনের হাত। উভয়ের কাছে উভয়ের নির্বাধ আত্ম-উন্মোচন।
প্যারিস বলে—
আমাকে তুমি চাও হেলেন ! কিন্তু আমি যে কী তা তো তোমাকে জানতে হবে !
হেলেন বলে—
সব আমি তোমার জেনেছি।
তবু প্যারিস থামে না।
লোকে বলে আমি খুব রূপবান। কিন্তু এই রূপসর্বস্ব দেহটাই কি তোমাকে দেব ?
হেলেন হেসে বলে—

ছাখো, আমার সামনে রূপের গরব তুমি দেখিয়ো না।
কিন্তু কিসের গরব দেখাব? আমি রাজ্যভ্রষ্ট রাজপুত্র, দেবী জুনোর অভিশাপে অভিশপ্ত। আমার ভাগ্যে রাজা হওয়া নেই!
আবার হেসে বলে হেলেন—
স্পার্টার রানীকে রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছ?
আমি যে বীরও নই হেলেন! দেবী মিনার্ভা আমার প্রতি অপ্রসন্ন—তাঁর বরকে আমি ফিরিয়ে দিয়েছি! বীরের অনুরাগিনী—এ সম্মানও কেউ তোমাকে দেবে না!
হেলেন একটু চুপ করে রইল। তারপর মুখ নিচু করে তিক্ত গলায় বললে—
বীর কখনো মানুষ হয়?
আমাকে তুমি চাও—কিন্তু কী আমার আছে যা আমি তোমাকে দেব হেলেন?
অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। চক্রবালে মিলিয়ে গেল গ্রীসের তীর। চাঁদের আলো এসে পড়েছে হেলেনের মুখে। চিকচিক করছে তার চোখের কোণ। দু-হাতের তালুতে দুটি গাল ভরে নিয়ে প্যারিস তার দু-চোখের ওপরে চোখ রেখেছে।
অস্ফুট গলায় হেলেন বললে—
কী দেবে আমাকে? যে চোখে আজ তুমি আমাকে দেখছ, তোমার সেই চোখ আমাকে দাও,—যে মন নিয়ে আজ তুমি আমার কাছে এসেছ, তোমার সেই মন আমাকে দাও!
তাই দিল প্যারিস। হেলেনকে দিল তার প্রথম দিনের বাসনা, শেষ দিনের কামনা, তার সারা জীবনের অনুরাগ। এমন সম্পদ পেল হেলেন যার কাছে তার এতোদিনের সব পাওয়া সব সঞ্চয় তুচ্ছ হয়ে গেল। প্রেমিকের ভাগ্য, প্রেমিকের একনিষ্ঠতার অঙ্গীকার।
আর হেলেন প্যারিসকে দিল তার সব-হারানো সব-খোয়ানো প্রেম। প্রেমের সেই পরশমণি বুকে তুলে নিয়ে দেশে ফিরল কৃতার্থচিত্ত প্যারিস।

১২

রাজপুত্র বিদেশে যায়, রাজকন্যাকে জয় করে নিয়ে আসে। তারপর সারা জীবন সুখে বাস করে দুজনে। এইখানেই কাহিনীর শেষ, রূপকথার আদর্শ উপসংহার।

কিন্তু প্যারিস-হেলেনের কাহিনী রূপকথা নয়—মহাকাব্যের উপজীব্য। সে কাহিনীর শেষ নয়, শুরু এইখানে। প্যারিস রাজপুত্র, কিন্তু তার ব্যবহার রাজপুত্রের মতো নয়। রাজকন্যা হেলেন, রাজরানীও বটে। তার ব্যবহারও রানীর অযোগ্য। রূপকথার রাজপুত্র-রাজকন্যার মতো সুখে শান্তিতে ঘর করবার সহজ সৌভাগ্য তাদের হবে কেমন করে? মহাকাব্য ঘূর্ণাবর্ত হয়ে তাদের জীবনকে অতলে তলিয়ে দেবে না শেষ পর্যন্ত?

তরীর সামনে দেবী ভিনাসের প্রতিমূর্তি, দেবীর গলায় মালা—সফলকাম ভক্তের কৃতজ্ঞ উপচার। প্যারিস ফিরল নিজের রাজ্যে।

ট্রয়ের বন্দরে তিল ধারণের স্থান নেই। রাজপরিবার, রাজপুরুষ, রাজ্যের প্রজাবৃন্দ। সকলের সামনে রাজা প্রায়াম।

হেসিয়ানিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ প্যারিস?

না, হেসিয়নিকে নয়—হেলেনকে। টেলামনের দাসীকে নয়, স্পার্টার রানীকে।

প্যারিসের এই সার্থক অভিযানের বিবরণ শুনে ট্রয়বাসীর উল্লাসের শেষ নেই। একাজ কেউ পারত না—পেরেছে প্যারিস, রাজার ব্যাটা রাজপুত্র। উচিত শাস্তি দিয়েছে গ্রীসকে। জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছে। ভুলিয়েছে অপমানের জ্বালা, ফিরিয়ে এনেছে হৃত সম্মান।

ট্রয়ের প্রাসাদে উৎসবের সাড়া জাগল, ধুম পড়ে গেল রাজপরিবারে। এই হেলেন? যার রূপে ভুবন আলো—যাকে পাবার জন্যে সারা গ্রীসের সমস্ত রাজা আর রাজপুত্র পাগল হয়েছিল এই সেদিন? যে শুধু রাজকন্যা নয়, রাজবধূ, রাজরানী। তাকে ছিনিয়ে এনেছে প্যারিস, সিংহের মতো শিকার করে এনেছে!

এই হেলেনকে কোথায় রাখবে প্যারিস? কী করবে তাকে নিয়ে? শেকল দিয়ে বাঁধবে, নখ দিয়ে চিরবে, কামড়ে কামড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খাবে?

প্যারিস বললে অন্য কথা। ঘোষণা করল—

হেলেনকে আমি বিয়ে করব, তাকে দেব রাজবধূর সশ্রদ্ধ সম্মান। ভুবনের আলো আমার প্রাসাদ আলো করে থাকবে।

প্রায়াম অখুশি নন এতোটুকু। হেলেনের রূপ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন, তার ব্যবহারে তাঁর মন ভরে গেছে, তার হাসি দেখে তাঁর প্রাণ হয়েছে পরিতৃপ্ত।

সেই সঙ্গে হেসিয়নির কথা মনে পড়েছে। প্রবাসিনী বোন সুখী হয় নি, শান্তি নেই তার মনে। টেলামন তাকে কোনো সম্মান দেয় নি। হেলেনও নিশ্চয়ই অসুখী ছিল—তাইতো প্যারিসের হাত ধরে সে এলো। ভালোই করেছে প্যারিস। হেসিয়নিকে না আনলেও হেলেনকে এনেছে। ঠিকই করেছে। আহা, সে সুখী হোক, ছেলে তাকে সুখী করুক।

পুত্রবধূর সমাদরে হেলেন রাজ পরিবারে প্রতিষ্ঠিত হলো। প্যারিস আর হেলেনের জন্যে নতুন প্রাসাদ তৈরি করে দিলেন স্নেহানুরক্ত রাজা।

সেই প্রাসাদে নতুন স্বামী প্যারিসের সুখ-দুঃখভাগিনী প্রিয় পত্নী হয়ে জীবন শুরু করল হেলেন। সে আর স্পার্টার হেলেন নয়—ট্রয়ের হেলেন। নবজন্ম হলো তার।

বিদেশিনী হেলেন অচেনা পরবাসকে আপন করে নিয়েছে। রাজা

প্রায়াম আর রানী হেকিউবার সে কন্যাসমা, দেবরদের সে প্রিয় ভগ্নী, পরিবারের অন্য মেয়েদের সঙ্গে তার মধুর সখ্যতা। হৃদয়-মাধুর্যে সে সকলকে জয় করে নিয়েছে। সারা ট্রয় রাজ্যের সে প্রাণ-পুত্তলী, সংসারে সে প্রশান্তি-প্রতিমা। আর প্যারিসের প্রতি তার একনিষ্ঠ প্রেম, প্যারিসের একনিষ্ঠ প্রেমে সে পরিপূর্ণ।

অথচ সর্বরিক্ত হয়েই হেলেন ট্রয়ে এসেছিল। ফেলে এসেছিল সংসারের বন্ধন, সমাজের শাসন, সম্মানের ভূষণ। হেলেন শুধু স্বামীকেই ছাড়ে নি —ছেড়ে এসেছিল নিজের প্রাসাদ, নিজের দেশ। স্নেহময় বাপ, স্নেহময়ী মা, কোলের সন্তান। অসতী সে, কুলটা সে—আর তার ফিরবার উপায় নেই।

ফেরা দূরের কথা, একবারের জন্যে পিছন ফিরেও তাকায় নি হেলেন। নিজের হাতে এক জীবনের মৃত্যু ঘটিয়ে সম্পূর্ণ অচেনা আর এক জীবনের সন্ধানে তরী ভাসিয়েছিল সে। অজানা প্রেমিকের হাত ধরে এক চক্রবাল থেকে আর এক চক্রবালে,—কোন্ অমরার সন্ধানে!

সেদিন হেলেন ভক্তিমতী কন্যা নয়, পতিব্রতা পত্নী নয়, স্নেহময়ী জননী নয়। হেলেন শুধু নারী, শুধু প্রেমিকা। প্রেমই তার সাধনা, প্রেমই মহত্ত্ব—প্রেমই তার কলঙ্ক।

শুধু সেদিন নয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। নির্জন দ্বীপের সেই রোমাঞ্চ ভরা রতিরভসতৃপ্ত প্রথম মিলন রজনী— সেই রজনীর প্রভাত নেই, সেই কামনার ক্লান্তি নেই, নিবাত নিষ্কম্প সেই বাসরদ্বীপ।

কোনো রাতে আশ্লেষক্লান্ত চোখে যখন তন্দ্রা নেমে আসে, সন্ধ্যাতারা যখন শুকতারা হয়ে দিগন্তপ্রান্তে ফুটে থাকে—তখন কানে আসে সমুদ্রের বিস্মৃত কল্লোল।

কেন তুমি এ কাজ করলে হেলেন?

জানি না তো!

সত্যি জানো না ?

না, না, জানি বৈকি, নিশ্চয় জানি।

জানো ? তাহলে বলো—কেন ? কিসের জন্যে ?

জীবনের জন্যে। অকৃতার্থ জীবনকে পরিহার করে নতুন জীবনকে পাবার জন্যে।

কেমন জীবন তুমি পেলে হেলেন ?

অমৃত জীবন, অনন্ত জীবন !

কোন্ মন্ত্রে পেলে হেলেন ?

প্রেমের মন্ত্রে, বাসনার মন্ত্রে।

প্রদীপের বুকে যেমন শিখা, বাসনার বুকে তেমনি প্রেমের প্রতিষ্ঠা। যেখানে অনন্ত বাসনা, সেখানে অমর প্রেম। হেলেন মাতা নয়, বধূ নয়, কন্যা নয়—অনন্ত বাসনার অমৃত প্রেমশিখা।

পুরোনো জীবনকে ফেলে এসে কিছুই হারালো না হেলেন। পেল কন্যার স্নেহ, বধূর সম্মান, মাতৃত্বের স্বাদ। প্রেমিকের জন্যে অনির্বাণ করে জ্বালল তার দেহপ্রদীপ, অন্তর ভরে রইল প্রেমের আলোয়।

এদিকে ক্রীট থেকে স্পার্টায় ফিরে মেনিলাওস দেখল প্রাসাদ শূন্য। সবাই আছে, কিন্তু যে থাকবার সে নেই। হেলেন নেই।

প্যারিসও নেই। কোথায় গেল তারা ? শুনল তার রানী আর তার অতিথি হাত ধরাধরি করে রাজ্য ত্যাগ করেছে। বিশ্বাসহন্তা অতিথি—যার জন্যে প্রাসাদে উৎসবের হাট বসিয়েছিল মেনিলাওস। সেই প্রাসাদের মূক দেয়ালগুলি ব্যঙ্গমুখর। বিশ্বাসঘাতিনী পত্নী, মূর্তিমতী ছলনা—যার বিহনে শূন্য শয্যা, শূন্য সংসার।

শূন্য পুরীতে তিষ্ঠোতে পারল না মেনিলাওস। পাগলের মতো ছুটে গেল রাজ্য ছেড়ে। মাইকেনিতে, অ্যাগামেমননের দরবারে। হাউ হাউ করে দুঃখের কথা বড়ো ভাইকে শোনালো। তারপর ক্লিষ্ট গলায়

বললে—

একটা কিছু ব্যবস্থা করো, হেলেনকে আমি ফিরে চাই !

রাজার মতো রাজা অ্যাগামেমনন। নরশ্রেষ্ঠ এখিয়ান। ভাই-এর কান্না শুনে দপ্ করে জ্বলে উঠলেন মুহূর্তে।

কেন ? শয্যাসঙ্গিনীর বিহনে সারারাত ঘুম হয় নি বুঝি ? পাশে নিয়ে শোবার মতো একটা যুবতী দাসীও ছিল না ঘরে ?

অধোবদন হলো মেনিলাওস।

অ্যাগামেমনন আবার বললেন—

ট্রয় গিয়েছিলে না তুমি কিছুদিন আগে ? ঐ জঘন্য বিশ্বাসঘাতক রাজ-পরিবারের সঙ্গে খাতির জমাতে ? ঐ বীর্যহীন মানুষগুলোর সঙ্গে মিশেই না তুমি উচ্ছন্নে গেছ—ভুলতে বসেছ যে আমরা গ্রীক—মেয়েমানুষের জন্যে আমরা পা ছড়িয়ে কাঁদিনে ! এক স্বাদ এক চুমুকে মিটিয়ে নতুন স্বাদের পানীয়ে আমরা পাত্র ভরে নিই !

মেনিলাওস বললে—

তাহলে গ্রীক হয়ে আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব ?

কে বলেছে সে কথা ? আমি শুধু বলেছি ভেউ ভেউ করে কেঁদো না। পুরোনো অভ্যাস যদি ঘুচে থাকে তো ঘুচুক। নতুন অভ্যাস নতুন সুখ। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলো মেনিলাওস। দাদার কাছে এই উপদেশ শোনার জন্যে সে ছুটে আসে নি। তিক্ত মেজাজে তিক্ত গলায় বললে—

বেশ, বুঝলাম এ নিয়ে কিছু করার নেই।

করার নেই ? চিবিয়ে চিবিয়ে অ্যাগামেমনন বললেন—

আছে বৈকি করার। আমি শুধু বলছি তোমার কী করা উচিত ছিল। আমার দিকে তাকিয়ে ছ্যাখো। তোমার ঐ হেলেনের দিদি ক্লিটেম্‌নেস্ট্রা আমার রানী। হেলেনের মতো তার গর্ভেও আমার সন্তান জন্মেছে। কী করে তাকে কবজায় পুরেছিলাম মনে আছে ? সভায় দাঁড়িয়ে তখন বোকা-বোকা মুখ করে আমি গলায় মালা পরি নি। প্রতিদ্বন্দ্বীকে

সম্মুখযুদ্ধে কচুকাটা করেছিলাম। তারপর ঝুঁটি ধরে আমার প্রাসাদে টেনে নিয়ে এসে তাকে পাটরানী করেছিলাম। জানো, তোমার বৌদি এখনো আমাকে দেখলে থরথরিয়ে কাঁপে! দিনে কাঁপে মনের ভয়ে আর রাত্রিবেলা দেহের জ্বালায়!

এ কথার মানে কী?

কর্কশ গলায় হেঁকে উঠলেন অ্যাগামেমনন—

প্যারিস, প্যারিস—এ কথার মানে প্যারিস। হেলেন গেছে যাক—রাজ্যের সব কটা সুন্দরী দাসীকে একসঙ্গে শোবার ঘরে টেনে আনো,—কিন্তু প্যারিসকে ভুলো না। সে লড়ে আদায় করে নি হেলেনকে—বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তোমার সঙ্গে। প্যারিসকে উচিত শাস্তি দিতে হবে।

এতোক্ষণে উৎফুল্ল হলো মেনিলাওস। দাদার হাত ধরে বললে—

ঠিক, আমিও তাই-ই চাই। শাস্তি দিতে হবে প্যারিসকে। কিন্তু কী করে দেব? সে থাকে অনেক দূরে, সমুদ্রের ওপারে!

সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন মাইকেনিরাজ। প্রসারিত করলেন ডান হাত।

ঐ সমুদ্রের পারে আমরা যাব। শুধু তুমি নও, আমি নই—প্রত্যেকটি এখিয়ান বীর। ঐ অচেনা সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে বীরের মতো আমরা যুদ্ধ করব। খুন করব বিশ্বাসহন্তা প্যারিসকে। খুন করব ওর হীন বংশের প্রত্যেকটা পুরুষকে। বৃদ্ধা হোক, যুবতী হোক, হোক কচি মেয়ে—সব কটা স্ত্রীলোককে বন্দী করে নিয়ে আসব। আর ঐ ট্রয়ের প্রাসাদ আগুন লাগিয়ে খাক করে দেব!

আর হেলেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হেলেনের জন্যেই তো। হেলেনকে আমরা উদ্ধার করব, জাহাজে তুলব, মোটা শেকল দিয়ে মাস্তুলের সঙ্গে হাত-পা বেঁধে ঐ হেলেনকে আমরা ফিরিয়ে আনব গ্রীসের মাটিতে। তারপর তাকে নিয়ে তুমি কী করবে তা তোমার ভাবনা।

১৩

সে যুগকে বলা হয় বীরত্বের বা বীরধর্মের যুগ। বীরত্বই মনুষ্যত্ব, বীরই মনুষ্য জাতির গৌরব। ট্রোজান আর এখিয়ান দুই জাতির বীররা লড়াই করেছিল। বীরত্বের তুঙ্গস্পর্শী নিদর্শন দেখিয়েছিল সম্মুখ যুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত হারল ট্রোজানরা, জয় হলো এখিয়ান বীরদের। বিজয়ী বীরদের বন্দনায় মুখরিত হলো চারণ দল। প্রতি এখিয়ান রাজধানীতে উঠল জয়ের পতাকা।

কিন্তু এ গৌরব নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। উত্তর দিক থেকে এক দুর্ধর্ষ জাতি গ্রীসের ওপর আক্রমণ শুরু করল দু-পুরুষ যেতে না যেতেই। উত্তর থেকে তারা দলে দলে গ্রীসের ভূখণ্ডের মধ্যে ঢুকল। তাদের ঘোড়া ছিল না, রথ ছিল না—তারা পদাতিক। সংখ্যাই তাদের শক্তি, মরীয়া মেজাজই তাদের বল।

তাছাড়া তারা শিখে এসেছে কঠিনতম তীক্ষ্ণতম ধাতু লোহার ব্যবহার—তাদের হাতে ছিল লোহার অস্ত্র। লোহার তরোয়াল, লোহার বর্শা, লোহার বর্ম, লোহার ঢাল। এই লোহার অস্ত্র দিয়ে ব্রোঞ্জের অস্ত্রধারী এখিয়ানদের তারা কচুকাটা করল। ধ্বংস করল এখিয়ানদের শহর আর প্রাসাদ। গ্রাস করল এখিয়ান সভ্যতা। গ্রীসের বীরযুগের ওপর কালো যবনিকা টেনে দিল।

এই জাতির নাম ডোরিয়ান জাতি। ওরা গ্রীস ভূখণ্ডে শুধু লোহা আনল না সূচনা করল ইতিহাসের। প্রাগৈতিহাসিক ক্রীটের রাজধানী ধ্বংস হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে। দ্বাদশ শতাব্দীর আরম্ভে ধ্বংস হলো ট্রয়। আর কিছুদিন যেতে না যেতেই বহিরাগত ডোরি-

য়ানরা গ্রীসে ঢুকে জয় করল বিভিন্ন এখিয়ান রাজ্য। সমস্ত দেশ ডোরিয়ান ভূমি হয়ে গেল। এখিয়ানদের বড়ো বড়ো নগর আর রাজধানী—মাইকেনি আর টাইরিনস, আর্গস আর করিন্থ, স্পার্টা আর পাইলস চুরমার হয়ে গেল তাদের আক্রমণে। প্রায় দুশো বছরের জন্যে গ্রীস ডুবে গেল অন্ধকারে। তারপর সেই অন্ধ অতল কাল বারিধি থেকে আস্তে আস্তে ভেসে উঠল ঐতিহাসিক গ্রীস—ডোরিয়ান জাতির গ্রীস।

ট্রয় যুদ্ধের ফলে এখিয়ান গ্রীকদের একটা প্রত্যক্ষ লাভ হয়েছিল—তা হলো দ্বীপময় ঈজিয়ান সাগর আর এশিয়া মাইনরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। অনেক সহজ হয়েছিল সমুদ্রের এপার ওপারের মানুষদের জানাশোনা আর আনাগোনা। সেই অভিজ্ঞতা এখন কাজে লাগল। ডোরিয়ানদের চাপ যতো বাড়তে লাগল, মূল ভূখণ্ড ছেড়ে পুরোনো অধিবাসীরা ততো পালাতে লাগল পূর্বদিকে—ঈজিয়ানের দ্বীপে দ্বীপে আর এশিয়া মাইনরেব পশ্চিম তীরে। দুশো বছর ধরে ডোরিয়ানরা যখন মূল গ্রীসে আধিপত্য বিস্তার করছে, একের পর এক এখিয়ান নগর ধ্বংস করছে, মাইকেনিয়ান সভ্যতার আলো নিবিয়ে দিচ্ছে—তখন সেই পলাতক মানবগোষ্ঠী সমুদ্রপারে প্রতিষ্ঠা করছে ছোট ছোট উপনিবেশ। গানে গাথায় নতুন করে জাগিয়ে তুলছে এখিয়ান পুরাণের প্রতি বিশ্বাস, জীবন্ত রাখছে এখিয়ান ধ্যান-ধারণার প্রতি মমত্ব, এখিয়ান বীরত্বের স্মৃতি।

সেই স্মৃতির প্রধান ভাণ্ডার গ্রীক-ট্রোজানের যুদ্ধ। সেই মমত্ব আর বিশ্বাসের প্রধান প্রতীক হোমারের মহাকাব্য ইলিয়াড।

কে এই হোমার—প্রতীচ্য জগতের মহাকাব্যের আদি উদ্গাতা বলে যাঁব খ্যাতি? কোথায় তাঁর জন্ম, কোথায় বাস, কবে তাঁদের আবির্ভাব? হোমারকে নিয়ে প্রশ্নের অভাব নেই। সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন, হোমার

বলে কি কেউ সত্যি সত্যি ছিলেন? না ভিন্ন ভিন্ন গাথাকারের রচনার সংকলনে হোমার নামে এক কল্পিত কবির নাম স্বাক্ষর? শুধু ইলিয়াড নয়—আর এক মহাকাব্যেরও স্রষ্টা নাকি হোমার। সে মহাকাব্যের নাম অডিসি। ট্রয়ের সমুদ্রতীর থেকে জিব্রালটার প্রণালী পর্যন্ত ভূমধ্য-সাগরে সেই আদি যুগের এক পথহারা নাবিকের দুর্ধর্ষ অ্যাডভেঞ্চার। এই বিশাল দুই মহাকাব্য এক জীবনে একই লোকের পক্ষে রচনা করা সম্ভব?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন। তর্কের শেষ নেই। নেই মীমাংসার সমাপ্তি। হোমার অমীমাংসিত সত্য।

মহাকাব্য ইলিয়াডে ট্রয় যুদ্ধের কাহিনী পড়লে মনে হয় যেন প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ পড়ছি। কিন্তু হোমার প্যারিস-হেলেনের সমসাময়িক ছিলেন না। ট্রয়ের পতন আর হোমারের জন্মের মাঝখানে অনেকদিনের ব্যবধান।

হেরোডোটাস অনুমান করেছিলেন তাঁর কাল আর হোমারের কালের মধ্যে ব্যবধান চারশো বছরের বেশি নয়। সেই হিসেবে হোমারের আবির্ভাব খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর শেষ পাদে। আধুনিক পণ্ডিতরা হোমারকে আরো দুশো বছর পিছিয়ে সপ্তম শতাব্দীতে স্থান দিয়েছেন। এই নবম থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে হোমারের জন্ম হয়েছিল। এক বিধ্বস্ত বিনষ্ট যুগের চিত্রকে তিনি অন্তত চারশো বছর পরে তাঁর মহাকাব্যে প্রতিভাত করেছিলেন। তখন ডোরিয়ানরা গ্রীসকে পুরোপুরি গ্রাস করেছে—এখিয়ান বীরধর্মের স্মৃতি জেগে আছে এশিয়া মাইনরের ঔপনিবেশিকদের মনে। তাদেরই কণ্ঠে ট্রয় যুদ্ধের গান।

এশিয়া মাইনরের কোলে আইয়োনিয়া অঞ্চলে হোমার জন্মেছিলেন। হয় মূল ভূখণ্ডে, না হয় কোনো দ্বীপে। হোমারের জন্মভূমি বলে সে অঞ্চলের সাতটি শহরের দাবী। স্মারনা আর কিয়সের দাবী সবচেয়ে জোরদার।

এই সমস্ত শহরে চারণ কবিরা এথিয়ানদের পুরাণ কাহিনী গান করে ফিরত। পুরুষানুক্রমে এই সব গীতি-কথিকা ছিল তাঁদের অক্ষয় ধন। বালক কাল থেকেই চারণ কবিদের মুখে ট্রয় যুদ্ধের গান শুনেছিলেন হোমার। সেই শ্রুতিসঞ্চয়ের ওপর ভিত্তি করে অনন্যসাধারণ প্রতিভা-বলে মহাকবি রচনা করেছিলেন অশ্রুতপূর্ব মহাকাব্য ইলিয়াড।

হোমারের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। রামায়ণে বাল্মীকি নিজেই একটি চরিত্র—কিন্তু হোমারের মহাকাব্যে নিজের নাম-টুকুরও উল্লেখ মাত্র নেই। তাঁর অডিসি মহাকাব্যে ফিয়েসিয়ার রাজসভার বর্ণনা আছে। সেই সভায় বীণা বাজিয়ে গান করছেন ডেমোডেকাস। গানে গানে ট্রয় যুদ্ধের কাহিনী তিনি বলছেন। পরম সুললিত কণ্ঠ, অপূর্ব বর্ণনা। সমস্ত রাজসভা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে এথিয়ান বীরবৃন্দের গীত-কাহিনী শুনছে।

ডেমোডেকাস অন্ধ। হয়তো এই ডেমোডেকাস চরিত্রেই হোমারের আত্মজীবনীর ছায়া পড়েছে। হয়তো হোমারও ছিলেন অন্ধ। আইয়ো-নিয়ার শহরে শহরে অন্ধ কবি হোমার গান গেয়ে ফিরতেন। নগরের রাজপুরুষরা তাঁকে নিমন্ত্রণ করত। সভা সাজাত। সেই সব সভায় সমবেত জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি আবৃত্তি করতেন ট্রয় যুদ্ধের বিবরণ—ইলিয়াড। যে শহরে যখন তিনি থাকতেন, সেই শহরই তাঁকে আপনার করে নিত।

ইলিয়াড ট্রয় যুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ নয়। এতে হেলেনের বিবাহের বর্ণনা নেই, গৃহত্যাগের খবর নেই, গ্রীকদের যুদ্ধযাত্রার কথা নেই। এমনকি জয় পরাজয় ও ট্রয় ধ্বংসের উল্লেখও নেই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই মহাসমরের ঘটনাবলীকে এক সূত্রে গ্রথিত করেছে সমসাময়িক কালের আরো অন্তত ছ-সাতটি কাব্যের বিষয়বস্তু, যার মধ্যে হোমারের অডিসি অন্যতম। ইলিয়াড সমেত এই কাব্যরচনাবলী এপিক সাইক্‌ল নামে খ্যাত। ইলিয়াড ট্রয় যুদ্ধের নিতান্ত খণ্ডিত বৃত্তান্ত। দশ বছর ব্যাপী

যুদ্ধের মাত্র কয়েকটি সপ্তাহের ঘটনা ইলিয়াডের উপজীব্য।

এই খণ্ডিত কাহিনীর মধ্যে হোমার পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়েছেন গ্রীকজাতির আদর্শ চরিত্র—বীরের চরিত্র। বীর সাধারণ মানুষ নয়, বহুর মধ্যে অন্যতম নয়। তার জীবনাদর্শ আর ব্যক্তিত্ববোধ নিয়ে সে অনন্য।
দেবতার ঔরষে বা দেবীর গর্ভে জন্ম হলেও বীর দেবতা নয়, দেবতার মতো চিরজীবী নয়। নশ্বর তার আয়ু—বসন্তের পাতার মতো। তবু ক্ষণস্থায়ী জীবনে সে দেবোপম হতে চায়, ক্ষয়িষ্ণু ক্ষণকে অক্ষয় রাখতে চায়।
এই আকাঙ্ক্ষা আর আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রয়াসই বীরচরিত্রের বৈশিষ্ট্য। জীবনের প্রতি মুহূর্তকে সে সার্থক করতে চায় বীরধর্ম পালন করে। অদম্য তার উত্তম, প্রচণ্ড তার শক্তি, দুর্মদ তার সাহস, সুতীব্র সহিষ্ণুতা, গভীর কর্তব্যবোধ। ভয়াল আবর্তের মধ্যে বীর অকুণ্ঠ উৎসাহে ঝাঁপ দেয়, যুদ্ধের তাণ্ডবে সে মুখোমুখি হয় নিশ্চিত মৃত্যুর।
বীরধর্মে বিপরীতের সমন্বয়। বাসনা আর বিরক্তি, মমত্ব আর ক্রোধ, প্রীতি আর প্রতিহিংসা বীরচরিত্রের অঙ্গাঙ্গী বিস্ফোরণ। বীর পলকে লোলুপ, পলকে উদাসীন, পলকে কাতর, পলকে অকুতোভয়।
অমর নয়,—কিন্তু বীর অমরত্বের প্রয়াসী। সব মানুষই মরণশীল, কিন্তু বীর খোঁজে মৃত্যুকে উত্তরণের পথে। যূথবদ্ধ মানুষের যাওয়া-আসার পথ নয়, বিরল অভিযাত্রীর অভিযানের পথ। খ্যাতির পথ, সম্মানের পথ। সেই পথের প্রান্তে স্মৃতির সিংহাসন। মরণাহত বীর চায় এই সিংহাসনে অমর প্রতিষ্ঠা।
বীর জানে তার জীবনের মূলে গভীর ট্র্যাজেডি। এ ট্র্যাজেডি শুধু কালান্তক যম নয়, তার অন্ধ নিয়তি। দেবতাই মানবভাগ্যের খেয়ালী নিয়ন্তা—সেই খেয়ালকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কারো নেই। ভাগ্যের হাতে বীর পুতুল। সে শত্রুকে জয় করতে পারে—ভাগ্যকে জয় করতে

পারে না। দেবতাকে জয় করতে পারে না। তাই যুদ্ধ তার, জয় তার নয়। যন্ত্রণা তার, তৃপ্তি তার নয়। শ্রম তার, চরিতার্থতার অধিকারী সে নয়। এই ট্র্যাজেডিকে সে মুছতে চেষ্টা করে তার বীর্য দিয়ে প্রেরণা দিয়ে আজীবনের প্রচেষ্টা দিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিয়তির অন্ধকারে সে ডুববেই।

তবু বীরের জীবন অকিঞ্চিৎকর নয়। অচরিতার্থ নয়। মহতের সন্ধানে সে জীবন মহান, বীর্যের আবাহনে সে জীবন সার্থক। তমসা নদীর পারে প্রেতপুরীতে শেষ আশ্রয় হলেও বীরের নাম তারার মতো ফুটে থাকে পরপ্রজন্মের চিত্তাকাশে। বীরের জীবনই গ্রীক জাতির আদর্শ।

ট্রয়যুদ্ধের ভূমিকা থেকে উপসংহার পর্যন্ত কাহিনীর পর কাহিনী— ঘটনার সূত্র দিয়ে বাঁধা। কবির পর কবি সেই ঘটনায় নব নব কাহিনীর নতুন নতুন পরিচ্ছেদ রচনা করেছেন। সেই বিশাল কাহিনীসম্ভারের সেই অংশটুকু হোমার তাঁর মহাকাব্যে নিয়েছেন যে অংশে গ্রীক বীরত্বের চিত্র সব থেকে উজ্জ্বল, গ্রীক চরিত্রের গুণাবলী যে অংশে সব চেয়ে প্রতিভাত।

তারপর দিনে দিনে ইজিয়ানের এপার ওপারের গ্রীকজাতি হোমারের সেই গানকে আপন করে নিল। গ্রীসের আদি জয়গান, গৌরবের গান, জাতীয়তার গান। সেই গানকে গ্রীস কোনো দিন ভুলল না। গ্রীসের ক্ল্যাসিক যুগ চিরযুগের আদর্শ আর প্রেরণার সূচক হিসেবে এই ইলি-য়াডকে মাথায় তুলে রাখল।

শেষ গ্রীক বীর ম্যাসিডনের আলেকজাণ্ডার যখন বিশ্ববিজয়ে বার হলেন, সঙ্গে নিলেন একটি মাত্র গ্রন্থ—মহাকবি হোমারের ইলিয়াড।

বীরের কাব্য ইলিয়াড –একাধিক বীরের চরিত্রমালা। ইলিয়াডের নায়ক বীর—নারী থাকলেও নায়িকা নেই। হেলেনের কথা কিছুই বলেন নি

হোমার, বর্ণহীন তুলিতে এঁকেছেন তার ম্লান চরিত্ররেখা। হেলেনের জীবন--তার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ—কোনো কিছুই ইলিয়াড পড়ে আমরা জানতে পারি নে।

কিন্তু হেলেন বিনা ইলিয়াড হতো না।

ট্রয় যুদ্ধ হেলেনরই জন্যে।

১৪

প্রস্তুতি শুরু হলো যুদ্ধের।

সারা গ্রীসের সমস্ত বীর সমস্ত রাজাকে অ্যাগামেমনন ডাক দিলেন। শুধু ডাকই দিলেন না, চাপও দিলেন অনেকের ওপর। স্মরণ করিয়ে দিলেন হেলেনের স্বয়ংবর সভায় কী শপথ তাঁরা করেছিলেন। পাহাড় আর উপত্যকা ঘেরা সারা গ্রীসের প্রতিটি রাজ্যে প্রতিটি নগরে ঘোষিত হলো অ্যাগামেমননের নির্দেশ—সাড়া জাগল প্রতিটি বীরের প্রতিটি যোদ্ধার রক্তে।

সমুদ্র পারে যেতে হবে—লক্ষ্য ট্রয়। অভিযান শুরু হবে থীবসের নিকট-বর্তী অলিস বন্দর থেকে। যুদ্ধাস্ত্র ভর্তি রণতরী সাজিয়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে একে একে অলিসে উপস্থিত হলো এখিয়ান বীরবৃন্দ।

কতো নেতা কতোবীর! কয়েকজনের নাম তো করতেই হবে। উত্তরের থিয়া রাজ্য থেকে এলো বীরশ্রেষ্ঠ অ্যাকিলিস তার দুর্ধর্ষ মার্মিডন বাহিনী নিয়ে—সঙ্গে প্রিয় বন্ধু প্যাট্রোক্লস। পশ্চিম উপকূলের ইথাকা দ্বীপ থেকে এলো রাজা ইউলিসিস। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তরাজ্য পাইলসের প্রবীণ রাজা নেস্টর, বীরপুত্র অ্যান্টিলোকাসকে সঙ্গে নিয়ে। স্যালামিস থেকে এলো দুই রাজপুত্র—মহাবলী অ্যাজাক্স আর ধনুর্ধর টিউসার। আর্গসের রাজধানী টাইরিনস থেকে মহাবীর ডায়োমিডেস—ক্রীটের রাজা আইডোমিনিউস। ইলিয়াড কাব্যে বীরখ্যাতিতে এরা অমর। তারপর অনুকূল বাতাসের সুযোগ নিয়ে অলিস বন্দর থেকে যুদ্ধযাত্রা করল সহস্র রণতরী। প্রস্তুতিতে কম সময় যায় নি, অপমানের জ্বালা বেড়েছে বই কমে নি। প্রতিটি অভিযাত্রী বীরের মুখে প্যারিসের ঘৃণ্য

নাম, স্মরণে হেলেনের সুন্দর মুখ।

কিন্তু অ্যাগামেমননের ভাবনা অন্য। সর্বাধিনায়কের তরীতে বসে তিনি অন্য নাম অন্য কথা ভাবছেন। হেলেনের নয়, প্যারিসের নয়, পিতামহ পেলপ্সের কথা।

চিরস্মরণীয় নাম পেলপস্, সেই নাম অনুসারেই দক্ষিণ গ্রীসের নাম পেলপনিসাস। দেহে পেলপ্সের রক্ত, সেই সম্মানেই অ্যাগামেমনন এখিয়ানদের গোষ্ঠীপতি, এই রণযাত্রার সর্বাধিনায়ক।

অ্যাগামেমননের পিতৃপুরুষদের আদি বাস ভূমি ছিল প্যাফলাগোনিয়ায়। ফ্রিজিয়ার পূবে, কৃষ্ণসাগরের তীরে। উত্তর থেকে এক বর্বর জাতি প্যাফলাগোনিয়া আক্রমণ করল, পেলপস্ আর তাঁর বশংবদ প্রজাদের রাজ্য থেকে দূর করে দিল।

রাজ্যহারা পেলপস্ তখন দৌড়ে দৌড়ে বেড়াতে লাগলেন—এলেন ফ্রিজিয়ায়। তিনি রাজত্ব চান না, একটু আশ্রয় চান। নিজের জন্যে যতো না ততো বিশ্বস্ত প্রজাদের জন্যে যারা তাঁর ভাগ্যে ভাগ্য মিলিয়ে তাঁরই সঙ্গে উৎখাত হয়েছে। যদি ভাগ্যে থাকে আবার ফিরে যাবেন নিজের দেশে, যুদ্ধ করে জিতে নেবেন হৃতরাজ্য। তার আগে চাই একটু সময় আর প্রতিবেশী রাজ্যের একটু সহায়তা।

ফ্রিজিয়ায় ট্রয় তখন উঠতি রাজ্য। জমাট বাঁধছে ক্ষমতা, ফুলছে ঐশ্বর্যের পাহাড়। আশ্রিতের প্রতি হাত বাড়ানো মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ট্রয়ের রাজা ইলাসের কাছে হাত পাতলেন পেলপস্। আমাকে ঠাঁই দাও, একটু সাহায্য করো!

ট্রয়ের রাজার মনে কিন্তু শুধু হিংসা, ব্যবহারে শুধু দম্ভ। প্রতিবেশী বন্ধু রাজা রাজ্য হারিয়েছে, কোথায় তার বিপদে একটু সহায়তা করবেন শক্তি দেবেন তা নয়—দূর দূর করে তাড়ালেন পেলপস্‌কে। শুধু সেপাই শান্ত্রী দিয়ে রাজসভা থেকেই নয়, সৈন্য লেলিয়ে দিলেন পেছনে।

যেখানেই দৌড়োন পেলপস্ আর তাঁর উদ্বাস্তু দলবল—সেখানেই হানা দেয় ইলাসের সৈন্য সামন্ত। ফ্রিজিয়া-লিডিয়া সমেত সারা এশিয়া মাইনরে পা রাখবার জায়গা পেলপসের রইল না, এমন শত্রুতা ইলাস করলেন।
ট্রয়ের এই শত্রুতা বোধহয় দেবতারই অভিপ্রায়—এতেই পেলপস্ হলেন জগৎ বিখ্যাত। রাজ্য হারিয়ে বন্ধু হারিয়ে পেলপস্ সমুদ্রে ভাসলেন। ভিড়লেন গ্রীসের এলিস রাজ্যে। এলিসের রাজাকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে লাভ করলেন অর্ধেক রাজত্ব আব রাজকন্যা। তারপর বিজয় অভিযান।
ক্রমে সারা গ্রীস পেলপসে্ব বশ্যতা মানল—তাঁর নামে নাম হলো পেলপনিসাস। প্রথমেই অলিম্পিয়া জয়। সেই জয়ের স্মরণে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার তিনি জন্মদাতা। গ্রীসের জাগ্রত যৌবনের প্রতীক এই অলিম্পিক। এখানকার ক্রীড়াঙ্গনে যে বিজয়ী হয় সে পায় পাতার একটি মুকুট। মনিরত্নখচিত স্বর্ণমুকুটের চেয়েও দামী। এই অলিম্পিয়াতেই পেলপসে্ব সমাধি।

সেই পেলপসে্র পৌত্র অ্যাগামেমনন। রণতরী সাজিয়ে সেই সমুদ্রে তিনি আবার ভেসেছেন, তেমনি চলেছেন দলবল নিয়ে। পালে অনুকূল বাতাস। ট্রয় থেকে নয়, ট্রয়ের অভিমুখে।
অ্যাগামেমনন ভাবছেন প্যারিসের কথা নয়—পিতামহ পেলপসে্র কথা। আর মনে পড়েছে দ্বিচারিনী হেলেনের মুখ নয়—নিষ্পাপ কুমারী সাধের কন্যা ইফিগিনিয়ার মুখ।
অভিযান তখনো শুরু হয় নি। অলিস বন্দরে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এক হাজার রণতরী। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। থমথম করছে সারা আকাশ, রোদের তাপে ফুটিফাটা মাটি। পচে উঠছে জাহাজের পাঠাতন, মরচে পড়ছে অস্ত্রে, মড়কে মরছে ঝাঁক ঝাঁক নিরুপায় অধৈর্য

সৈন্য। এক ফোঁটা হাওয়া নেই, বন্দর থেকে জলে ভাসবার উপায় নেই একটি জাহাজের।

কেন এমন হলো? কোনো পাপে, কীসের অভিশাপে? অভিযান তাহলে কি ব্যর্থ হবে? বীররা লজ্জায় মুখ ঢেকে নিজের নিজের ঘরে ফিরে যাবে? কান পেতে দৈববাণী শোনো।

দৈববাণী হলো—

অপরাধ অ্যাগামেমননের। সেনাপতি হয়ে বড়ো দম্ভ হয়েছে তাঁর। অনেক পাপ জমা হয়েছে তাঁর—দেবতাদের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে পাপের মার্জনা ভিক্ষাটুকু করতে তিনি ভুলেছেন। থোড়াই গ্রাহ্য করেছেন দৈবী আশীর্বাদের। প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে হবে। নইলে পালে হাওয়া লাগবে না।

অভিযাত্রীদের দলের পুরোহিত হাত জোড় করলেন, হাঁটু গেড়ে বসে চোখ তুলে বললেন—

কী প্রায়শ্চিত্ত?

প্রায়শ্চিত্ত বড়ো কঠিন, বড়ো নির্মম। সেই ঘোষণায় বন্দরের আকাশ কেঁপে উঠল। মাইকেনি থেকে রাজকুমারী ইফিগিনিয়াকে এনে অলিসের দেবমন্দিরে বলি দিতে হবে।

তাই করেছেন অ্যাগামেমনন। পাথর করেছেন পিতৃহৃদয়। অনুকূল বায়ু-ভরে যাত্রা শুরু হয়েছে, আর ছেড়ে আসা বন্দরে পড়ে প্রিয় কন্যা ইফিগিনিয়ার ছিন্নশির রক্তাক্ত মৃতদেহ।

এখন পৌঁছতেই হবে ট্রয়ে। পেলপস্ যে রাজ্যের শত্রুতার অপমান মাথায় নিয়ে দেশান্তরী হয়েছিলেন, যে রাজ্যে পুনর্যাত্রার মুহূর্তে বিসর্জন দিতে হয়েছে নিরপরাধিনী কিশোরী কন্যাকে—সে রাজ্যকে দেখে নিতেই হবে একবার।

দশটি বছর কাটল। এই দশ বছর হেলেনের জীবনের শ্রেষ্ঠ ঋতু—

নিত্য বসন্ত। সুখের সৌরভ, আনন্দের মলয় হিল্লোল। তারপর এক-দিন কালো হয়ে গেল দিক-চক্রবাল। কালো কাঠের পাটাতন, ধূসর রঙের পাল—হাজার যুদ্ধজাহাজ ভিড়ল সেই তটে, যেখানে প্যারিসের হাত ধরে নেমেছিল হেলেন।

টেনেডস দ্বীপের কাছে যখন গ্রীসের নৌবাহিনী তখনই খবর পৌঁছে-ছিল। তৈরি হতে দেরি করে নি ট্রয়ের সৈন্যরা। খুব একটা ভয় ও পায় নি। বেশ কিছুটা রক্তপাতের পর গ্রীক সৈন্যরা সমুদ্রবেলায় পা রাখতে পারল। নামাতে পারল জাহাজের নোঙর।

স্কীয়ান তোরণের মধ্যে দিয়ে ঢুকল তিন গ্রীক দূত—মেনিলাওস নিজে আর তার দুই সঙ্গী। রাজা প্রায়ামের সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

রাজসভায় প্রায়াম বসে আছেন। তিনি শুধোলেন—

কেন তোমরা আমাদের রাজ্যে এসে হানা দিয়েছ?

মেনিলাওস গর্বোদ্ধত গলায় হাঁকল—

হেলেনের জন্যে।

হেলেনের জন্যে?

হ্যাঁ। হেলেনকে আপনি আমাদের হাতে দিন। আমরা এখুনি নোঙর তুলে বিদায় হব।

প্রায়াম বিচলিত হলেন না। হেসে বললেন—

সত্যি? তুমি কে বলো তো?

আমি মেনিলাওস, স্পার্টার রাজা।

বটে? তুমি একবার এসেছিলে আমার রাজ্যে, মনে পড়ে। তাই বলে হেলেনকে তোমার হাতে তুলে দেব কেন?

হেলেন আমার স্ত্রী, সে কথা মনে পড়ছে না?

ভুল বলেছ তুমি। প্রায়াম শান্তগলায় বললেন—

হেলেন তোমার স্ত্রী নয়, আমার ছেলে প্যারিসের স্ত্রী। মনে পড়ছে বৈকি—তুমি ছিলে হেলেনের পছন্দ করা স্বামী—স্ত্রী তার পছন্দ

ফিরিয়ে নিলে স্বামীত্বের আর অধিকার থাকে না।
চিৎকার করে উঠল মেনিলাওস—
তোমার ছেলে প্যারিস আমার স্ত্রী হেলেনকে হরণ করে এনেছে!
না, জয় করে এনেছে। সেই জয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে আমার ছেলে প্যারিসের গলায় মালা পরিয়ে পরম আনন্দে আছে হেলেন। পরস্ত্রীর দিকে হাত বাড়িয়ো না মেনিলাওস—তুমি ফিরে যাও!
অনেকদিন পরে আবার দুঃখিনী ভগিনী হেসিয়নির কথা মনে পড়ল প্রায়ামের। সেই কিশোর কালের ভয়ংকর স্মৃতি।—তাই প্রায়াম আবার বললেন—
আমরা গ্রীক নই, ট্রোজান। ট্রোজানরা দস্যু নয়, তারা নারী-হরণ করে না। নারীকে তারা সম্মান দেয়—প্রেমের সম্মান, আমার বোন হেসিয়নিকে তোমরা দস্যুর মতো হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলে। কী সম্মান তাকে দিয়েছ আমি জানি নে?
মাথা নিচু করে খালি হাতে ফিরে গেল মেনিলাওস। প্রায়ামের শেষ কথার কোনো উত্তর দিল না। এর উত্তর কথায় নয়, যুদ্ধে। স্কীয়ান তোরণের দ্বার রুদ্ধ হলো।
সংস্কারের চেয়ে ধর্ম বড়ো—নীতির চেয়ে হৃদয় বড়ো। প্রায়াম তা বুঝেছেন। তাই মেনিলাওসের কুলত্যাগিনী স্ত্রীকে পুত্রবধূর সম্মান দিতে একটুও তাঁর বাধে নি, সারা ট্রয়বাসীরও বুঝতে দুদিন লাগে নি যে হেলেন বন্দিনী নয়—সোহাগিনী অন্তঃপুরবাসিনী। হেলেন লালসার খাদ্য নয়, আকাঙ্ক্ষার অমৃত। হেলেন ব্যর্থতার অঙ্গার নয়, পূর্ণতার শিখা। প্রতিহিংসার প্রতীক নয়। আনন্দস্বরূপিনী।
এই হেলেনকে ফিরিয়ে দিতে হবে?
কিছুতেই নয়।
না দিলে যুদ্ধ?
হোক যুদ্ধ।

পাশাপাশি দুটি নদী। উত্তরে সিমোইস, দক্ষিণে স্ক্যামাণ্ডার। দুই নদী পাশাপাশি সমুদ্রে মিশেছে, উভয়ের মোহানার মাঝখানে সমুদ্রতীর। বালুকাবেলার পিছনে ট্রয়ের প্রাচীব।

সমস্ত উপকূল জুড়ে গ্রীক নৌবাহিনী নোঙর ফেলে রইল। জাহাজ-গুলিতে পাহারার ব্যবস্থা করে সৈন্য আর সেনাপতিরা তীবে এসে দাঁড়াল। স্ক্যামাণ্ডারের পূর্বতীরে আইডার অরণ্য থেকে বড়ো বড়ো গাছ কেটে এনে সামনে তুলল কাঠের উঁচু প্রাকার। এই প্রাকার ভেদ করে ট্রোজানরা যাতে জাহাজের ওপর হামলা করতে না পারে। প্রাকারের গায়ে গায়ে সেনাপতি আব সৈন্যদের শিবির—শিবিরের সামনে খোলা বালুকাক্ষেত্র। মুখোমুখি ট্রয়ের প্রাচীর। অবরুদ্ধ স্কীয়ান তোরণ।

গ্রীক সেনাপতিরা ভেবেছিল এমনি অবরোধের ফলে ট্রোজানদের আত্ম-সমর্পণ করতে দেরি হবে না। সমুদ্রতীর জুড়ে রয়েছে গ্রীক বাহিনী, বহির্বিশ্বের সঙ্গে ট্রয়ের সম্পর্ক কেটে দেওয়া হয়েছে। ট্রয়েব রসদ ফুরিয়ে আসতে কতোদিন? কোথায় অস্ত্র, কোথায় খাদ্য? কোথায় থাকবে প্রতিরোধের শক্তি? দেখতে না দেখতে নাভিশ্বাস উঠবে ট্রয়ের।

তাই নগরের বাইরে সমানে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে গ্রীক সৈন্যরা। খেত পোড়াচ্ছে, গ্রাম জ্বালাচ্ছে, মন্দির ধ্বংস করছে। সমুদ্রতীরের ছোটখাটো জনপদগুলি লুটপাট করছে। শিবিরে বন্দী করে এনে উৎপীড়ন চালাচ্ছে দুর্বল নারীদের ওপর। সিমোইস আর স্ক্যামাণ্ডার উপত্যকার সমস্ত শস্যক্ষেত্রের ফসল আর আইডার আরণ্যকদের ঘরে তৈরি সমস্ত মদ ছিনিয়ে এনে সঞ্চয় করছে জাহাজে জাহাজে।

প্রতিটি গ্রীক যোদ্ধা জানে পেছনে ফেরার উপায় নেই। অপমানের কালি মেখে দেশে ফিরতে কেউ পারবে না। সামনের ঐ দুরারোহ শিখর জয় করতেই হবে—ঐ ট্রয়। তার জন্যে যতোদিন লাগে লাগুক, জীবন কেটে যায় তো যাক। আর না হয় হোক আয়ুর রক্তাক্ত অবসান।

কিন্তু দীর্ঘ ন-বছরেও ট্রয়ের গায়ে আঁচড়টি লাগল না, ট্রয়ের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় এক মুহূর্তের ছেদ পড়ল না। চারদিক থেকে ট্রয়কে অবরোধ করতে ওরা পারে নি। পশ্চিম দিকে সমুদ্রতীরে কড়া পাহারা বসিয়েছে, কিন্তু বাকী দিকগুলো মোটামুটি খোলা। স্কীয়ান গেট বন্ধ, কিন্তু প্রাচীরের মাঝে মাঝে আরো তো গেট আছে। বিশেষ করে পূব দিকে ডার্ডানিয়ান গেট। ঐ গেট খুলতে কোনো বাধাবিপদ নেই, ঐ তোরণের পথে বাইরের জগতের সঙ্গে ট্রয়ের সংযোগ অব্যাহত। ঐ পথে খাদ্য এলো, অস্ত্র এলো, সৈন্য এলো। ঐ পথ দিয়ে মাঝে মাঝে ট্রোজান বাহিনী দুর্ধর্ষবেগে ছুটে গিয়ে গ্রীক সৈন্যদের প্রতিহত করল। ট্রয়ের প্রতিরোধশক্তি শূন্য হয়ে গেল না।

দশম বর্ষ যখন সন্নিকট তখন গ্রীকরা বুঝতে বাধ্য হলো যে বাইরে বাইরে হামলা চালিয়ে শত্রুর কোনো ক্ষতিই তারা করতে পারে নি। প্রত্যক্ষ তো নয়ই, পরোক্ষও এমন কিছু না। এমনি করে ট্রয়কে জব্দ করা যাবে না। সম্মুখ যুদ্ধ করতে হবে, হানা দিতে হবে স্কীয়ান তোরণে, ভাঙতে হবে প্রাচীর। নিরপেক্ষ প্রতিবেশী দেশের প্রজার ওপর হামলা চালানো বীরের কাজ নয়। বীর করবে মুখোমুখি লড়াই—হয় জয় না হয় পরাজয়।

সেই সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হলো দশম বর্ষে। সমস্ত বীর আর সৈন্যদলকে জড়ো করে অ্যাগামেমনন নির্দেশ দিলেন—

শানিত করো তোমাদের অস্ত্র, বুকে বেঁধে নাও বর্ম, বাঁ হাতে তুলে নাও ঢাল। পেট ভরে ঘোড়াগুলোকে খাওয়াও, সারিয়ে নাও রথের চাকা। তারপর সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়ো যুদ্ধে। এ যুদ্ধ শেষ হবে না—যতোক্ষণ না ট্রয়ের প্রাসাদচূড়া মাটিতে ধ্বসে পড়বে, ততোক্ষণ এ যুদ্ধ চলবে।

১৫

হেলেনের জন্যে ?

ঈজিয়ান সমুদ্রে ভেসেছিল সহস্র রণতরী আর এখিয়ান আর ট্রোজান-দের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল দীর্ঘ দশ বছর ধরে—হেলেনের জন্যে ?

শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়েছিল ট্রয়।

হেলেনের জন্যে ?

ট্রয়ের অভিযান যদি শুধু থাকত কবির কল্পনায় আর চারণদের গাথায়—তাহলে নিশ্চয়ই হেলেনের জন্যে। হেলেনের জন্যে যুদ্ধ, হেলেনের জন্যে জয়পরাজয়, হেলেনের জন্যে সর্বনাশ।

কবি-কথা অনুসারে ট্রয় যুদ্ধের কারণ দেবতাদের খেয়াল আর নারীর মোহ। দেবরাজ জুপিটার যদি মর্তমানবীতে আসক্ত না হতেন তা হলে হেলেনের জন্ম হতো না। কে সবচেয়ে রূপসী তা নিয়ে দেবীদের মধ্যে যদি কলহ না হতো তাহলে প্যারিস পেত না হেলেনকে দেখে পাগল হবার সুযোগ, আর রিপুর প্রলোভনে হেলেন যদি প্যারিসের হাত ধরে স্বামী-সংসার না ছাড়ত তাহলে ট্রয় যুদ্ধ হতো না, ট্রয় ধ্বংস হতো না।

হোমার থেকে শুরু করে যুগ যুগান্তরের কবি ট্রয় যুদ্ধের মূলে হেলেনকে বসিয়েছেন। হোমারের মহাকাব্যের সামনে পেছনে নতুন নতুন সর্গ রচনা করেছেন এপিক-বৃত্তের কবিরা, অধ্যায়ের পর অধ্যায় সাজিয়ে উপক্রমণিকা ও উপসংহারে ট্রয় যুদ্ধের কাহিনীকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন। কেউই তাঁরা হেলেনকে বাদ দিয়ে ট্রয় যুদ্ধের কথা বলতে পারেন নি। পরবর্তীকালে যেসব হোমার-সন্তান চারণ-দল আয়োনিয়া ও গ্রীসের

নগরে নগরে ট্রয় যুদ্ধের গান গেয়ে ফিরেছে, তাদেরও গীতি-নায়িকা হেলেন। হোমারের ইলিয়াডে হেলেন নায়িকা বলে চিহ্নিত না হলেও স্কীয়ান তোরণের বুরুজ-শীর্ষে তার ইঙ্গিতময় উপস্থিতি।

হেলেনের জন্যে ট্রয় যুদ্ধ, এ কথা কোনো কবি এ পর্যন্ত অস্বীকার করেন নি। যে মুখের জন্য সহস্র রণতরী সমুদ্রে ভেসেছিল—স্মৃতি ও কল্পনার দিগন্ত সে মুখকে পরিহার করে নি।

হেলেনের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসের গুঞ্জন তুলেছেন অকবিরা। বাস্তববাদী ঐতিহাসিকরা, সংশয়বাদী পণ্ডিতরা। তাঁরা হেরোডোটাসের নজির টেনেছেন, হেরোডোটাসের ভাষ্য উল্লেখ করে বলেছেন—হেলেন যদি সত্যিই ট্রয়ে থাকত, তাহলে প্যারিসের এমনকি প্রায়ামের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ট্রয়বাসীরা নিশ্চিত তাকে গ্রীকদের হাতে ফিরিয়ে দিত। থিউকিডিডেসের বক্তব্যও লক্ষ্য করা যাক। তিনি তাঁর পেলোপনীসিয় যুদ্ধের ইতিহাসের সূচনায় গ্রীকদের নৌ-বলবৃদ্ধির আর উপনিবেশ সন্ধানের কথা বলতে গিয়ে ট্রয় যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু হেলেনের নামও উচ্চারণ করেন নি। হাজার যুদ্ধজাহাজ সমুদ্রপারে গেল, দশ বছর ধরে যুদ্ধ হলো, একটা বিরাট নগর পুড়ে ছাই হলো, একটা মহান্ রাজবংশ নির্বংশ হলো—হেলেনের জন্যে? একটা নারীর মুখের জন্যে? এ কখনো সম্ভব? পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনার আর কোনো নজির আছে?

কতো সভ্যতা উঠেছে, কতো সভ্যতা পড়েছে। মাটির ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কতো আকাশচুম্বী নগর, আবার মাটিতে লুটিয়েছে—চাপা পড়েছে মাটির নিচে। কিছু ধ্বংস হয়েছে প্রকৃতি আর কালের আঘাতে—অনেকই মানুষের হাতে। কিন্তু কই? কারো সর্বনাশের শিখরে হেলেনের মতো নারীমূর্তির ছায়া পড়ে নি তো? মাত্র ঈজিয়ান সাগর নয়, স্মরণাতীত কাল থেকে শুরু করে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ প্যাপিরাসের ভেলায় চেপে মহাসমুদ্র পার হয়ে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশের

তীরে গিয়ে পৌঁছেছে—কিন্তু নারীর আকর্ষণে তো নয়!

ট্রয় যুদ্ধের কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে আর এক পৌরাণিক মহাযুদ্ধের কাহিনী স্মর্তব্য, সে কাহিনী আর এক মহাকাব্যের উপজীব্য। রাম-রাবণের মহাযুদ্ধ—মহাকাব্য রামায়ণ। এ যুদ্ধের সূচনাতেও নারী-হরণ, সমাপ্তিতে হরণকারীর পরাজয় ও ধ্বংস। কিন্তু রামায়ণের মহা-কবি বাল্মীকি নায়ক রামের মুখ দিয়েই ঘোষণা করেছেন—সীতাহরণ পরোক্ষ কারণ মাত্র—এ যুদ্ধ ক্ষাত্রবংশের গ্লানিমোচনের জন্যে, রাক্ষস রাজ্যে আর্য বিজয়কেতন উড্ডীন করবার জন্যে। নারীর জন্যে নয়, সীতার জন্যে নয়।

রাক্ষসপুরী লঙ্কার মতো ট্রয়ও যদি থাকত শুধু কল্পনার আকাশে উড্ডীন তাহলে মাথা না ঘামালেও খুব একটা কিছু এসে যেতো না। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষের দিকে মাটির নিচে থেকে প্রায়ামের ট্রয় আবিষ্কৃত হলো আবিষ্কৃত হলো মাইকেনি আর আরো এখিয়ান নগরের ধ্বংসা-বশেষ। ট্রয় যুদ্ধ কল্পনার আকাশ থেকে নেমে এসে বাস্তবের মাটিতে ঠাঁই পেল। এ যুদ্ধ যারা করেছিল তাদের সভ্যতার চিত্র মাটির অন্ধকার থেকে উঠে এসে লুপ্ত ইতিহাসের এক নতুন আলোক-অধ্যায় রচনা করল। কল্পনা নিয়ে কাব্য নিয়ে ইতিহাসের কারবার নয়। ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা করতে হবে। বিচার করে দেখতে হবে ট্রয় যুদ্ধের প্রকৃত কারণ। এই বিচারে প্রবৃত্ত হলেন ঐতিহাসিকরা।

আধুনিক পণ্ডিতরা হেলেনকে বাতিল করে ট্রয় যুদ্ধের বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে চিরন্তন হানা-হানির মূল কারণ অর্থনৈতিক। সারাজেভোর হত্যা না ঘটলেই কি প্রথম মহাযুদ্ধ বন্ধ থাকত? আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণ কি শুধু হিটলারের পাগলামি আর মুসোলিনীর মাতলামি? গ্রীক ট্রোজানদের লড়াই মূলত বাণিজ্যিক লড়াই। সাম্রাজ্য সন্ধানের লড়াই। এই ব্যাখ্যার সমর্থনে পুরাণের ছবিকে নতুন করে আঁকতে হবে আর খুঁটিয়ে দেখতে

হবে সে যুগের মানচিত্র।

ঈজিয়ান সাগরের পশ্চিমে গ্রীসদেশ, তিন দিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা উপদ্বীপ। পাহাড়ী ভূখণ্ড—মাঝে মাঝে উর্বর উপত্যকা। তিন দিকে সমুদ্র, —সমুদ্র আবার নানা উপসাগরের রূপ নিয়ে দেশের মধ্যে ঢুকেছে। পূব পশ্চিম ও দক্ষিণ গ্রীসের তীরে তীরে নানা বন্দর।

ঈজিয়ান সমুদ্রের পূর্ব সীমান্তে এশিয়া মাইনর। আর এক উপদ্বীপ—বিভিন্ন সাগর দিয়ে যার তীরভূমি ঘেরা। পশ্চিমে ঈজিয়ান, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর, উত্তরে মার্মারা ও কৃষ্ণসাগর। এশিয়া মাইনরের তীরে তীরেও বন্দরের পর বন্দর। ঈজিযান সমুদ্রে দ্বীপের পর দ্বীপ ছুঁয়ে পারাপার করা খুবই সোজা। পাল-খাটানো আর দাঁড়টানা জাহাজে চড়ে দলে দলে মানুষের এপারে ওপারে আসা-যাওয়া। এই সমস্ত শহরে-বন্দরে আলাদা আলাদা রাজ্যে প্রাচীন গ্রীসদেশ. ভাগ করা। সংস্কৃতিতে এক, রাষ্ট্রব্যবস্থায় এক নয়। আর একটি ব্যাপারে এক —তা হলো সামুদ্রিক অভিযানে—সমুদ্রপারের দেশে দেশে বাণিজ্য বিস্তারের প্রেরণায়।

ব্রোঞ্জ যুগের সূচনা থেকেই গ্রীসের অধিবাসীরা সমুদ্রবিহারী। সমুদ্রকে তারা ভালবাসে। সমুদ্র পার হয়েই ক্রীট থেকে সভ্যতা তাদের কাছে পৌঁছেছে। সমুদ্র পার হয়েই এসেছে পেলপস্‌ের মতো অভিযাত্রী। ঈজিয়ান সমুদ্রের প্রতিটি দ্বীপে তাদের আনাগোনা, এশিয়া মাইনরের সারা তীরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ।

গ্রীসের মানুষ সুপ্রাচীন কাল থেকে দলে দলে এক ঠাঁই থেকে আর এক ঠাঁইতে গিয়েছে, এক তীর থেকে আর এক তীরে হানা দিয়েছে, এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে গিয়ে বাণিজ্য করেছে। তারপর এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। প্রথমে জলদস্যু, তারপর বণিক, সবশেষে ঔপনিবেশিক। এই ভাবেই গ্রীস ঈজিয়ানের এপার ওপার জুড়ে নিজের প্রভাব পাকা করেছে।

এখিয়ান আমলেই গ্রীসের বহির্বাণিজ্যের বিপুল প্রসার। মাইকেনি-য়ান সভ্যতার পসরা নিয়ে এখিয়ান বীররা বাণিজ্য পথের অভিযাত্রী, পথের বাধা দূর করবার জন্যে তাদের হাতে ব্রোঞ্জের অস্ত্র। পণ্যভর্তি বাণিজ্যতরীকে সামাল দেবার জন্যে সৈন্যভর্তি রণতরী।

সারা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে গ্রীসের রপ্তানির কারবার। গ্রীসের পাহাড়ী মাল-ভূমিতে লক্ষ লক্ষ ভেড়া চরে, প্রধান রপ্তানি ভেড়ার পশম। তাছাড়া প্রধান চাষ অলিভ আর আঙুর। অলিভের তেল দিয়ে গ্রীস প্রতিবেশী সব দেশকে ভিজিয়েছে, দ্রাক্ষার মদে মজিয়েছে।

শিল্পদ্রব্যও চমৎকারী। এখিয়ান রাজপ্রাসাদেই মেলে তার অজস্র নমুনা। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো মৃৎশিল্প, নানা রঙে রাঙানো নানা অলঙ্করণে অলঙ্কৃত অনুপম মৃৎশিল্পে গ্রীসের স্থান সব দেশের মাথায়। মিশর এশিয়া মাইনর ছাড়িয়ে হিটাইট সাম্রাজ্য ছাড়িয়ে অ্যাসিরিয়া ব্যাবিলন পর্যন্ত মাইকেনিয়ান মৃৎশিল্পের আদর।

এই সমস্ত রপ্তানির বিনিময়ে বিভিন্ন বন্ধুরাজ্য থেকে গ্রীসের আমদানি। খাদ্যশস্য তো আছেই—তাছাড়া আছে নানা মহার্ঘ পণ্য। গজদন্ত আসে সিরিয়া থেকে। মণিমুক্তা আসে মেসোপটেমিয়া থেকে, রূপা আসে অ্যানাটোলিয়া থেকে আর তামা এবং সোনা আসে মিশর আর নিউবিয়ার খনি থেকে। পসরা ভর্তি বাণিজ্য জাহাজ সর্বদা এপার ওপার করে পূর্ব সমুদ্রে।

মানচিত্রের দিকে এক ঝলক তাকালেই ট্রয়ের স্থানমাহাত্ম্য চোখে ফুটে উঠবে। ঈজিয়ান সমুদ্রের উত্তর-পূব কোণে হেলিস্পণ্ট বা ডার্ডানেলিস প্রণালী—রাজহাঁসের গলার মতো লম্বা আর সরু। এই প্রণালী মার্মারা সাগরে গিয়ে পড়েছে। তার উত্তর-পূবে আর একটি হ্রস্ব প্রণালী—নাম বসফরাস। বসফরাসের ওপ্রান্তে কৃষ্ণ-সাগর।

অতুল সম্পদ কৃষ্ণ-সাগরের তীরে। তাই বুঝি তার আর এক নাম ইউকসাইন বা সব পেয়েছির জলধি। সমুদ্রচারী জাতির স্বর্গরাজ্য, কেন

না সেখানে সবচেয়ে সুলভে আর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় জাহাজ তৈরির মালপত্র—পাটাতন আর মাস্তুলের কাঠ, পাল তৈরির কাপড়, কাপড় আর দড়ি বানানোর শন। সস্তায় জাহাজ বানিয়ে তার খোল ভর্তি করে জওয়ার গম আর শুকনো মাছ তো আনা যাবেই—কাঁচা পণ্যের বিনিময়ে পাকা পণ্যও আনা যায় সিন্ধুক বোঝাই করে—সোনা আর রূপা।

হেলিস্পণ্ট প্রণালীর ঠিক মুখে ট্রয়ের অবস্থিতি। কৃষ্ণ-সাগরের মুখে মোক্ষম পাহারা। সমুদ্রতীরবর্তী হয়েও ট্রয়ের জাহাজ বানাতে হয় না। বহির্বাণিজ্য করতে হয় না, কারো সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয় না। ট্রয় শুধু চুপচাপ পাহারা দেয়। ট্রয় অনুমতি দিলে বাণিজ্য জাহাজ হেলিস্পণ্ট দিয়ে যাওয়া-আসা করবে, অনুমতি নাকচ হলে তা বন্ধ। কী পেলে অনুমতি দেবে ? কর পেলে, উপঢৌকন পেলে, অর্থ পেলে, সম্পদ পেলে। যা দাবী করবে সুদে আসলে তার আদায় পেলে। ট্রয়ের শক্তি তার ভৌগোলিক শক্তি। সেই শক্তিবলে সব-পেয়েছির দেশের ওপর তার অটুট কর্তৃত্ব।

তাই বাণিজ্যবিহারী এথিয়ানদের চিরশত্রু ট্রয়। ট্রয়কে দেখে নিতে হবে। মুক্ত করতে হবে কৃষ্ণ-সাগরের পথ। পুরাণ কাহিনীতে সেই অভীপ্সারই ইঙ্গিত।

সেই পথে পুরাণ-প্রসিদ্ধ অভিযাত্রী জেসন। কৃষ্ণ-সাগরের পূর্ব তীরবর্তী ফ্যাসিস নদীর মোহানায় কলকিস রাজ্য থেকে সোনার পশম তিনি হরণ করে এনেছিলেন। গ্রীসের নানা রাজ্যের নানা বীরকে একসঙ্গে জুটিয়ে জেসনের নেতৃত্বে আর্গো জাহাজের জলযাত্রা কৃষ্ণ-সাগরের সন্ধানে গ্রীসের প্রথম সম্মিলিত প্রয়াস। ট্রয়ের রাজা লাওমেডনকে লুকিয়ে গভীর রাতের অন্ধকারে জেসনকে হেলিস্পণ্ট পাড়ি দিতে হয়েছিল। ট্রয় ঘুমন্ত ছিল বলেই এই অভিযান সফল হয়েছিল। লাওমেডন বুঝেছিলেন—জেসনের অভিযান বিপদের শুরু। তাই শুধু সমুদ্রতীরের

পাহারাই তিনি জোরদার করেন নি—রাজধানীকেও দুর্মদ প্রাচীর দিয়ে ঘিরেছিলেন।

কৃষ্ণ-সাগরের দ্বিতীয় অভিযাত্রী হারকিউলিস। তিনিও গিয়েছিলেন স্বর্ণ সন্ধানে। কৃষ্ণ-সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে থার্মোডিন নদীর তীরে অ্যামাজন রাজ্যে। হারকিউলিসের সঙ্গেও শত্রুতা করতে কার্পণ্য করেন নি লাওমেডন।

লাওমেডনকে ধ্বংস করলেও হেলিস্পণ্টের পথকে উন্মুক্ত করতে পারেন নি হারকিউলিস। শত্রুর শেষ রেখে এসেছিলেন।

ট্রয়ের যেটুকু ক্ষতি হারকিউলিস করেছিলেন তা বহুগুণে পূর্ণ করতে প্রায়ামের দেরি হয় নি। হারকিউলিসের হাতে ভাঙা ট্রয়ের প্রাচীরের অংশটুকু সঙ্গে সঙ্গে তিনি সারিয়ে নিয়েছিলেন। পিতার আমলে একাধিকবার হেলিস্পণ্টে হানা দিয়েছে গ্রীক নৌবাহিনী—তবু মাঝ দরিয়ায় শত্রুকে রুখবার জন্যে প্রায়াম নৌবাহিনী গড়েন নি। বাণিজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য দিয়ে প্রতিযোগিতা করেন নি।

প্রায়াম বুঝেছিলেন হেলিস্পণ্টের পাহারা আর রাজধানীর আরক্ষার জন্য দরকার সামরিক শক্তির। প্রায়াম সেই শক্তিতে ট্রয়কে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। দুর্মদ স্থলসৈন্য বাহিনী তিনি গঠন করেছিলেন—রাজপুত্রদের দিয়েছিলেন বীর সেনাপতির শিক্ষা। যে অস্ত্রে গ্রীক বীররা যুদ্ধ করে ঠিক সেই অস্ত্র দিয়েছিলেন তাদের হাতে। ট্রয়ের সামরিক শক্তিকে ভয় না পেয়ে আর উপায় ছিল না সমুদ্রচারী কোনো বণিকজাতির।

কৃষ্ণ-সাগর অঞ্চলের সমস্ত বাণিজ্যের মোটা উপসত্ত্বভোগী রাজা প্রায়াম। থ্রেস, বিথীনিয়া, প্যাফলাগোনিয়া, কলকিস প্রভৃতি রাজ্য তাঁর হাতের মুঠোয়। তাঁর পাওনা না মিটিয়ে কোনো বাণিজ্যতরী কৃষ্ণ-সাগরে যাতায়াত করতে পারে না। যা তিনি চান তা তাঁকে দিতেই হবে। আকাশছোঁয়া দাবীর সঙ্গে ট্রয়ের শক্তি-সমৃদ্ধিও আকাশ

ছোঁয়া।

সারা এশিয়া মাইনরের সমুদ্রতীরবর্তী রাজ্যগুলিও ট্রয়ের বশংবদ। যেমন মাইসিয়া, কেরিয়া, লিসিয়া। তারা মোটামুটি মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসাদার। পশ্চিমের পণ্য পূবে আর পূবের পণ্য পশ্চিমে চালান দেওয়া তাদের কাজ। মাথার ওপরকার প্রচণ্ড প্রতিবেশীকে তারা ডরায়। ট্রয়ের অভিভাবকত্ব তাদের শক্ত খুঁটি।

সেই খুঁটি ভাঙবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন মাইকেনিরাজ অ্যাগামেমনন। ট্রয়ের বিরুদ্ধে সম্মিলিত গ্রীক অভিযানের ডাক তিনি দিয়েছিলেন। একই উদ্দেশ্যে গ্রীক রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগ দিয়েছিল ঈজিয়ানের দ্বীপরাজ্যগুলি—যেমন ক্রীট, রোডস, আর ডেলস। ট্রয়ের বিরুদ্ধে এথিয়ানদের সমুদ্রযাত্রা বহির্বাণিজ্যের নতুন পথকে উন্মুক্ত করার অভিযান। এ অভিযান শুধু ঈজিয়ান সমুদ্রে নয়, শুধু এশিয়া মাইনরের তীরে নয়– ডার্ডানেলিস ছাড়িয়ে মার্মারা সাগর—বসফরাস ছাড়িয়ে কৃষ্ণ-সাগর, কার্চ প্রণালী পাব হয়ে অ্যাজভ সমুদ্র পর্যন্ত।

ট্রয় যুদ্ধ হয়েছিল বাণিজ্যলক্ষ্মীর জন্যে। এই যুদ্ধে জিতে গ্রীকরা বাণিজ্য-লক্ষ্মীকে জয় করেছিল। এ যুদ্ধ গ্রীসের এক মহান জাতীয় ঘটনা। জাতীয় ঐক্যের প্রথম প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই যুদ্ধজয়ে সারা পূর্ব এশিয়ায় গ্রীক উপনিবেশ ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যেব ভিত্তিস্থাপনা।

ট্রয় যুদ্ধ হেলেনের জন্যে ?
মাত্র এক নারীকে নিয়ে কাড়াকাড়ি ?
এ শুধু কবির কল্পনা।

১৬

কিন্তু হাইনরিখ স্লীম্যানের বিশ্বাস ছিল অন্য।

স্লীম্যান তখন বাচ্চা ছেলে। জন্মদিনের উপহার হিসেবে বাবার কাছ থেকে ঢাউস এক ছবির বই তার হাতে এসেছে। পৃথিবীর নামকরা শিল্পীদের নামকরা ছবি। পাতার পর পাতা ওলটায়, হাঁ করে ছবির পর ছবি দেখে।

একটা ছবি খুব চেনা চেনা লাগল। বিশাল একটা শহর আগুনে পুড়ছে—অগ্নিশিখায় লাল হয়ে আছে পিছনের আকাশ। সামনের দিকটা অন্ধকার—মস্ত একটা গেটের আদল। সেই গেট দিয়ে একটা বুড়োকে কাঁধে নিয়ে বলিষ্ঠ একটা লোক পা টিপে টিপে এগোচ্ছে।

ভাটিকানের দেয়ালে রাফায়েলের আঁকা বিরাট ফ্রেস্কো—হয়তো তারই প্রতিচ্ছবি।

চুপ করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ট্রয়ের গল্প ইতিমধ্যে সে বাবার কাছে শুনেছে—সেই গল্প মনে পড়ল।

ট্রয় পুড়ছে—না বাবা?

ঠিক। আর বুড়ো বাপকে কাঁধে নিয়ে ডার্ডানিয়ান গেট পার হয়ে ঈনিয়াস পালাচ্ছে।

কেমন করে আঁকল বাবা? আঁকিয়ে কি ট্রয় দেখেছে?

পাগল? বাবা বললেন—

কল্পনা করে এঁকেছে। ট্রয় দেখবে কেমন করে? ট্রয় কি আছে?

অ্যাঁ? কোথাও নেই, একটুও নেই?

কী করে থাকবে? হেলেনকে উদ্ধার করার পর ওরা ট্রয়কে গুঁড়িয়ে

পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেল যে!

কিন্তু ঐ যে গেট? ঐ যে পাঁচিল?

আরে বোকা! হেলেন যদি কল্পনা হয়, ট্রয় যুদ্ধ যদি কল্পনা হয়, কবির সেই কল্পনা নিয়ে শিল্পী একটা ছবি আঁকতে পারে না?

বাবার কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল ছেলেটার। এমন দারুণ গল্প, এমন চমৎকার ছবি—সব শুধু কল্পনা? হোমার পড়ল বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, পড়ল গ্রীক পুরাণ আর ট্রয় যুদ্ধের সমস্ত কাহিনী। মনের মধ্যে দানা বাঁধল দৃঢ় বিশ্বাস। ট্রয় আছে, ট্রয় সত্য। হোমারের প্রতিটি কথা সত্য—মেনিলাওস সত্য, প্যারিস সত্য। আর সবার বড়ো সত্য হেলেন। হেলেনের জন্যে ট্রয় যুদ্ধ—হেলেন নইলে ট্রয় ধ্বংস হতো না।

চুয়াল্লিশ বছর পরে হেলিস্পণ্টের মাইল তিনেক দক্ষিণে হিসারলিকের টিবি খুঁড়ছেন স্লীম্যান। পাশে দাঁড়িয়ে এক পরমা সুন্দরী গ্রীক তরুণী। স্লীম্যানের নব-পরিণীতা। স্বামীর ছায়ানুবর্তিনী সহধর্মিনী। হোমারের বরেই স্লীম্যান তাকে পেয়েছেন। হোমারই এমন মেয়েকে জুটিয়ে দিয়েছেন তাঁর পাশে।

যৌবনের শ্রমতপ্ত প্রতিটি দিন কেটেছে দেশে দেশে বিত্ত সংগ্রহের অদম্য উদ্যমে, আর দিনান্তের শ্রান্ত ভাবনার ছায়া ফেলেছে ট্রয়ের প্রাচীর আর হেলেনের মুখ। প্রৌঢ় প্রহরে স্থির করলেন এবার সব কিছু ছেড়ে ট্রয়ের সন্ধানে যেতে হবে। মনে তখন আর এক চিন্তা। ট্রয়ের ভাঙা প্রাচীরের নিষ্প্রাণ ভিত্তিতল হয়তো খুঁজে পাব, কিন্তু হেলেনকে পাব কোথায়—পরিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার রঙে জীবন-প্রদোষের ম্লান দিগন্তকে যে রাঙিয়ে দেবে?

স্লীম্যান চিঠি লিখলেন গ্রীসবাসী এক পুরোনো বন্ধুকে।

আমি ট্রয়ের সন্ধানে যাব, কিন্তু সেই যাত্রায় একজন সঙ্গিনী চাই। তাকে আমি জীবনসঙ্গিনী করব। তাকে জাতিতে গ্রীক হতে হবে, সেই সঙ্গে ট্রয় বাসিনী হেলেনের মতো সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী। গরীবের

ঘরের মেয়ে হলেও চলবে, তবে শিক্ষা থাকা চাই। ভালো করে পড়া থাকা চাই হোমারের মহাকাব্য আর গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাস। এমন একটি মেয়ের সন্ধান দিতে পারো ?

এমনই মেয়ে জুটল স্লীম্যানের ভাগ্যে। সপ্তদশা সোফিয়া।

নববধূ সোফিয়াকে নিয়ে স্লীম্যান গিয়েছেন ট্রয়ের প্রান্তরে। সেখানে তিন বছর ধরে খোঁড়ার কাজ চলেছে। দেড়শো শ্রমিক সমানে কাজ করে যাচ্ছে। ট্রয় আবিষ্কৃত হয়েছে। মাটির নিচে থেকে তিন হাজার বছরের আগেকার ছোট বড়ো এতো নিদর্শন বার হয়েছে যা দিয়ে মস্ত একটা মিউজিয়ম ভরে ফেলা যায়। শুধু আবিষ্কারই নয়, প্রতিদিনের রোজ-নামচায় স্লীম্যান লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর এই সার্থক অভিযানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। সারা জগৎ চমৎকৃত হয়েছে তাঁর সাফল্যে।

অনেক হয়েছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন স্লীম্যান। প্রবীণ বয়সের বাতিকে পরিশ্রমের শেষ নেই। রোদে জলে আর রোগব্যাধিতে জরজর দেহ। বয়সও পঞ্চাশ পার। আর নয়—এবার সব কিছু গুটিয়ে ফিরে যাবার পালা।

প্রাচীন প্রাসাদের একটা ধ্বংসস্তূপ সম্প্রতি মাটি খুঁড়ে বেরিয়েছে। স্লীম্যানের ধারণা এটাই প্রায়ামের প্রাসাদ। সেই প্রাসাদের মাটিতে খোঁড়াখুঁড়ি চলছে সেদিন। শ্রান্ত স্লীম্যান নিষ্প্রাণ চোখ মেলে শ্রমিক-দের কাজ দেখছেন।

পাশে দাঁড়িয়ে আছে পত্নী সোফিয়া। সোফিয়া শুধু রূপযৌবন দিয়েই স্লীম্যানকে ভোলায় নি। পিতৃগৃহে স্লীম্যানের সঙ্গে যখন তার প্রথম সাক্ষাৎ, তখনই সে বুঝেছিল কী দিয়ে এই বিচিত্র পাণিপ্রার্থীকে ভোলানো যায়। ভোলাবার মতো বিচিত্র ধনও তার ছিল। এক ঝলক তীব্র দৃষ্টি সোফিয়ার মাথা থেকে পা পর্যন্ত বুলিয়ে স্লীম্যান হেঁকেছিলেন—এই এথেন্স তোমার জন্মভূমি—তাই না ?

সোফিয়া নীরবে মাথা নেড়েছিল।

বেশ, এই এথেন্সে রোমের সম্রাট হাডরিয়ান কবে এসেছিলেন বলতে পারো ?

উত্তরে নির্ভুল তারিখ বলেছিল সোফিয়া।

হ্যাঁ, বলেছিলেন স্লীম্যান। একটু চুপ করে থেকে গলা নামিয়ে বলেছিলেন—

আচ্ছা, হোমারের কোনো লাইন মনে আছে তোমার ?

সুললিত গলায় আর নির্ভুল উচ্চারণে ইলিয়াড থেকে পুরো একটি প্যাসেজ আবৃত্তি করে শুনিয়েছিল মেয়েটি।

এবার সোফিয়ার নতমুখের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়েছিলেন স্লীম্যান। শেষ প্রশ্ন করতে দেরি করেন নি।

সোফিয়া, তোমার নাম সোফিয়া না? শোনো সোফিয়া, জামাই আদরে এক ঠাঁই বসে থাকবার মানুষ আমি নই। আমি যেখানে যাব, আমার সঙ্গে তুমি যাবে ?

এবার সোফিয়া স্লীম্যানের দিকে চোখ তুলে তাকাল। বললে—

আমি শুনেছি। ট্রয় তো ? যাব।

সেই ট্রয়ের ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সোফিয়া। বছরের পর বছর ধরে স্বামীর পাশে পাশে আছে। আছে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে, যখন সারা গায়ে ফোস্কা পড়ে যায়। প্রচণ্ড শীতে, যখন দেহের রক্ত জমাট বেঁধে যায় ঠাণ্ডায়। ছেড়ে যায় নি একদিনের জন্যেও।

হঠাৎ স্লীম্যানের নজর পড়ল ভাঙা দেওয়ালের ভিতের পাশে একটা গর্তের মধ্যে। সেখানে টুকরো টুকরো কালো নুড়ি আর পাঁশুটে ধূলো-বালির আড়ালে কী যেন চকচক করছে। ঠিক দুপুরের সূর্যরশ্মি যেন ঠিকরে যাচ্ছে ঐখানটায় পড়ে।

আর কারো নজরে পড়ে নি তখনো। স্লীম্যানের বুকের মধ্যে দামামা বাজছে যেন। সেই দামামার প্রতিধ্বনি উঠল হুকুমে—

ব্যস ব্যস, আর নয়, কাজ বন্ধ !

কাজ বন্ধ ? সে কী ? সারাদিন পড়ে আছে যে !

থাকুক। ভুলেই গিয়েছিলাম আজ আমার জন্মদিন। আজ তোমাদের ছুটি—যাও বিশ্রাম করগে, ফুর্তি করগে। পুরোদিনের মজুরি পাবে।

ফাঁকা হয়ে গেল চারদিক। শেষ শ্রমিকটি চলে যাবার পর একটা কোদাল হাতে তুলে নিলেন স্লীম্যান। সোফিয়াকে কাছে ডাকলেন—

এসো এখানটায় আমার সঙ্গে।

তারপর সেই ভাঙা দেয়ালের ধারে সেই গর্তের মধ্যেকার শক্ত মাটি সরিয়ে তিনি তুলতে লাগলেন—শুধু সোনা আর সোনা।

সোনার তাল নয়—অলঙ্কার। সোনার মুকুট, সোনার টায়রা, সোনার ঝালর, সোনার দুল, সোনার কানপাশা, সোনার আংটি, সোনার লকেট, সোনার বহুলহরী হার। এবং এক একটা নয়—অনেক, অনেকগুলো করে।

সোফিয়ার ঘাঘরায় এক এক করে এইসব অলঙ্কার ভরে দিলেন স্লীম্যান। তারপর কাঁপা হাতে তার হাত ধরে ফিরে এলেন আস্তানায়। হিসারলিকের ঢিবির কোলে কাঠের একটা নড়বড়ে বাসা, ঘূর্ণিঝড়ে ফাটা দেয়াল দিয়ে ধুলোবালি ঢোকে, ফুটো ছাদ দিয়ে বৃষ্টির ধারা মেঝে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

পড়ন্ত বিকেলের সোনালী আলো জানলা দিয়ে সোফিয়ার মুখে এসে পড়েছে।

এক এক করে সব কটি অলঙ্কার সোফিয়াকে তিনি পরালেন।

সোফিয়ার বিস্মিত চোখে সোনার আভা ?

এ সব কার অলঙ্কার ? আমাকে কেন পরাচ্ছ ?

প্রিয়তমা গ্রীক বধূর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে স্লীম্যান ফিসফিস করে বললেন—

হেলেনের। কথা বোলো না, চুপটি করে বোসো। আলো থাকতে থাকতে হেলেনের মুখ একটু আমাকে দেখতে দাও !

কেমন সে মুখ—যে মুখের জন্যে দশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধ—কেমন সে রূপ, যে রূপের অন্য নাম সর্বনাশ ? সে রূপ অবর্ণনীয়।

সাহিত্যে সে রূপের বর্ণনা নেই, ভাস্কর্য চিত্রকলার রেখায় রঙে সে রূপের প্রতিফলন নেই। কোনো কবি কোনো শিল্পীর সৃষ্টিতে সে রূপের কোনো প্রতিবিম্ব নেই। বিশ্বের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলে যার নাম, যার কল্পনায় চিরকাল পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা—তার সৌন্দর্যের কোনো নিরিখ নেই। সে অপরূপা।

সামনে রণক্ষেত্র। গ্রীক আর ট্রোজান সেনারা মুখোমুখি। আসন্ন যুদ্ধ দেখবার জন্যে তোরণস্তম্ভের শিখরে সমবেত হয়েছেন বৃদ্ধ রাজা প্রায়াম আর নগরবৃদ্ধরা। এমন সময় হেলেন সেখানে এলো।

হেলেনকে দেখেই নগর-প্রবীণরা মাথা নিচু করলেন। রূপের মোহে আকৃষ্ট হবার বয়েস তাঁদের নেই। তবু তাঁরা নিজেদের মধ্যে মন্তব্য করলেন—

দ্যাখো দ্যাখো, ঐ হেলেনকে দ্যাখো। এই নারীর জন্যে ট্রোজান আর এখিয়ানদের মধ্যে এত্তো যুদ্ধ, এতো দুঃখ, এতো রক্তপাত—কিন্তু তাদের দোষ দেবে কে ? এ যে মৃত্যুহীনা নারীর প্রতিমূর্তি !

হেলেনের রূপ সম্বন্ধে এইটুকুই হোমারের উল্লেখ। মর্তের নশ্বরী মানবী, কিন্তু তার কান্তি যদি হয় মৃত্যুহীনা দেবীর মতো, সহস্র মৃত্যুই তো তার স্বাভাবিক উপঢৌকন ! ব্যস, এইটুকুই উক্তি, শীতরক্ত বৃদ্ধের এটুকু সংলাপেই হেলেনের রূপ-চুম্বকের যথার্থ পরিচয় !

হেলেনের প্রতি হোমারের বিশেষণ-কার্পণ্য লক্ষ্য করবার মতো। হেলেন সুকেশী, তার বাহুদুটি শুভ্র, অন্য রমণীর তুলনায় সে উজ্জ্বলা —হেলেনের দেহবর্ণনায় হোমার এর বেশি একটি কথা ব্যবহার করেন নি। অথচ ইলিয়াডের ছত্রে ছত্রে বর্ণনা আর বিশেষণের ছড়াছড়ি। ইলিয়াডের বিভিন্ন দৃশ্যে প্যারিস হেকটর প্রায়াম ট্রয়ের তিন প্রধান

পুরুষই হেলেনের সঙ্গে কথা বলেছেন—কেবল নামটুকু ছাড়া আর কোনো বর্ণনাময় সম্বোধনে তাঁরা তাকে ডাকেন নি।

কামের উৎপিপাসা, ক্রোধের বিস্ফোরণ, হিংসার হুহুঙ্কার আর ধ্বংসের পাশবিকতার মাঝখানে বসে মহাকবির মন সুন্দরের তিয়াসী। অসুন্দর যুদ্ধ-মাতাল পরিবেশে সুন্দরের ব্যাকুল সন্ধান। সুন্দর প্যারিসের কক্ষ; যুদ্ধাস্ত্র, চিতাচর্মের বর্মঢাকা পোশাক। সুন্দর হেকটরের হয়পুচ্ছ-শোভিত উষ্ণীষ। সুন্দর অ্যাকিলিসের জ্যোতি-সংকাশ উজ্জ্বল ঢাল। সুন্দর দেবরাজ জুপিটারের মেঘতর্জক বজ্র, দেবী জুনোর আয়ত বিশাল গবাক্ষ-আঁখি, দেবী ভিনাসের শঙ্খ-শুভ্র যুগল কুচ। আবো সুন্দর কতো কী—সুন্দর উষার আলো, সন্ধ্যার বাতাস, গভীর রাতে তাবার ঝিকিমিকি। সুন্দর যুদ্ধের ঘোড়া রথের চাকা আর মদের পাত্র।

সুন্দর সব কিছু—কিন্তু হেলেন যে সুন্দর, হোমারেব বর্ণনায় তা অনুক্ত রয়ে গেছে।

এপিক-বৃত্তের বাকি কাব্যগুলি হোমারের পর এক শতাব্দী কালের মধ্যেকার রচনা। এগুলি ইলিয়াডেরই পরিপূরক উপক্রমণিকা আর উপসংহার। হেলেনের জন্মরহস্য আর বিবাহ কাহিনী, প্যারিসের বিচার আর হেলেন হরণ, ট্রয়ের পতন আর মেনিলাওসের সঙ্গে হেলেনের পুনঃসাক্ষাৎ সংপূরক কাব্যগুলিতে বিধৃত। হেলেনের রূপবর্ণনা এই সব কবিরাও করেন নি। হোমার যা করেন নি তার চেষ্টা করতেও তাঁরা সাহসী হন নি।

ক্ল্যাসিক্যাল গ্রীসের আদি নাট্যকার ঈসকাইলাস স্বীকার করেছিলেন—হোমারের ভোজসভার খাদ্যাংশ কুড়িয়েই আমার ভাণ্ডার। সফো-ক্লিসের শতাধিক নাটকের এক-তৃতীয়াংশ নাকি ট্রয়কাহিনীর ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল। তাঁর যে সাতটি নাটক এখন পাওয়া যায় তার মধ্যে তিনটির বিষয় বস্তু ট্রয় যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জানি নে তাঁর বিপুল বিনষ্ট রচনাবলীর মধ্যে হেলেন কী ভাবে প্রতিভাত হয়েছিল।

ইউরিপিডেসের বিরেনব্বইটি নাটকের মধ্যে উত্তর যুগের কাছে উনিশটি এসে পৌঁছেছে। দুটি নাটকে হেলেনের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি। 'ট্রয়ান নারী' নাটকে হেলেনের পাংশু মুখ ধ্বংসের কালাগ্নিশিখায় আরক্তিম আর 'হেলেন' নাটকে তারই নামভূমিকা। ডিয়োডোরাস, ডায়োনিসিয়াস ও পসেনিয়াসের রচনায় ট্রয় যুদ্ধের প্রসঙ্গ ও হেলেনের উল্লেখ।

গ্রীস থেকে রোম—রোম থেকে সারা প্রতীচ্য জগতে ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতির বিস্তার। মূলে ট্রয় যুদ্ধ। ট্রয় দগ্ধ বিধ্বস্ত না হলে ঈনিয়াস স্ক্যামাণ্ডারের নদী-উপত্যকা ছেড়ে পালাত না, তার ভাগ্যধর বংশধর রোমিউলাসের হাতে টাইবার নদীর তীরে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা হতো না, ট্রোজান রাজবংশের শোণিত-গর্বে গর্বিত হতেন না জুলিয়াস সীজার।

ল্যাটিন সাহিত্যের মহারথীদেরও রচনার প্রধান পটভূমিকা গ্রীক-ট্রোজান মহাসংঘর্ষ। এই যুদ্ধই ভার্জিলের 'ঈনিড' মহাকাব্যের পূর্বপট। ওভিড তাঁর 'হেরোয়িডস' গ্রন্থে প্যারিস-হেলেনের কল্পিত প্রেমপত্র রচেছেন। দার্শনিক সেনেকার প্রবন্ধ ও পত্রাবলীতে বহু ট্রোজান ঘটনার উল্লেখ। প্লুটার্ক তাঁর জীবনী-সংগ্রহে ট্রয় যুদ্ধের নানা বীরের চিত্র এঁকেছেন। লুসিয়ানের চতুর লেখনী ট্রয়-পুরাণের নানা ঘটনাকে কৌতুকের রঙে চিত্রিত করেছে। কবি কুইনটাস পূর্বসূরীদের বর্ণনায় নানা বর্ণাঢ্য সংযোজনে ট্রয়ের পতন নিয়ে নতুন মহাকাব্য রচনা করেছেন। ডিকটিস আর ডারেস সংকলন করেছেন ট্রয় যুদ্ধের ঘটনাপঞ্জী।

গ্রীস আর রোম—এই দুই দেশের ক্ল্যাসিক্যাল যুগের প্রতিটি নাট্যকার কবি দার্শনিক ভাষ্যকারের রচনায় অতুল রূপময়ী পরম লাস্যময়ী আর চরম ধ্বংসময়ী হেলেনের অনিবার্য উপস্থিতি। কিন্তু বর্ণনা দূরে থাক, হেলেনের দেহলাবণ্য কল্পনাও কেউ করতে পারেন নি। ভাগ্যহত কবি স্টেসিকোরাস তো স্বীকৃতিপত্র লিখে কবুল করেছেন—ট্রয়ের হেলেন দেহবতী মানবী নয়, ছায়ানারী মাত্র।

সে যুগের কোনো চিত্রকর কি হেলেনের মুখচ্ছবি এঁকেছিল ? কোনো ভাস্কর কি মর্মরের কাঠিন্য ভেঙে পেলবরেখায় ফুটিয়েছিল হেলেনের দেহশ্রী ? জানিনে—তার কোনো নিদর্শন এ যুগের চোখের সামনে এসে পৌঁছয় নি। হেরাক্লিয়ার চিত্রশিল্পী জিউকৃসিস নাকি তাঁর শহরের পাঁচজন শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর দেহসুষমা তিল তিল করে সংগ্রহ করে হেলেনের এক দিক্‌বসনা চিত্র এঁকেছিলেন—কাল তাকে হরণ করেছে। অ্যাথেনা পার্থেনসের স্রষ্টা ফিডিয়াস বা নিডিয়ান ভিনাসের শিল্পী প্র্যাকসিলেটিসের মতো ভাস্করের হাতে গড়া হেলেনের কোনো মর্মর-মূর্তি আমরা দেখি নি।

মহাকাব্য ইলিয়াড যুগ যুগ ধরে কতো চিত্রশিল্পীকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। তাঁরা লেডা ও জুপিটারের সংগমদৃশ্য এঁকেছেন, প্যারিসের বিচারের ছবি এঁকেছেন, স্কীয়ান গেটের সম্মুখবর্তী রণক্ষেত্র এঁকেছেন, কাঠের ঘোড়া আর হুতাশনদগ্ধ প্রায়ামের প্রাসাদ এঁকেছেন—কিন্তু হেলেনকে আঁকেন নি।

বিশেষ করে প্যারিসের বিচার। নারীর সৌন্দর্য-মহিমার শ্রেষ্ঠ বিচার মর্ত্যের পুরুষের চোখে—সেই বিচারের প্রত্যাশায় স্বর্গের দেবীরাও তার সামনে নগ্নিকা হয়ে দাঁড়ায়—শিল্পীর পক্ষে এমন লোভনীয় বিষয়-বস্তু আর কী? প্রতি যুগের বিখ্যাত চিত্রকররা এই একটি বিষয় নিয়ে অমর চিত্র অঙ্কন করেছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এঁকেছেন রাফায়েল আর গিলো রোমানো, রাফায়েলের পরে ক্র্যানাচ, সপ্তদশ শতাব্দীতে রুবেনস, উনবিংশ শতাব্দীতে জাঁ ওয়াটু আর বিংশ শতাব্দীতে রেনোঁয়া। এইসব সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে যুগে যুগে তাঁরা নারীর স্বর্গকান্তির সন্ধান করেছেন। কিন্তু স্বর্গদেবীর আশিসধন্যা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা মানবকন্যার পূর্ণ-প্রতিকৃতি কেউ আঁকেন নি।

কবির চোখ শিল্পীর চোখ হেলেনের রূপ দেখে নি। আমরা জানিনে হেলেন তন্বী ছিল কি না, দীর্ঘাঙ্গী ছিল কি না, জানিনে হেলেন শ্যামা

না গৌরী, হেলেনের চুল ধূসর না স্বর্ণাভ, হেলেনের চোখ কালো না নীল।

শিল্পীর মতো রং-তুলি হাতে না থাক, কবির মনে কল্পনা তো আছে! কল্পনার সহজ প্রকাশ উপমায়। নারীর রূপবর্ণনায় উপমার সাহায্য সব কবিরাই নিয়েছেন। সেই আদি ও চিরন্তন উপমা—মেঘের মতো চুল, তারার মতো চোখ, লতার মতো বাহু, গিরিচূড়ার মতো স্তন। উষার মতো বর্ণ, শষ্যক্ষেতের মতো লাবণ্য। শুধু হোমার নন, হেলেনের রূপবর্ণনায় বিশ্বের সব কবিই মূক। হেলেনের রূপ অনুপম, কোনো উপমার সীমায় সীমিত নয়।

একটি মাত্র বিশেষণ হেলেনের বিভূষণ– হেলেন অপরূপা। সে রূপের রঙ নেই, রেখা নেই—সে রূপ অঞ্জনহীন অতুল। চোখ যে লাবণ্যকে দেখে নি, ত্বক যে তনুকে স্পর্শ করে নি, আঘ্রাণ কখনো জানে নি যে সুরভির মদিরতা, কায়াবিহীন ছায়াবিলীন যে মায়া তাই হেলেন। মুখ ঢাকা কালের গুণ্ঠনে।

১৭

কে দেখেছে হেলেনের মুখ? মেনিলাওস তো নিশ্চয়ই। হেলেনের কৌমার্য-কাননের পুষ্পসুবাস সেই তো আঘ্রাণ করেছে, বিচরণ করেছে হেলেনের উদ্ভিন্ন যৌবনের উপবনে। হেলেন তার রানী, শয্যা-সঙ্গিনী, সন্তানের জননী। হেলেনের অঙ্গে অঙ্গে তার অধিকার। হেলেনের রূপ তার নিজস্ব সম্পত্তি।

হেলেনকে অন্তত একবারও দেখেছে গ্রীক বীরবৃন্দ তার স্বয়ংবর সভায়। হেলেনের মুখ তারা ভোলে নি। সেই সভায় তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল হেলেনের মুখ চেয়েই। সেই মুখের স্মরণে ব্যর্থকাম মেনিলাওসের পাশে দাঁড়িয়ে তারা যুদ্ধ করছে দশ বছর।

কিন্তু হোমার তাঁর মহাকাব্যের নায়ক বলে যাকে যা চিহ্নিত করেছেন, ট্রয়যুদ্ধের যে শ্রেষ্ঠ বীর—সে চোখেও দেখে নি হেলেনকে কোনো দিন। তার নাম অ্যাকিলিস।

ইলিয়াডের স্থাপত্য-গ্রন্থনার মূলে অ্যাকিলিস। পাঁচটি স্তম্ভের ওপর এই মহাকাব্যের স্থাপনা—প্রতি স্তম্ভে অ্যাকিলিসের নাম। অ্যাগামেমননের সঙ্গে অ্যাকিলিসের প্রচণ্ড বিবাদ, অ্যাকিলিসের দুর্জয় ক্রোধ ও নিদারুণ অভিমান, প্রিয় বন্ধু প্যাট্রোক্লসের মৃত্যুতে অ্যাকিলিসের জ্বলন্ত শোকযন্ত্রণা, হেকটর বধে অ্যাকিলিসের দানবীয় প্রতিহিংসার পরিতৃপ্তি, প্রায়ামের প্রতি অ্যাকিলিসের শান্ত প্রশান্ত আশ্চর্য ক্ষমা। অ্যাকিলিসের অপর নাম উদ্দামতা—কী রোষে, কী যুদ্ধে, কী বেদনায়, কী মার্জনায়। এই অমিততেজা বীরের যোদ্ধজীবনের কটি সপ্তাহের কাহিনী হোমারের মহাকাব্যে বিধৃত।

দেবতার ঔরষে আর মর্ত্যনারীর গর্ভে যেমন সুন্দরীশ্রেষ্ঠা হেলেনের জন্ম, তেমনি বীরশ্রেষ্ঠ অ্যাকিলিসের জন্ম দেবীর গর্ভে আর মানবের ঔরষে। অ্যাকিলিস থেসালির রাজপুত্র। জলদেবী থিটিসের প্রিয় সন্তান। পুত্র তাঁর দুঃখের ধন। দেবী জানেন তিনি চিরায়ুষ্মতী, কিন্তু পুত্র তা নয়। মৃত পুত্রের মুখ একদিন তাঁকে দেখতেই হবে। জন্মের পরেই মাতা থিটিস তাকে কোলে করে নিয়ে গিয়েছিলেন মৃত্যুপুরীর প্রান্তসীমায়। সেখানে তমসা নদীর ঘোর কৃষ্ণ জলে তাকে ডুবিয়ে এনেছিলেন বাঁ-পায়ের গোড়ালিটা হাতে চেপে ধরে। তার ফলে অ্যাকিলিসের সারা দেহ সর্বাস্ত্রজয়ী—কেবল ঐ গোড়ালিটি ছাড়া।

হেলেনের বিয়ের সময় অ্যাকিলিস কিশোর মাত্র। সে হেলেনের স্বয়ংস্বর সভায় যায় নি। হেলেন-উদ্ধারের প্রতিশ্রুতিতে সে আবদ্ধ নয়। কিন্তু ট্রয় যুদ্ধের যখন প্রস্তুতি—তখন তার বীরখ্যাতিতে সারা দেশ মুখর। অ্যাকিলিস না হলে লড়বে কে, জিতবে কে, হেলেনকে উদ্ধার করবে কে? অ্যাকিলিসকে দলে টানতেই হবে।

উৎকণ্ঠিতা জননী ব্যাপার বুঝেছেন—সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন স্কাইরস দ্বীপে, মেয়ের পোশাক পরিয়ে রাজ-অন্তঃপুরে লুকিয়ে রেখেছেন রাজকন্যার সখী সাজিয়ে। কিন্তু এই ছল সফল হয় নি, আত্মগোপন করে পরিত্রাণ মেলে নি অ্যাকিলিসের। ছাই চাপা আগুনের মতো সহজেই ধরা পড়ে গিয়েছে সে। তাই মস্ত একঝাঁক রণতরী আর একদল মার্মির্ডন সৈন্য নিয়ে সেও এসেছে ট্রয় যুদ্ধে।

না এসে উপায় কী? সারা এখিয়ান জাতির এই বিপুল রণ-মহোৎসবে যোগ না দিয়ে নারীবেশে লুকিয়ে থাকলে কেমন করে সার্থক হবে তার ভাগ্য—যা সে নিজেই বেছে নিয়েছে! শঙ্কাব্যাকুল মাতৃহৃদয়ের কাছে বর প্রার্থনা করে সে বলেছে—নিরুপদ্রব অখ্যাতি-ধূসর সুদীর্ঘ জীবন আমি চাই নে। আমার আয়ু হোক সংক্ষিপ্ত—সংঘাত-প্রদীপ্ত, বীর্যখ্যাতিমুখর—এই আশীর্বাদই আমাকে করো।

ম্লান মুখে সেই আশীর্বাদই করেছেন দেবী থিটিস।

ইলিয়াড এক মহতী ট্র্যাজেডি—অ্যাকিলিস আদি ও অদ্বিতীয় ট্র্যাজিক নায়ক। গ্রীক ট্র্যাজেডির উৎসমুখ ইলিয়াড—ক্ল্যাসিক যুগের অমর নাট্যকারদের রচনা মানবজীবনের সেই ট্র্যাজিক পরিণামেরই স্বীকৃতি। নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণা ভাগ্যের শিয়রে সর্পফণার মতো ঘনিয়ে আসে। অচিন্ত্যপূর্ব অনিবার্য তার ছোবল। যে ঘটনাঘটনের পারম্পর্যে ট্র্যাজেডির ঘনঘটা। তার উপর মানুষের হাত থাকে না। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর তা নির্ভর করে না। কিন্তু অ্যাকিলিসের ট্র্যাজেডি তার ললাটটিকা—যে টিকা সে নিজের হাতেই নিজের কপালে পরেছে।

যুদ্ধ একদিন শেষ হবে, উদ্ধার হবে হেলেন। জয়নিশান উড়বে জাহাজের মাস্তুলে, পাটাতন ভরে যাবে লুণ্ঠিত ধনরত্নে, আবার সমুদ্র পারে ফিরে যাবে নিজের নিজের রাজ্যে—এ স্বপ্ন প্রতি গ্রীক বীরই দেখে—কেবল অ্যাকিলিস ছাড়া।

অ্যাকিলিস জানে তার কোনো আশা নেই, ভরসা নেই, ভবিষ্যতের কোনো স্বপ্ন নেই। বর্তমানের এই যুদ্ধই তার নিত্যজাগর জীবন, অনন্ত নিদ্রার পথে পরিত্রাণ। প্রতিটি দিনান্ত তার আয়ুর সীমানা, প্রতিবারের সূর্যোদয়ে তার নবজন্ম। তার প্রতিটি মুহূর্তের জাগ্রত সত্তা কেবল যুদ্ধ করে নিধন করে জয় করে। রাতের অন্ধকারে সে শুধু যুদ্ধের কথা নিধনের কথা জয়ের কথা ভাবে। যুদ্ধ ছাড়া তার কাজ নেই, যুদ্ধ ছাড়া চিন্তা নেই। তার শ্রান্ত নিদ্রার স্বপ্নে মাতৃমুখ ভেসে ওঠে, মায়ের আশীর্বাদ কানে বাজে। চমকে ঘুম ভেঙে সে চিৎকার করে ওঠে—যুদ্ধ দাও, আরো যুদ্ধ দাও, যুদ্ধের দহনছটায় আমার ক্ষণস্থায়ী জীবনকে উজ্জ্বল করতে দাও।

ন-বছর ধরে যুদ্ধ করেছে অ্যাকিলিস, বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে সে। সমুদ্রতীরবর্তী বারোটি শহর সে খাক করেছে, উপত্যকার বারোটি

রাজ্য সে জয় করেছে। গ্রীক বাহিনী তার জয়জয়কার করে, ট্রোজান প্রজারা তার নাম শুনলে ভয়ে কাঁপে। তার বর্মের মতো দেহত্বকে একটি আঘাতও লাগে নি। যুদ্ধপাগল রক্তমাতাল উদ্দাম যৌবনের কটি মাত্র দিন তার সম্বল। কোথায় সেই অবশ্যম্ভাবী আঘাত? কবে সাগর-বেলায় কাঁটাতরুর তলে রক্ত পুষ্পের মতো ঝরে পড়বে তার রক্তাক্ত দেহ?

দশম বর্ষের সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হতে না হতেই গ্রীক দলে এক অভাবনীয় বিপর্যয়। অ্যাগামেমনন আর অ্যাকিলিসের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া। পাশা-পাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা তো দূরের কথা—মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

ঝগড়া লুটের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে। অ্যাগামেমননের ভাগে এক রূপসী তরুণী—নাম ক্রাইসিইস্। অ্যাকিলিসের ভাগে তেমনি একজন—ব্রাইসিইস তার নাম। ক্রাইসিইসের বাপ অ্যাপোলোদেবের পুরোহিত। তার কাতর নিবেদন—যা ভেট চাও সব দিচ্ছি, আমার মেয়েকে ছেড়ে দাও!

অ্যাগামেমনন দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন পুরোহিতকে। অ্যাপোলো-দেবের অভিশাপ লাগল গ্রীক শিবিরে। দশ দিনের মধ্যে মড়কে উজাড় হয়ে গেল শত শত সৈন্য। রথের ঘোড়া আর পাহারাদার কুকুররাও বাদ রইল না। আর যুদ্ধ করতে হবে না, দেবতার রোষে নিশ্চিহ্ন হবে গ্রীক বাহিনী—সাগরতীরে চিল-শকুনে সৎকার করবে অসংখ্য মৃতদেহ।

গ্রীক গণক ক্যালকাস বললেন—

পুরোহিতকন্যাকে ছেড়ে না দিলে এই শাপ থেকে মুক্তি নেই। সবাই মরবে—একটি জাহাজও দেশে ফিরবে না, একটি মানুষও গ্রীসের মাটি চোখে দেখবে না।

অ্যাগামেমনন প্রধান সেনাপতি। লুটের সিংহভাগে তাঁর অধিকার।

তা ছাড়া নারীর প্রতি তার অসীম লালসা। যখনই সৈন্যেরা শত্রুপক্ষের মেয়েদের ধরে আনে, সবচেয়ে পছন্দসই বন্দিনীটির দিকে তিনি হাত বাড়ান।

ক্যালকাসের নির্দেশ শুনে সবাই চেপে ধরল অ্যাগামেমননকে। কিন্তু তিনি অটল। ক্রাইসিইসকে মুঠোয় পেয়ে তাঁর জিভে জল। নেকড়ে যেন হরিণশিশুকে ধরেছে। মুখের গ্রাস ছেড়ে দিতে তিনি নারাজ। ফল তার যাই হোক।

সবচেয়ে চিৎকার করল অ্যাকিলিস। সেই তো শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। ন-বছর ধরে সেই তো নিরলস লড়েছে—সেই তো জয় করেছে যুদ্ধের ফসল। স্কীয়ান তোরণ খুলে এখনো যে ট্রোজান সেনারা গ্রীকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নি সে তো তারই ভয়ে! সে মরবে সে জানে, তবু যুদ্ধে সে জিতবেই। আর তাতে বাধ সাধছে কিনা একটা স্ত্রীলোকের প্রতি লোলুপতা!

খুব যে বড়ো বড়ো কথা বলছ!

ক্রুর হাসি হেসে বললেন অ্যাগামেমনন—

বেশ, ক্রাইসিইসকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি! কিন্তু তার বদলে তোমার লুটের ভাগ ঐ ব্রাইসিইস মেয়েটা, ওটাকে আমায় দেবে তো?

এক লহমায় আগুন ধরে গেল মাথায়। এক ঝটকায় তলোয়ার খুলে ফেলল অ্যাকিলিস। অন্য সবাই হাঁ-হাঁ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুজনের মাঝখানে।

অ্যাগামেমননও কম নন। তাঁকে তলোয়ার দেখালেই হলো! বুক ফুলিয়ে তিনি হাঁকলেন—

হ্যাঁ, তোমার ঐ ব্রাইসিইসকেই আমি চাই—ভালোয় ভালোয় না পাঠালে জোর করে তুলে আনব। ভুলোনা আমি প্রধান সেনাপতি!

অ্যাকিলিস তলোয়ার নামাল। থমকে দাঁড়াল—স্তব্ধ হয়ে ভাবল। সেনাপতি! কোন্ যুদ্ধের সেনাপতি? ট্রোজানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের। তাতে

অ্যাকিলিসের কী? ট্রোজানরা তার তো কোনো ক্ষতি করে নি! কীসের জন্য যুদ্ধ? হেলেনের জন্যে। তাতেই বা অ্যাকিলিসের কী? সে তো কখনো দেখে নি হেলেনের মুখ, ছায় নি হেলেন-উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি! আর সেনাপতিই বা কেমন? গৃহত্যাগিনী অসতী ভ্রাতৃবধূকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে যাবার আস্ফালন যে করছে, বন্ধুর ঘর থেকে লালসার শিকারকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার ধমক তারই মুখে! ভবিষ্যৎবাণী স্মরণে এলো অ্যাকিলিসের, দীর্ঘ জীবন তার ভাগ্যে নেই। ট্রয়ের যুদ্ধে শৌর্যবীর্যের গৌরব নিয়ে সে মরবে। গৌরব? এই কামুক প্রৌঢ় অ্যাগামেমননের অধীনে হিংস্র শ্বাপদবৃত্তিতে গৌরব কিসের? ক্রন্দনবতী ব্রাইসিইসকে অ্যাকিলিস অ্যাগামেমননের শিবিরে পাঠিয়ে দিল। তারপর খুলে ফেলল বর্ম, ছুঁড়ে ফেলল অস্ত্র। ঘোষণা করল— যুদ্ধ সে আর কববে না—সেও না তাব সঙ্গীসাথীরাও না।

অ্যাকিলিস নেই, শিবিরে হাত গুটিয়ে বসে আছে—তাব মার্মিডন বাহিনীও এক পা বাড়াবে না। তাই বলে গ্রীকরা কি যুদ্ধ করবে না? হেলেনকে উদ্ধার করবে না? অ্যাকিলিস ছাড়া কি বীর নেই, যোদ্ধা নেই? অ্যাপোলোর অভিশাপ তো কেটেছে। সূর্যদেব তো আবার আশার আলো জ্বালিয়েছেন। মনে আর দ্বিধা নয়—সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে—এবার ট্রয়কে জয় করতে হবে এক দিনে।

ট্রোজানরাও প্রস্তুত। তাদের দলেও বীবের অভাব নেই। সেনাপতি রাজপুত্র হেকটর তো একাই একশো। তাছাড়া প্যারিস, ঈনিয়াস, গ্লকাস, সার্পেডন, রিসাস, প্যাণ্ডারাস, মেমনন, বিশিষ্ট নাম। অ্যামাজনরানী পেনথোসিলিয়াও তার নারী বাহিনী নিয়ে প্রয়োজন মতো ট্রোজান পক্ষকে সাহায্য করবে। গ্রীক দল থেকে অ্যাকিলিস বাদ—যাকে নিয়ে প্রধান ভয়, সে ক্ষান্ত দিয়েছে যুদ্ধে। ট্রোজান সেনাপতি হেকটরও

পরামর্শ করলো তার দলের বীরদের সঙ্গে। তারপর স্কীয়ান তোরণ খুলে ট্রোজান সৈন্যরা গ্রীক সৈন্যদের মুখোমুখি হলো। এক দিনে সব গ্রীক সৈন্যকে তারা কচুকাটা করবে।

বিবাদমান দুই পক্ষ একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে যখন উদ্‌গ্রীব—অশ্বের হ্রেষায় অস্ত্রের ঝনঝনাতে আর আহতের আর্তনাদে মুহূর্তে আকাশ মুখরিত হবে, ঠিক সেই সময় এক নাটকীয় প্রস্তাবনা। সামনে এসে দাঁড়াল প্যারিস। হাত উঁচু করে দুই পক্ষকে থামালো। সকলকে সচকিত করে ঘোষণা করলো—

এ যুদ্ধ হেলেনের জন্যে, আমার হেলেনের জন্যে। তাই এ যুদ্ধ আমার, আর কারো নয়। গ্রীক দলের যে কোনো বীরকে আমি যুদ্ধে আহ্বান করছি। আমৃত্যু দ্বন্দ্বযুদ্ধ। আমি যদি মরি, হেলেন ফিরে যাবে। আর আমি যদি জিতি—

ঘোষণা শেষ হলো না। বাঘের মতো এক লাফ দিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়াল মেনিলাওস।

এ যুদ্ধ আমার হেলেনের জন্যে। দ্বন্দ্বযুদ্ধ তোমাতে আমাতে। আমি যদি জিতি, হেলেন ফিরে যাবে আমার সঙ্গে।

১৮

হেলেন আছে রাজপুরীতে। লোহিত বর্ণের বস্ত্রের উপর সে বুনটের কারুকার্য করছে। নানা রঙের সুতোর উপর সুতো বুনে আঁকছে ট্রয় যুদ্ধের নানা চিত্র। প্রশান্ত পরিপূর্ণতায় চিত্রময়ী হয়ে।

সেখানে ছুটে এলো প্যারিসের এক বোন। হেলেনের হাত ধরে টানলো ঘনিষ্ঠ মধুর সম্ভাষণে ডাকলো—

প্রিয় বোন—ওঠো ওঠো, চলো দুর্গতোরণে। দেখবে চলো কেমন যুদ্ধ করবে আমার দাদা প্যারিস।

প্যারিস যুদ্ধ করবে ? কার সঙ্গে ?

মেনিলাওসের সঙ্গে। জানো না, মেনিলাওসকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করেছে আমার দাদা ! কী জন্যে বলো তো ? তোমার জন্যে। যে জিতবে সে তোমাকে পাবে।

তোরণের স্তম্ভশীর্ষে পাত্রমিত্র নিয়ে বসে আছেন রাজা প্রায়াম। তাঁর চোখের সামনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ এখনই শুরু হবে। কী হবে ফলাফল ?

মেনিলাওসের হাতে প্যারিস যদি মরে ? মন তাঁর বিচলিত—মুখে তার প্রকাশ নেই। তাঁর কাছে প্যারিস যেমন, হেলেনও তেমন। প্রিয় পুত্র প্যারিস, হেলেন প্রিয় কন্যা। পিতৃহৃদয়ের স্নেহ সমান ভাগে ভাগ করা। শুধু পুত্রবধূ নয়, বৃদ্ধ পিতার স্নেহময়ী কন্যা নয়, হেলেন ঐশ্বর্যময়ী। ঐশ্বর্য তার অতুল সৌন্দর্য।

নগরবৃদ্ধরা মুখে যা বলেছেন তার প্রতিধ্বনি প্রায়ামেরও মনে। সে ঐশ্বর্যের জন্যে পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না ? যুদ্ধ করবে না ? ঝরাবে না বুকের রক্ত ? তাই তিনি নিজের বুক বেঁধেছেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখবার

জন্যে হেলেনকে ডাক দিয়েছেন তিনিই। এ যুদ্ধ যে তারই জন্যে।

হাত বাড়িয়ে হেলেনকে কাছে ডাকলেন প্রায়াম।

আদরিনী কন্যা আমার! প্যারিসকে যদি হারাই, তোমাকেও হারাবো। এসো মা, আর বেশি সময় নেই—আমার পাশে আমার চোখের সামনে এসে বোসো!

স্কীয়ান তোরণের সামনের মাটি রক্তে এখনো ভেজে নি। সেই মাটিতে প্যারিস ছুঁড়েছে তার চ্যালেঞ্জ—বীরদর্পে তা তুলে নিয়েছে মেনিলাওস। লড়াই স্থগিত থাক—সকলের হাতের অস্ত্র থাক মাটিতে নামানো। ঝগড়া তো শুধু আমাদেরই—এসো শুধু দুজনেই আমরা যুদ্ধ করি। মৃত্যুপণ যুদ্ধ—একজনের জয়ে আর একজনের নিধনে যার শেষ। যে জিতবে যে বাঁচবে হেলেন তার।

মেনিলাওস সিংহের মতো গর্জন করতে লাগলো প্যারিসের সামনে এসে, প্যারিসও পিছিয়ে নেই। সেই করলো প্রথম আক্রমণ। মেনিলাওসের ঢালের ওপর আছড়ে পড়ল তার বর্শা। তবে ঢালকে ভেদ করতে পারলো না, বর্শার ফলাটা কেবল বেঁকে গেল।

মেনিলাওসের বর্শা শুধু প্যারিসের ঢালই ভেদ করলো না। তার উরস্ত্রাণ বিদ্ধ হলো বর্শার ফলায়। আঁচড় লাগল প্যারিসের বুকের পাঁজরে।

এক মুহূর্ত দেরি না করে মেনিলাওস তলোয়ার তুলে এগিয়ে গেল। মাটি থেকে লাফ দিয়ে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে তলোয়ারের কোপ লাগালো প্যারিসের মাথার ওপর। এবারেও কিছু হলো না, শুধু প্যারিসের উষ্ণীষে লেগে দু-টুকরো হলো তলোয়ার।

প্রাণে বাঁচলেও ঐ প্রচণ্ড আঘাতে হতচকিত প্যারিস, বিবশ তার শরীর। নিজের তলোয়ার তুলে প্রতি-আক্রমণের অবস্থা তার নেই। মেনিলাওসেরও বর্শা গেছে, তরোয়াল ভেঙেছে—নিরস্ত্র হাত। লাফ দিয়ে উঠে প্যারিসের শিরস্ত্রাণের পুচ্ছটা চেপে ধরলো সে। সেই পুচ্ছ

ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে তাকে গ্রীক শিবিরের দিকে নিয়ে চললো। হয় তাকে বন্দী করবে, নয় মাটিতে ফেলে তার গলা টিপে মারবে। নিজেরই শিরস্ত্রাণের ছিলা গলায় চেপে রুদ্ধশ্বাস করে তুললো প্যারিসকে।

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে দৈব প্যারিসকে বাঁচালো। উষ্ণীষের ছিলাটা হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়ে মুক্তি পেল প্যারিস। মুহূর্তের জন্যেও আর দাঁড়ালো না। এক লহমায় পেছন ফিরে প্রাণভয়ে দৌড়তে দৌড়তে তোরণের ফাঁক দিয়ে নগরের মধ্যে পালালো। কোনোদিকে তাকালো না, এক দৌড়ে সোজা ঢুকে পড়লো প্রাসাদের মধ্যে--আশ্রয় নিল হেলেনের আঁচলের তলায়।

মুখের গ্রাস হারিয়ে হিংস্র শ্বাপদের মতো মেনিলাওস তখন ফুঁসছে। তার হাতে প্যারিসের পরিত্যক্ত শিরস্ত্রাণ। আর সেনাপতি অ্যাগা-মেমনন সিংহনাদ করছেন—

প্যারিস হেরেছে, প্যারিস পালিয়েছে! আর কী? এবার হেলেনকে বার করে দাও আমাদের হাতে, তাকে বেঁধে নিয়ে আমরা দেশে ফিরি!

কিন্তু দিলেই হলো হেলেনকে? তা হলে প্যারিসের শাস্তি হলো কই? ট্রয় ধ্বংস হলো কই? দেবতাদের ইচ্ছাপূরণ হলো কই? দৈব দেবদেবীর হাতের কলকাটি, দৈবের কাছে তুঙ্গস্পর্শী পুরুষকারের মাথা হেঁট। একদিনে ট্রয়কে চিনে নেব—অ্যাগামেমননের এ আস্ফালন মিথ্যা। এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে ট্রয় যুদ্ধের অবসান হবে, এ আশাও মিথ্যা। অতো সহজে শেষ হবার নয়। অনেক লড়াই হবে—অনেক মৃত্যু, অনেক ধ্বংস—তবেই না দৈবের ফলন হবে, ইচ্ছাপূরণ হবে দেবতাদের?

ভিনাসের হাতে সোনার আপেল তুলে দিয়ে প্যারিস যে অপমান করেছে তা ভুলবার নয়। তাই জুনো আর মিনার্ভা আছেন গ্রীকদলে। লাওমেডন গেলেও ট্রয়ের ওপর রাগ এখনো পড়ে নি—তাই গ্রীকরা

জিতলে নেপচুনও খুশি। ওদিকে তাঁর নিজের হাতে গড়া সাধের প্রাচীর গ্রীকরা ভাঙবে, এতো বড়ো আস্পর্ধা? তাই অ্যাপোলোর টান ট্রোজানদের দিকে। আর ট্রোজানদের বাঁচানো তো ভিনাসের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব। তাঁর বরেই তো প্যারিস হেলেনকে পেয়েছে। মার্স দেবতাও মাঝে মাঝে ট্রোজানদের সাহায্য করেন—কেননা কারণ ভিনাসের প্রতি তাঁর অনুরক্তি। দেবরাজ জুপিটার নিরপেক্ষ হলেই নির্বিরোধী নন। কখনো তিনি এ পক্ষকে শক্তি দেন, কখনো ও পক্ষকে। আর হাতের তুলাদণ্ড বিচার করেন তুপক্ষের অনিবার্য ভবিতব্য। মানুষ ভাগ্যের হাতের পুতুল। সেই পুতুল নিয়ে খেলা করেন দেবদেবীরা। কাউকে কোলে নিয়ে আদর করেন, কাউকে ছুঁড়ে ফেলে দেন মাটির ধূলোয়।

সেদিন আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে প্যারিস পরিত্রাণ পেল কার দয়ায়? ভিনাসের দয়ায়। মায়া কুহেলির জাল বিছিয়ে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে প্যারিসকে কে তুলে নিয়ে গেল হেলেনের আঁচলের ছায়ায়? দেবী ভিনাস। তুপক্ষের বিমূঢ় সৈন্যদলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অ্যাগামেমনন যখন সিংহনাদে হেলেনকে দাবী করছেন, তখন ট্রোজান তীরন্দাজ প্যাণ্ডারাসের কানের কাছে ফিসফিসিয়ে উঠল কার কুমন্ত্রণা? দেবী মিনার্ভার।

হাঁ করে দেখছ কী? ঐ তো সামনে দাঁড়িয়ে মেনিলাওস! এই তো সুযোগ—ধনুকে তীর লাগাও, এফোঁড় ওফোঁড় করে দাও ওর বুক!

এক ট্রোজান সৈন্য সেজে প্যাণ্ডারাসের কানে গুঞ্জন তুললেন মিনার্ভা। প্যাণ্ডারাস দেরি করল না। দ্বিধা করল না নিরস্ত্রতার চুক্তিভঙ্গ করতে। দেবী সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হাত ছুঁইয়ে তীরের গতিটা একটু বাঁকিয়ে দিলেন। তীর মেনিলাওসের গায়ে লাগল, তবে বুকে নয়—রক্ত ঝরাল, তবে মারাত্মক নয়।

দৈবইচ্ছা যাই হোক, মানুষ বিচার করে মানুষের ব্যবহার। প্যারিস আর প্যাণ্ডারাসের ব্যবহারের কোনো ক্ষমা নেই। কাপুরুষ আর

বিশ্বাসহন্তার সঙ্গে কোনো চুক্তি নেই, সন্ধি নেই। নিষ্ঠুর শাস্তিই তাদের পাওনা। অ্যাগামেমনন আবার হুংকার দিলেন—

যুদ্ধ, শুধু যুদ্ধ—আজই আমরা জিতব, ট্রয় ধ্বংস করব!

যুদ্ধ শুরু হলো। দ্বন্দ্বযুদ্ধ আর নয়, মহাযুদ্ধ। ঝড়ের তাণ্ডবে বৃক্ষ শাখা যেমন এদিকে ওদিকে ঝাপটায়, তেমনি ঝাপটানো গ্রীক-ট্রোজানের ভাগ্য প্রথম দিন। সেদিন একবার জিতল ট্রোজানরা আর, একবার গ্রীকরা। দ্বিতীয় দিন ট্রোজানরা গ্রীকদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল তাদের পরিখা আর পাঁচীল পর্যন্ত। ফাটল ধরাল অ্যাগামেমননের দম্ভে।

দিনের শেষে ট্রোজান সৈন্যরা নগরে ফিরে গেল না। সারারাত ধরে রণক্ষেত্রে বসে পাহারা দিল শত্রুর ওপর। তৃতীয় দিনের ভোর হতে না হতেই তুমুল যুদ্ধ, কঠিন আক্রমণ। গ্রীক বীররা একে একে সবাই আহত হোলো—লড়াই করবার শক্তি আর কারুর রইল না। সাধারণ সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ঠকঠকিয়ে কাঁপতে লাগল আর ঝাঁকে ঝাঁকে মরতে লাগল। ধ্বংসের তাপ শিবিরে এসে পৌঁছলো, জাহাজগুলিতে আগুন ধরতে শুধু বাকি।

গ্রীকদের এই প্রচণ্ড পরাজয়ের মূলে রাজকুমার হেকটর—প্যারিসের অনুজ। ট্রয়বাহিনীর সেনাপতি, শ্রেষ্ঠ বীর। সে শুধু যুদ্ধ করে না, স্বপক্ষের সমস্ত বীর আর সৈন্যদের সে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে। কাপুরুষ প্যারিসকেও সে ঘর থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে নিয়ে আসে। গ্রীক পক্ষে অ্যাকিলিস ছাড়া হেকটরকে রুখবার শক্তি কারো নেই, অ্যাকিলিস বিহনে হেকটরের হাতে তাদের পরিত্রাণ নেই।

হেকটরের উল্লেখক্ষণে মহাকাব্যের আর এক বীরের নাম স্মরণযোগ্য। রামায়ণের বীর—রাক্ষসনায়ক ইন্দ্রজিত। ট্রোজান দলে যেমন হেকটর রাক্ষসদলে ইন্দ্রজিৎ তেমনি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়েই অপ্রতি-রোধ্য। কাল সমরে অবশ্য দুজনের কেউ রক্ষা পায় নি শেষ পর্যন্ত।

কেউই রাজ্যরক্ষা করতে পারে নি। হেকটরের মৃত্যু যেমন ট্রয় রাজ্যের সর্বনাশের ঘণ্টা বাজিয়েছে তেমনি ইন্দ্রজিতের পতন ঘোষণা করেছে যে লঙ্কার পতনেরও আর দেরি নেই।

তুজনের মধ্যে অমিলেরও অভাব নেই। রাক্ষসবীর ইন্দ্রজিৎ দেবতাকে ডরায় না, ভাগ্যকে ভয় পায় না, নিজের ভাগ্যকে নিজের হাতের মুঠোয় পুরে রাখে। ক্ষাত্র-আক্রমণে রাক্ষসসৈন্য যখন বিপর্যস্ত, একের পর এক রাক্ষসবীর নিহত, তখন মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ তার পিতাকে প্রবোধ দিয়ে সিংহনাদে ঘোষণা করছে—আমার পুরুষাকারের বলে আর দৈবকে করতলগত করে প্রতিজ্ঞা করছি যে আজই আমি রামলক্ষ্মণকে বিনাশ করব। ইন্দ্রকে যে জয় করেছে, দৈব তাকে সংহার করতে পারে এ ভয় ইন্দ্রজিতের মনে কখনো জাগে নি। নিকুম্ভিলার যুদ্ধক্ষণে নানা তুর্লক্ষণের প্রকাশ হয়েছিল। তা বিভীষণের চোখে পড়লেও ইন্দ্রজিৎ দেখে নি। অতি দর্পে হত লঙ্কা—সে দর্পের প্রকাশ ইন্দ্রজিতের ব্যবহারেও কম নয়।

হেকটর মহাবীর হলেও মানুষ—তার চরিত্রে মানবিক দৌর্বল্য। সে জানে তার আসল যুদ্ধ ভাগ্যের সঙ্গে। শত পুরুষকার দিয়েও ভাগ্যকে রোধ করা যায় না। ভাগ্য দেবতার মুচকি হাসি—যে দেবতা পরম শক্তি-মান। ভাগ্যকে সে স্বীকার করে নিয়েছে, অপেক্ষা করে আছে ভাগ্যের সেই অমোঘ দানের জন্যে—যে দান মৃত্যুর হাতে চরম পরাজয়। যতোদিন জীবন ততোদিন এই পরাজয়ের সঙ্গে কোনো সন্ধি নেই! ততোদিন যুদ্ধ—দম্ভঘোষণা নয়, কর্তব্যপালন। হেকটর জানে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—তবু আমৃত্যু যুদ্ধ করতে হবে, কর্তব্য পালন করতে হবে।

ইন্দ্রজিৎ তার পিতারই মতো বহুপত্নীক। কল্পনা করতে পারি একাধিক সন্তানের পিতাও সে। কিন্তু তার হৃদয়ে স্নেহপ্রেমের বাষ্পটুকু নেই। রণক্ষেত্রে সে যখন সংহার-মাতাল তখন তার শুভাশুভের চিন্তায় কোনো পুরনারীর পাংশু মুখের চিত্র রামায়ণের মহাকবি আঁকেন নি—শোনান

নি তার মুণ্ডহীন মৃতদেহকে ঘিরে কোনো শোকাকুলার ক্রন্দন।
এমন বীর হেকটর নয়। তার মন আছে, মায়া আছে, স্নেহ-ভালবাসা আছে। তার প্রাসাদে আছে সুমুখী স্ত্রী আর সুন্দর একটি শিশুপুত্র যাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তার কঠিন উরস্ত্রাণ ঢাকা কবাটবক্ষ সর্বদা ভারাক্রান্ত।
স্বামীর জন্যেও পতিব্রতা পত্নীর ভয়ার্ত ব্যাকুলতা তেমনি। হেকটর যখন যুদ্ধে যায়, অ্যানড্রোম্যাকি সন্তানকে বুকে নিয়ে অনুনয় করে—
যেয়োনা হেকটর, তুমি ফিরে এসো। পিতৃহারা হবে তোমার একমাত্র পুত্র, স্বামী-হারা হবে তোমার স্ত্রী—তুমি কি তাদের কথা ভাবো না? তোমাদের এই যুদ্ধে আমার বাপ মরেছে, আমার সাত ভাই মরেছে, তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার, তা কি তুমি জানো না?
হেকটরের মুখে হোমার দিয়েছেন অবিস্মরণীয় উত্তর—
যুদ্ধে যাব না? আমি যদি কাপুরুষের মতো লুকিয়ে থাকি তাহলে ট্রয়ের কোনো নারী কোনো পুরুষের কাছে মুখ দেখাতে পারব? আমি জানি এই যুদ্ধের পরিণাম—সেদিনের আর দেরি নেই যেদিন ট্রয় ধ্বংস হবে, পিতা প্রায়াম সমেত আমাদের পরিবারের একজন পুরুষও জীবিত থাকবে না। অজানা কোনো এখিয়ান যোদ্ধা তোমাকে বন্দিনী দাসী করে টেনে নিয়ে যাবে তার দেশে। ভগবান করুন তোমার সেই অপমান দেখতে তোমার সেই কান্না শুনতে আমি যেন না থাকি। তবু যতোদিন আছি যুদ্ধ আমাকে করতেই হবে।
এই মরজীবনই সত্য—এই সকাল থেকে সন্ধ্যা। তারপর তমসার অন্ধকারে পরিচয়হীন আত্মবিলুপ্তি। পার্থিব জীবন একান্ত নশ্বর—তবু অমরত্ব যদি কোথাও থাকে তাও এইখানে। পরপ্রজন্মের স্মৃতির মুকুরে। খ্যাতিই মানুষকে অমর করে, পরবর্তী যুগ-পাতে সম্মানের সিংহাসন। রাজসিংহাসন না পেলেও সেই সিংহাসনের প্রার্থী হেকটর।
অ্যানড্রোম্যাকিকে তাই সে বলে—

আমার দেহ যখন ডুববে মাটির গভীরে, তখন তোমার নিরাভরণ বর্ণ-রিক্ত বেশের দিকে তাকিয়ে কী বলবে লোকে ? কী পরিচয় দেবে তোমার ? তুমি কার বিধবা ? মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের না যুদ্ধভীরু শশকচিত্ত কাপুরুষের ?

কেন এই মৃত্যুপণ যুদ্ধ ? কেন প্রিয় পত্নীর দুরুদুরু প্রাণের কাতর আহ্বানকে উপেক্ষা করে হেকটর রণক্ষেত্রে যায় ? অবশ্যম্ভাবী ভাগ্যের সঙ্গে কেন সে সন্ধি করতে পারে না ?

হেলেনের জন্যে । চোখ তুলে হেকটর দেখেছে হেলেনের মুখ ।

জানি নে বন্দিনী সীতাকে ইন্দ্রজিৎ কখনো দেখেছিল কিনা । রামায়ণে কোনো উল্লেখ নেই । বাল্মীকির মহাকাব্যে ইন্দ্রজিতের উপস্থিতি বিভীষণ কুম্ভকর্ণ প্রহস্ত মহাপার্শ্ব প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের সঙ্গে রাবণের রাজসভায় । রাম-সৈন্যবাহিনীর পদদাপেব শব্দ তখন সমুদ্রপার থেকে লঙ্কায় ভেসে আসছে ।

এই সভায় সীতা প্রসঙ্গে ইন্দ্রজিতের একটি কথা নেই । শুধু কাপুরুষ বলে বিভীষণকে কঠোর ভর্ৎসনা আর রামলক্ষ্মণকে শমনদ্বারে পাঠাবার সদম্ভ প্রতিশ্রুতি । রাবণ বিধান দিয়েছেন—পরস্ত্রীহরণ ও পরস্ত্রী-ধর্ষণ রাক্ষসের স্বধর্ম । ইন্দ্রজিৎ নির্দ্বিধায় এই রাক্ষসধর্মে বিশ্বাসী । স্বধর্ম-পরায়ণ ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসরাজ্যে অনেক দুষ্কৃতি দেখেছে। সীতা তার কাছে নতুন নয়, সীতাকে নতুন করে দেখার কিছু নেই ।

কী চোখে হেকটর দেখেছে হেলেনকে ? যে চোখে সে রাজপ্রাসাদের অমিত ঐশ্বর্য দেখে, প্রিয়তমা পত্নী আর একমাত্র পুত্রকে দেখে, শত্রু-সৈন্যকণ্টকিত স্বরাজ্যবেলাকে দেখে—সেই একই চোখে । সেই চোখ দেশ ভক্তের, বীরের চোখ, প্রেমিকের চোখ ।

হোমারের যুগের বহু শতাব্দী পরে দূর প্রতীচ্যের আর এক মহাকবি শেকসপিয়ার । শেকসপিয়রের ভাষায় হেকটর বলেছে—

গ্রীসের রাণী হেলেন,
যার যৌবন আর লাবণ্যের তুলনায়
অ্যাপোলার মুখে বলিরেখা,
প্রভাতের আভা পিঙ্গল।
তাকে আমরা রাখব না?
জানো সে রত্নের দাম?
তার জন্যে সহস্র রণতরী সমুদ্রে ভেসেছে,
মুকুটধারী রাজারা হয়েছে বণিক!

শ্রেষ্ঠ রত্ন হেলেন। তার তুলনায় রাজ-ঐশ্বর্য রাজসিংহাসন কিছুই না। তার জন্যে যুদ্ধ করতেই হবে, প্রাণ দিতেই হবে।
হেকটর প্রেমিক। প্রেমময় হয়েই প্রেমের মূল্য সে জানে। যে প্রেমের জন্যে হেলেন সব কিছু দিয়েছে, তার জন্যে বীর্যের আগুনে প্রাণকে আহুতি দেবে না হেকটর?

হেলেন,
তুমি শত্রুঘ্ন সাহসের প্রণোদনা,
মহৎ বীর্যের উন্মাদনা,
সম্মান-গৌরবের উদ্দীপনা–
আর অন্তকালে অমরত্বের সম্ভাবনা।

১৯

অ্যাকিলিসও বিশ্বাস করে এই মরজীবনেই অমরত্বের প্রসাদ। নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মতো জীবন তার কাম্য নয়—হাউই-এর মতো আকাশস্পর্শী প্রজ্জ্বলন্ত আভায় দিক্‌দিগন্তকে ধাঁধিয়ে দেবার মতো ক্ষণস্থায়ী অথচ অবিস্মরণীয় জীবন সে চায়।

অমরত্বের সুযোগ হেকটরই অ্যাকিলিসকে দিল। ভাগ্য তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে রণক্ষেত্রে। সেই রণক্ষেত্রে হেকটরই তাকে ফিরিয়ে আনল। সেখানে গ্রীকরা বুঝি যায় যায়! অমিতবলী ট্রোজান বীরের হাতে আর বুঝি রক্ষা নেই! হেকটরের তেজের আগুন পরিখা পার হয়ে তাদের শিবিরে এসে পৌঁছেছে, এবার জাহাজগুলি শুধু জ্বলতে বাকি। গ্রীক যোদ্ধারা রাত্রির অন্ধকারে অ্যাকিলিসের শিবির দ্বারে গিয়ে জোড়হাতে অনুনয় করছে—

যা চাও তাই দেব, শুধু তোমার অভিমান পরিহার করো। যুদ্ধে যোগ দাও, হেকটরের হাত থেকে আমাদের বাঁচাও!

তবু অ্যাকিলিসের রাগ পড়ল না। নিরুত্তাপ সে হাত গুটিয়ে বসে রইল তার নিরপেক্ষ শিবিরে।

অ্যাকিলিসের প্রিয় বন্ধু প্যাট্রোক্লস। সে সইতে পারল না।

তুমি না যাও, আমি যাব। আমাকে যেতে দাও যুদ্ধে। আমাকে লড়তে দাও শত্রুর বিরুদ্ধে।

রুদ্ধ কণ্ঠে অ্যাকিলিস বললে—

বেশ, তোমাকে বাধা দেবার কী অধিকার আমার! যাও তুমি! আমার গায়ের বর্ম পরে তুমি যাও! মার্মিডন সৈন্যদেরও তুমি নিয়ে যাও

আমার হয়ে তুমিই তাদের নেতৃত্ব করো। তবে আমাকে যেতে বলো না!

গেল সে শেষ পর্যন্ত। তার অভিমান পরিবর্তিত হলো প্রচণ্ড প্রতিহিংসায় যেদিন প্রিয়তম বন্ধু প্যাট্রোক্লস নিহত হলো হেকটরের হাতে। যেদিন প্যাট্রোক্লসের মৃতদেহ থেকে অ্যাকিলিসের বর্ম ছিনিয়ে নিজের অঙ্গে পরে নিল জয়গর্বী হেকটর। অ্যাকিলিস ছুটে গেল যুদ্ধক্ষেত্রে নতুন বর্ম পরে প্রচণ্ড মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। প্যাট্রোক্লসের শোক তার হৃদয়কে পাথর করেছে, সেই পাথরের গভীরে অগ্নিময় ক্রোধ আর প্রতিশোধস্পৃহা ফুটছে আগ্নেয়গিরির লাভার মতো।

উপকূল থেকে স্ক্যামাণ্ডারের উপত্যকা পর্যন্ত উন্মাদের মতো ছুটে বেড়াল অ্যাকিলিস। তার বজ্রতীক্ষ্ণ বর্শা আর বিদ্যুৎজিহ্ব তরবারি পর্যুদস্ত করল সমস্ত শত্রু সৈন্যকে। ট্রোজান পক্ষের বহু বীর অ্যাকিলিসের হাতে নিহত হলো। তারপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্রয়তোরণের ওপর।

অ্যাকিলিসের ভয়ে ট্রোজান সৈন্যরা দলে দলে তোরণের মধ্যে ছুটে পালাচ্ছে। পিছনে অ্যাকিলিস আর তার মার্মিডন বাহিনী। সেই বাহিনী নিয়ে একবার যদি সে নগরের মধ্যে ঢুকে পড়ে তা হলে আর রক্ষা নেই।

তোরণের বাইরে তখন একলা দাঁড়িয়ে হেকটর—যে প্যাট্রোক্লসের হন্তারক, যাকে অ্যাকিলিস সারা দিন কালান্তক যমের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে। স্তম্ভশীর্ষ থেকে এ দৃশ্য দেখলেন রাজা প্রায়াম। রানী হেকিউবাও তখন তাঁর পাশে।

প্রায়াম চিৎকার করে ডাকলেন—

দাঁড়িয়ো না হেকটর, দাঁড়িয়ো না। আমার কতো পুত্রকে খেয়েছে ঐ যম—ওর সঙ্গে একলা তুমি যুদ্ধ করো না। প্রাচীরের মধ্যে তুমি চলে এসো।

হেকিউবাও আর্তস্বরে পুত্রকে ডাকতে লাগলেন, কিন্তু হেকটর পেছন

ফিরল না। চুম্বক যেমন লোহাকে টানে তেমনি তেমন তার দৃষ্টিকে টেনে রাখল অ্যাকিলিসের আসন্ন মূর্তি। ঐ মূর্তি তাকে দেবে ভাগ্যের পরম প্রসাদ—মহান মরণ, মহত্তী গরিমা।

হেকটরের পতন হলো। অ্যাকিলিসের বর্শা নির্ভুল আঘাতে হেকটরের কণ্ঠভেদ করল। প্রতিহিংসা তাতেই চরিতার্থ হলো না, শান্ত হলো না শোক। হেকটরের দেহ থেকে সমস্ত বস্ত্র-বর্ম খুলে নিল অ্যাকিলিস। তারপর করল এক ভয়ংকর কাজ। তলোয়ারের ফলা দিয়ে সে মৃত-দেহের পায়ের পিছন দিকটা গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত চিরে ফেলল। ক্ষতের মধ্যে দিয়ে ঢোকাল চামড়ার শক্ত রশি। রশির একটা মুখ বাঁধল রথের পেছনে। তারপর রথে চড়ে ভূলুণ্ঠিত নগ্ন দেহটা টানতে টানতে নিয়ে চলল শিবিরে।

তোরণস্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখলেন রাজা প্রায়াম আর রানী হেকিউবা। প্রাচীরশীর্ষের শোকার্তনাদ অন্তপুরচারিণী অ্যানড্রো-ম্যাকির কানে পেঁছিল। পাগলের মতো ছুটে গেল সে। হেকটরের রক্ত-কর্দমমাখা দেহটা যখন গ্রীক পরিখার পারে অদৃশ্য হচ্ছে তখন এক ঝলক চোখে পড়ল তার। সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছিত হয়ে পড়ল দুর্ভাগিনী। সমস্ত ট্রোজান সৈন্য তখন প্রাচীরের পিছনে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে!

মৃতপুত্র হেকটরের দেহ বুকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরলেন প্রায়াম। এর মধ্যে বারো দিন কেটেছে—প্রতিদিন মৃতদেহকে রথের পেছনে বেঁধে বালুকা-বেলায় টেনে নিয়ে বেড়িয়েছে অ্যাকিলিস—বন্ধু প্যাট্রোক্লসের মৃত্যু-শোককে লাঘব করতে। ট্রোজান পক্ষ টুঁ শব্দ করতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ প্রায়াম একলা গিয়েছেন অ্যাকিলিসের শিবিরে। পুত্রহন্তার পা জড়িয়ে ধরে অনুনয় করেছেন—

আমার পুত্রের দেহটা আমাকে দাও, সুযোগ দাও সৎকারের। তারপর

আবার আমরা যুদ্ধ করব।

অ্যাকিলিস দয়া করেছে। দেহটা শুধু ফিরিয়েই দেয় নি, দিয়েছে শোক পালনের সুযোগ।

ন-দিন ধরে শোক পালন, দশম দিনে সৎকার, একাদশ দিনে সমাধি স্থাপন।

দ্বাদশ দিনে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হবে।

হেকটরের অন্ত্যেষ্টি বর্ণনায় ইলিয়াড কাব্যের শেষ। এই লক্ষণ অনুসারে হেকটরই এই বিয়োগান্ত মহাকাব্যের নায়ক। ইলিয়াডকে যদি আমরা চলচ্চিত্র রূপে কল্পনা করি, তা হলে হেকটরের চিতাগ্নি-আলোয় রঞ্জিত ট্রয়ের আকাশই শেষ স্থিরচিত্র, হেকটর বিহনে ট্রয়ের পুরনারীদের শোকবিলাপই সমাপ্তিসূচক আবহ-সংগীত। ট্রয় ধ্বংসের বৃহত্তর বহ্নি-আভা আর নিবস্ত্র ট্রয়বাসীর নিরুপায় মৃত্যুর যন্ত্রণাতীব্র চিৎকার তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

হেকটরেব মৃতদেহ শকটে তুলে নিয়ে অ্যাকিলিসের শিবির থেকে একলা প্রায়াম ফিরে আসছেন—প্রাচীর শীর্ষ থেকে এ দৃশ্য প্রথম চোখে পড়ল হেকটরের ভগ্নী ক্যাসানড্রার। তীক্ষ্ণ আর্তনাদের স্বরে সে ডাক দিল ট্রয়ের নরনারীদের—

প্রতিদিন যুদ্ধশেষে বীর হেকটর যখন নগরে ফিরে আসত তখন তোমরা সবাই তার জয়ধ্বনি করতে! এবার ছুটে এসো, দেখে যাও সেই হেকটর কী ভাবে ফিরে আসছে!

তখন ট্রয়ের আবালবৃদ্ধবনিতা ঘর থেকে পথে ছুটে এলো, কাতারে কাতারে ঘিরে ধরল হেকটরের মৃতদেহ—দুরন্ত ব্যথায় জনকোলাহল তুষ্ণীভূত হয়ে গেল।

প্রজাপুঞ্জের সেই ভিড় এড়িয়ে হেকটরের দেহ প্রাসাদে আনা হলো, রাখা হলো নির্মল শয্যায়—গায়ক ও বাদকদের নির্দেশ দেওয়া হলো শোকসংগীত শুরু করতে। প্রাসাদের পুরনারীরা প্রিয়তম মানুষটির

দেহাবশেষকে ঘিরে শোকবিলাপে রত হলেন। প্রধানা জননী হেকিউবা আর পত্নী অ্যানড্রোম্যাকি।

এমন ভাগ্য ইন্দ্রজিতের হয় নি। লঙ্কার কোনো নারী বিলাপ করে নি তার মৃত্যুর জন্যে। শুধু প্রিয়তম পুত্র কেন—মহারণে প্রাণ দিয়েছে রাবণের আরো কতো পুত্র পরমাত্মীয়। সবশেষে রাবণ। এক রাবণ ছাড়া আর কোনো রাক্ষসবীরের জন্যে কোনো নারী শোকাশ্রু ফেলেছে এ কথা বাল্মীকি অপ্রয়োজনীয় অত্যুক্তি বলে পরিহার করেছেন। বাল্মীকির বর্ণনায় ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে শোক করেছে একমাত্র তার পিতা—যে শোক একবিন্দু স্নিগ্ধ অশ্রুকে ক্ষরিত করে নি, বরং বীভৎস জিঘাংসা আর বর্বর ধর্মকামে রূপান্তরিত হয়েছে।

বাল্মীকির একদেশদর্শিতার তুলনায় হোমারের উদার মানবতাবোধ ও নির্লিপ্ত মহানুভবতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন মধুসূদন। ইলিয়াড কাব্য অনুসরণ করে তিনি হেকটরবধ গদ্য কাব্য রচনা করেছিলেন। আর রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের এক উজ্জ্বল অংশকে ভিত্তি করে অমিত্রাক্ষর ছন্দে সৃষ্টি করেছিলেন মেঘনাদবধ কাব্য। ট্রয়ের নায়ক প্যারিস নয়—হেকটর। তেমনি মাইকেলের মহাকাব্যে লঙ্কার নায়ক রাবণ নয়—মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ।

মেঘনাদবধের প্রমীলা চরিত্র মধুসূদনের নিজস্ব সৃষ্টি, হেকটর-পত্নী অ্যানড্রোম্যাকির স্মরণে মধুসূদন এই চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। অ্যানড্রো-ম্যাকির মতো পতিব্রতা হয়েও প্রমীলার চরিত্র অ্যানড্রোম্যাকির চেয়ে অনেক বিচিত্র। স্বামী-আলিঙ্গনে প্রমীলার দেহে মনে শৈল তটিনীর মতো উচ্ছলতা, স্বামী-বিরহে সে ঋতুমতী অরণ্যবাসিনীর মতো উন্মাদিনী, স্বামীসঙ্গের উদ্দাম আকুলতায় সে রণক্ষেত্রে নির্ভীক সঞ্চারিনী। স্বামীবিহনে সে চিতার আগুনে স্বামীর সহমৃতা।

অ্যানড্রোম্যাকির ভাগ্য অন্য। সে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যায় নি। তার বিলাপে ট্রয়ের শতশত অবলা বিধবার আর্ত হাহাকারের প্রতিধ্বনি।

পুত্রহারা হেকিউবার বেদন-রোদন ট্রয়ের সমস্ত পুত্রহীনা জননীর শোক-উচ্ছ্বাস।

অবশেষে আর এক নারী এসে দাঁড়াল হেকটরের মৃতদেহের পাশে। হেলেন। প্রিয়বন্ধুহারা বিষণ্ণা দুর্ভাগিনী। হেলেনের বিলাপ ক্রন্দন নয়, আর্তনাদ নয়। পাথরচাপা হৃদয়গহ্বর থেকে উৎসারিত যন্ত্রণার হিমবাষ্প। এই বিলাপের মধ্যে দিয়ে ট্রয়-প্রবাসিনী ঐ বিদেশিনীর জীবনযাত্রার এক বিষকালিম চিত্র উদ্ঘাটিত হলো।

যেদিন থেকে অ্যাকিলিস যুদ্ধে নেমেছে সেদিন থেকে ট্রয়ের আকাশে ঘনিয়েছে বিপর্যয়ের কালো মেঘ। দিনের পর দিন ট্রোজানরা শুধু হেরেছে আর মরেছে। স্ক্যামাণ্ডারের জল রক্তপাগল হয়ে ফুঁসে ফুঁসে উঠেছে আর ঘরে ঘরে উঠেছে শোকের আর্তনাদ।

কার জন্যে ?

হেলেনের জন্যে।

হেলেন আর মূর্তিমতী সৌন্দর্যবিভা নয়—নয় প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী। হেলেন নয় বিজয়ের উন্মাদনা, গৌরবের উদ্দীপনা। হেলেন মানে মৃত্যু, হেলেন মানে শোক, হেলেনের অপর নাম সর্বনাশ।

সেই শুভদিনটি তো স্বপ্নের মতো—যেদিন প্রথম পা দিয়েছিল ট্রয়ের মাটিতে। সেদিন প্রায়ামের আশীর্বাদ, হেকিউবার বধূবরণ। নবলব্ধ ভ্রাতাভগ্নীদের প্রীতি-উচ্ছ্বাস, সারা নগর জুড়ে আনন্দ-উৎসব।

তারপর অভিযান, অপরাধ আর যুদ্ধ। ট্রয়ের নগরবৃদ্ধরা মাথা নেড়ে বলছেন—হেলেনকে ফিরিয়ে দিলেই আমরা বাঁচতাম! ক্লান্ত সৈন্যরা বলছে—কতো যুদ্ধ আর আমরা করব ? জননীরা কপাল চাপড়ে কাঁদছে—সন্তানদের মৃত্যুশোক কতো আর আমরা সইব ?

বাঁচবার পথ নেই, শোকের শান্তি নেই, যুদ্ধের শেষ নেই। ঘনিয়ে আসছে সর্বনাশের গোধূলি। সেই বিষণ্ণ সায়াহ্নের বুকে সর্বনাশের চরম

ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে হেকটরের মৃত্যু।

আর আশা নয়, আনন্দ নয়, অভিনন্দন নয়, ভালবাসা নয়। ট্রয়ের প্রতিটি মানুষের বুকে হতাশা। শুধু আতঙ্ক, শুধু অনুশোচনা, আর শুধু ঘৃণা।

কার জন্যে ?

হেলেনের জন্যে।

হেলেন জানে। আরো জানে এই সুদীর্ঘ পরবাসে হেকটরের মতো স্নেহ-সম্মান কেউ তাকে দেয় নি। এই তো কদিন আগেকার কথা। অস্ত্রে বর্মে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধে যাবার অভিমুখে হেকটর এসেছিল তার মহলে। হেকটরের হাত ধরে সে তার মনের কথা অকপটে বলেছিল। হেকটর বলেই তাকে বলতে পেরেছিল—

ভাই, আমার মতো নিলাজ হতভাগী মেয়ে আব দ্বিতীয় আছে ? আমি যেদিন জন্মালাম সেদিন আমাকে ঝড়ে টেনে নিয়ে সমুদ্রে ডোবায় নি কেন অদৃষ্ট ? তা হলে তো আর সমুদ্র পার হয়ে তোমাদের দেশে এসে দুই দেশের মধ্যে এমনি বিপদ-যন্ত্রণার কারণ আমাকে হতে হতো না !

হেকটর তার কথার কোনো উত্তর দেয় নি। প্রবোধভবা স্নিগ্ধ হাসি হেসে বিদায় নিয়ে গিয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে।

সেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শেষবাবের মতো ফিরে এসেছে হেকটর। হেকটর নয়, হেকটরের মৃতদেহ। আর সে হেলেনের জন্যে যুদ্ধ করবে না।

হেকটরের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে অস্ফুট বিলাপে হেলেন বলছে—ট্রয়ে এসে নতুন ভাই আমি যতো পেয়েছি হেকটর, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালবেসেছি তোমাকে। বাজপুত্র প্যারিস আমাকে এখানে এনেছে, বিয়ে করেছে। কিন্তু তার আগে আমার মৃত্যু হলো না কেন ? তা হলে তো তোমার মৃত্যুর কারণ আমি হতাম না ! আমার নিজের দেশ আমি উনিশ বছর আগে ছেড়ে এসেছি—এতো বছরের মধ্যে

তোমার মুখ থেকে একটি কঠোর বাক্য একটি অবজ্ঞার কথা একদিনও শুনি নি। পিতৃসম রাজা প্রায়াম ছাড়া এ সংসারে কে আমাকে তুচ্ছ করে নি হেয় করে নি বলো ? তোমার বোনরা তোমার ভাইদের গরবিনী স্ত্রীরা —এমনকি তোমার মাও ! কিন্তু তোমার কানে যখনই এসেছে, তোমার স্বভাবসুলভ ভদ্রগম্ভীর ভাষায় সে সব রূঢ় কথার প্রতিবাদ করে তখনই তুমি আমার দুঃখ ঘুচিয়েছ ! তাই আমার শোকাশ্রু শুধু তোমার জন্যে নয়—হতভাগিনী আমারও জন্যে। হেকটর তুমি চলে গেলে, সারা ট্রয়ে আমার বন্ধু বলতে আর কেউ রইল না। আমার ছায়া দেখলে সবাই ঘৃণায় শিউরে ওঠে !

২০

প্রথম থেকে হেলেন যার দুচোখের বিষ, সে ক্যাসানড্রা। প্যারিসের ছোট বোন। প্রায়ামের তেরোটি কন্যার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী।

প্রথম যেদিন সে হেলেনকে দেখেছে সেদিন থেকেই তার জ্বালার শেষ নেই। ট্রয়ের মাটিতে হেলেন যেদিন পা রেখেছে সেদিন থেকেই সে সমানে গজরাচ্ছে—ঐ মনভোলানী সর্বনাশীকে তাড়াও!

হেলেনের রূপে সবাই যখন মোহিত তখন ক্যাসানড্রা চেঁচাচ্ছে—

ও রূপ তো আগুনের কুণ্ড! ঐ কুণ্ডে প্যারিস ঝাঁপ দিয়েছে! একজনই শুধু যে জ্বলবে পুড়বে তা নয়, ঐ আগুন সারা দেশে ছড়াবে, দাউদাউ করে সব জ্বালাবে। তার আগে ঐ আগুনকে সমুদ্রের জলে ডোবাও!

কেউ তার কথা শোনেনি সেদিন। কেউ কান দেয় নি তার ভবিষ্যৎ-বাণীতে। দেবে কেমন করে? যতো দামী কথাই বলুক ক্যাসানড্রা—তার কথা কেউ শুনবে না, এই তার ভাগ্যলিপি।

রাজকুমারী ক্যাসানড্রা অ্যাপোলোর মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। অনুপম শিলামূর্তি দেবতার। বিনত হয়ে সেই মূর্তির পায়ে নিবেদন করেছিল বিনম্র অর্ঘ্য।

ক্যাসানাড্রার নবোদ্ভিন্ন যৌবন দেখে প্রীত হয়ে অ্যাপোলোদেব স্বরূপে দেখা দিলেন।

তোমার ভক্তিতে আমি খুব খুশি হয়েছি। কী বর তুমি চাও?

দেবতা নিজে এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে। ক্যাসানড্রা তো হাতে স্বর্গ পেয়েছে। বললে—

প্রভু, এই বর দিন আমি যেন ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি। আমি যা

বলি তাই যেন সত্য হয়।
মুচকি হেসে অ্যাপোলো বললেন—
দেব ! কিন্তু তার আগে তুমি একটি সত্য করো। এই বর পেলে তুমি একটিবার আমার আলিঙ্গনে ধরা দেবে ?
দেব না ? নিশ্চয় দেব প্রভু !
সত্য করল সে। বর পেল। তারপর অ্যাপোলো যখন তার দিকে হাত বাড়ালেন তখন সে শিউরে উঠল, চিৎকার করে পিছিয়ে গেল।
না না। কিছুতে না।
দেবতা বোধহয় পরীক্ষা করছিলেন। আবার তিনি মুচকি হাসলেন। যে ক্ষমতা শুধু দেবতার অধিকারে তা এই লুব্ধা মানবী পেতে চায়— বিনা আয়াসে, বিনা সাধনায়, বিনা প্রতিদানে।
জোর করে তিনি চেপে ধরলেন কুমারীকে।
অন্তত একটি চুমু আমাকে দিতেই হবে।
চুমু নয়, ক্যাসানড্রার মুখে থুথু দিলেন অ্যাপোলো। বললেন—
সত্য ভঙ্গ করে সত্যবাদিনী হবে ? মিথ্যা দিয়ে সত্যকে জয় করবে ? এতো সোজা ? যে বব ে্যামাকে দিয়েছি তা আর ফিরিয়ে নেব না। এই সঙ্গে আরো কিছু বর তোমাকে দেব। তুমি সত্য বলবে, কিন্তু তোমার মুখের সত্য কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।
সেই বরের অনুগ্রহে ক্যাসানড্রা পাগলিনীপ্রায়। ভবিষ্যৎ তার চোখে ভাসে, কিন্তু তার ভবিষ্যৎবাণী কেউ বিশ্বাস করে না। বলে—মূর্খের ভাষণ, পাগলের প্রলাপ। সেই প্রলাপ শুনে শুনে সকলের কান ঝালাপালা, সকলের মন তিক্তবিরক্ত। তার কাছে ঘেঁষতে চায় না কেউ— কাছে এলে মুখ ফিরিয়ে নেয়, ত্রস্ত পায়ে দূরে সরে যায়। আলাদা একটা বাড়িতে সে নির্জনবাস করে, ভয়ংকর ভবিষ্যৎবাণীর নিষ্ফল চিৎকার করতে করতে মাঝে মাঝে লোকসমক্ষে ছুটে আসে।
হেলেনকে সঙ্গে নিয়ে প্যারিস যেদিন ট্রয়ের তীরে তরী ভিড়িয়েছিল

সেদিন অমনি ছুটে বেরিয়েছিল ক্যাসানড্রা। সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে ছটফট করেছিল, হেলেনের দিকে আঙুল উঁচিয়ে চিৎকার করেছিল—
ও সর্বনাশিনী, ওর জন্যে ট্রয় ছারখার হয়ে যাবে। ওকে ফিরিয়ে দাও, দূর করে দাও!
তার সাবধানবাণীতে কেউ কান পাতে নি সেদিন। সেই চিৎকার সে সমানে করে চলেছে। সেই চিৎকারে আর্তনাদ এসে মিশছে, পাগলের প্রলাপ অর্থবহ হচ্ছে দিনে দিনে।

আর হেকিউবা? কতো আদর করে তিনি প্রিয় পুত্র প্যারিসের বধূরূপে হেলেনকে ঘরে তুলেছিলেন, কতো মঙ্গল-উপচারে সম্পন্ন করেছিলেন তার বিবাহ-উৎসব। স্বপ্নের মতো সে শুভদিন কোথায় গেল? এ কী সর্বনাশা লড়াই, দিনে দিনে এ কী বিভীষিকার কালো?
হেকিউবা শুধু ট্রয়ের সম্রাজ্ঞী নন—সার্থক গর্ভধারিণী, মহিমময়ী জননী। প্রায়ামের পঞ্চাশটি সন্তানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্তানগুলি জন্মেছে তাঁরই গর্ভে। উনিশটি সন্তান—যার মধ্যে প্যারিস হেকটর হেলেনাস ডিই-ফোবাসের মতো পুত্র, ক্যাসানড্রা পলিকসেনার মতো কন্যা।
গ্রীক পুরাণে এক মহাগর্বিতা জননীর কাহিনী আছে। তার নাম নাইওবি। থীবসের রানী। চোদ্দটি সন্তানের জননী—সাতটি কুমার ও সাতটি কন্যা। প্রতিটি পুত্র কন্দর্প কান্তি, প্রতিটি কন্যা অপ্সরার মতো সুন্দরী।
হেকিউবার পুত্রকন্যা চোদ্দ নয়—উনিশ। রূপে গুণে বীর্যে মাধুর্যে তাঁর সন্তানরা সেই নাইওবির সন্তানদের চেয়ে কম?
জননীশ্রেষ্ঠা ল্যাটোনা। তাঁর একটি মাত্র পুত্র আর একটি মাত্র কন্যা। কিন্তু তারা জগতের আলো। পুত্র সূর্যদেব অ্যাপোলো, কন্যা চন্দ্রদেবী ডায়ানা। প্রত্যেকটি নারী বাঞ্ছিত মাতৃত্বের কামনায় ল্যাটোনা দেবীর পূজা দেয়।

সন্তানগর্বে গর্বিতা মূঢ় মর্ত্যনারী নাইওবি দেবী ল্যাটোনার অসম্মান করেছিল। ফল ফলতে দেরি হয় নি। মায়ের চোখের সামনে দৈব তীরের নির্মম আঘাতে মরেছিল সাত ভাই আর সাত বোন।

সার্থক মাতৃত্বের দেমাকে স্বর্গের দেবীকে তো কখনো অসম্মান করেন নি হেকিউবা? তবু সন্তানের পর সন্তান মরছে। একে একে পেটের সন্তান মরছে। মরছে ট্রয়মহিষীর আপন সন্তানের মতো রাজ্যের শত শত সন্তান।

মৃত্যুর পর মৃত্যু। শোকের পর শোক—দারুণ শোক হেকটরের মৃত্যু। শেকসপিয়ারও হোমারকে অনুসরণ করে তাঁর ট্রয়লাস ও ক্রেসিডা নাটকের উপসংহার টেনেছেন হেকটরের মৃত্যুতে। যবনিকা পাতের আগে একটি বাক্য শুধু বলেছেন—

হেকটর মৃত, আর কিছু বলার নেই।

কিন্তু হেলেনের কাহিনী সম্পূর্ণ করতে আরো কিছু বলার আছে।

এখনি শোকের শেষ হয় নি—এখনো শেষ অঙ্ক বাকি। কৃষ্ণ যবনিকা এখনো পড়ে নি। আরো কতো মৃত্যু দেখতে হবে, কতো শোক সইতে হবে। নাইওবির বুকের রক্ত শুকিয়ে গিয়েছিল, পাথর হয়ে গিয়েছিল দেহ, দৃষ্টিহীন নিষ্প্রাণ চোখ থেকে গড়িয়ে পড়েছিল অশ্রুধারা। হেকিউবার চোখেরও অশ্রুর বিরাম নেই—বাকি শুধু হিমকঠিন চরম ভাগ্য। এখনো অপেক্ষা করতে হবে তার জন্যে।

দিনে দিনে সেই ভাগ্য ঘনিয়ে আসছে। সর্বংসহা শান্তভাষিণী রানী হেকিউবার চোখেও দিনে দিনে ফুটে উঠছে হেলেনের সর্বনাশিনী রূপ। মায়া নেই এক বিন্দু, উবে গেছে স্নেহের বাষ্প—হেলেনকে তিনি আজকাল ভয় করেন। হেলেনের ছায়া দেখলে তিনি শিউরে ওঠেন, তার চোখে চোখ পড়লে দেখেন আসন্ন ভবিষ্যতের ছায়া—

জ্বলন্ত দুটো চোখ—
কী শক্তি ঐ চোখে,

কী চুম্বক টান, কী দুর্দান্ত দাহ !
ঐ চোখের কুহক
সহস্র ভাগ্যকে শেকল দিয়ে বাঁধে,
বিধ্বস্ত করে নগর,
প্রাসাদের চূড়ায় চূড়ায়
জ্বালায় বহ্নিশিখা !

মুখ বন্ধ করেই ছিলেন মাতা হেকিউবা এতোদিন—স্নেহে ভয়ে শোকে। শিলার মতো স্থির। কিন্তু আর হেকটর নেই ! তাই সেই নিশ্চুপ শিলামুখ থেকে ঘৃণার লাভাস্রোত উদ্গীরণে আর কোনো বাধা নেই। ইউরিপিডেসের ভাষায়—

কতোবার বলি নি তোকে
ভিক্ষা করি নি হাত ধরে—
তুই ক্ষমা কর্
আমার ছেলে প্যারিসকে মুক্তি দিয়ে
তুই তোর গ্রীসে ফিরে যা !
কেউ জানবে না, কেউ বলবে না একটি কথা—
রাজ্যের সব সোনা তোর আঁচলে বেঁধে
গোপনে তোকে পাঠিয়ে দেব—
একবার শুধু বল্, কথা দে !
তা শুনবি কেন আমার কথা,
রূপভাঙানি সর্বনাশী ?
তুই চাস—
সারারাত বুকে নাচাবি
আমার ছেলেকে,
আর ক্লান্ত চোখে কাজল পরে

সারাদিন বুকে নাচাবি
রাজপুরীর রত্ন হার।

ইলিয়াড মহাকাব্যে হেলেনের প্রথম আবির্ভাব স্কীয়ান তোরণশীর্ষে। রাজা প্রায়ামের পাশে। দশম বর্ষের যুদ্ধারম্ভের সূচনায়। প্যারিস মেনিলাওসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখবার জন্যে অন্তঃপুর থেকে তাকে ডেকে আনা হয়েছিল। পাশে বসিয়ে রাজা প্রায়ামই তাকে দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন—

ঐ ছাখো গ্রীক বাহিনী। ঐ বাহিনীর মধ্যে আছে তোমার আগেকার স্বামী—তোমার পুরোনো দিনের আত্মীয়-বন্ধুজন। ছাখো, তুমি ওদের চিনতে পারো কিনা!

উনিশ বছর পরে দেখা। পূর্বতন স্বামী মেনিলাওস—উনিশ বছর আগে যাকে ত্যাগ করে সে এসেছে। আরো কতো গ্রীক বীর, সঙ্গে শত শত সৈন্য। সবাই এসেছে তার জন্যে, তাকে ট্রয় থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্যে।

আর এ পক্ষে রয়েছে তার বর্তমান স্বামী প্যারিস, বীর ভ্রাতা হেকটর। আরো কতো ট্রোজান বীর· ·তাদের সঙ্গেও শত শত ট্রোজান সৈন্য। তার জন্যে, তাকে ট্রয়ের প্রাসাদে রক্ষা করবার জন্যে।

গত ন-বছর ধরে যে যুদ্ধ চলেছে হেলেন এতোদিন তা প্রত্যক্ষ করে নি। এতোদিন যুদ্ধ হয়েছে নগরসম্মুখ থেকে দূরে—রাজ্যের এধারে ওধারে। ট্রয়ের তোরণ আক্রমণ করতে এর আগে গ্রীকরা দলবদ্ধ হয়ে এগোয় নি। সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে মুখোমুখি ব্যূহ রচনা করে নি ট্রোজান সৈন্যদল। প্রসারিত রণক্ষেত্রে দু-পক্ষের রণোন্মাদ যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে অন্তরালবর্তিনী হেলেন এই প্রথম উপলব্ধি করল যুদ্ধ কাকে বলে।

সমস্ত অন্তর ডুকরে কেঁদে উঠেছিল হেলেনের। শ্বশুর প্রায়ামের পায়ে

হাত রেখে সে কাতর গলায় বলেছিল—

আপনার ছেলের সঙ্গে এখানে আসার আগে যদি আমার মৃত্যু হতো!

সারা ইলিয়াডে আর দুবার মাত্র হেলেনের সাক্ষাৎ পাই। দুবারই তার মুখে একই কথা, মনে একই অনুশোচনা। একই কথা সে বলেছে হেকটরের যুদ্ধযাত্রার মুখে তার হাত ধরে—এর চেয়ে আমার মৃত্যু হলো না কেন? একই আর্তনাদ করেছে হেকটরের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে—ভাই, তুমি কেন আমার জন্যে প্রাণ দিলে? প্যারিসের সঙ্গে ট্রয়ে আসার আগে ভাগ্য আমার প্রাণটা নিল না কেন হেকটর?

অন্ধ কক্ষের নির্জনতায় সেই আর্তনাদ হেলেনের বুকের মধ্যে গুমরে ওঠে—

এতো মৃত্যুর বদলে আমি মরি নি কেন? স্পার্টা থেকে প্যারিসের হাত ধরে ট্রয়ে এসেছিলাম কেন? ভালবাসার জন্যে? এমন ভালবাসা বেসেছিলাম কেন?

ভালবাসার দোষ নেই। হেলেনের ভালবাসা সার্থক। হেলেনের অনুশোচনাতেও খাদ নেই—সত্য তার অন্তরবেদনা। মহাকবির মন এ কথা বুঝেছিল। সমাজের চোখ দিয়ে হেলেনকে তিনি দেখেন নি। তার ওপর মেলেছিলেন মরমী কবির সহানুভূতির চোখ। সমবেদনাকে তিনি নির্লিপ্তির আবরণে ঢেকে রেখেছিলেন। হেলেনের প্রতি উচ্চারিত রাজা প্রায়ামের একটি মাত্র কথায় কবির সমমর্মিতার যথেষ্ঠ প্রকাশ—

তোমার কোন দোষ নেই মা—দোষ ভাগ্যের, দোষ দেবতার ভ্রূকুটির।

কুড়িটি বছর কাটতে চলল। আয়ু থেকে ঝরে পড়া কুড়িটি বসন্ত ঋতু। হেলেনের প্রেম এখনো অম্লান, শীতের ঝড়ে ফুল-ঝরা বাগানে একলা সূর্যমুখীটির মতো।

আসন্ন ধূসরতার দিকে তাকিয়ে হেলেন মনে মনে বলে—

প্রেম? প্রেম আছে বৈকি! আগুনে পোড়া রোদ্রে জ্বলা প্রেম। প্রেমের

জন্যেই তো প্রতি রাত্রের রোমাঞ্চশয্যায় নিষ্পিষ্ট হচ্ছি রতিমাতাল প্যারিসের আলিঙ্গনে! প্রেমের জন্যেই তো প্রত্যূষ-আকাশের শুকতারা-টির দিকে তাকিয়ে দুর্গশিখর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারছি নে মৃত্যু-মাতাল রণক্ষেত্রে!

কিন্তু সেই প্রেমের জন্যে এতো মৃত্যু, এতো রক্তপাত?

আমার প্রেমের এতো মূল্য দেবে পৃথিবী?

২১

পৃথিবী এমনি মৃত্যুমূল্য দিয়েছিল মহাকাব্যের আর এক মহাযুদ্ধে। ভারতীয় পুরাণকাব্যের বৃহত্তম মৃত্যুকুণ্ড লঙ্কা। পুরাণকাররা সংখ্যা গণনায় অযুত লক্ষ নিযুত কোটির নিচে নামেন না। রাম-রাবণের যুদ্ধবর্ণনাতেও তেমনি গণনার বিস্ফোরণ।

ইন্দ্রজিতের প্রথম দিনের যুদ্ধে সাতষট্টি কোটি বানর নিহত হয়েছিল। রাক্ষসসৈন্য সবশুদ্ধ কতো নিহত হয়েছিল তার কোন হিসেব নেই। পাছে কেউ তা গণনা করে, তাই বিচক্ষণ রাবণের আদেশে তাদের মৃতদেহ সাগরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

মহাযুদ্ধে সাধারণ সৈন্য কতো মরল বাঁচল তা নিয়ে মহাকবির মাথাব্যথা নেই। তবে বাল্মীকির একটি বাক্যই সেই অসংখ্য মৃত্যুর তীক্ষ্ণমুখ বিবরণ, যেখানে তিনি বলছেন—রণক্ষেত্রে নিহত সেনার শোণিত মল যকৃৎ প্লীহা অন্ত্র ও দেহরস মিলে এক যমসাগরগামিনী নদীর উৎপত্তি হয়েছিল।

যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত অন্তত তেইশ জন রাক্ষসবীরের উল্লেখ বাল্মীকিরামায়ণে আছে। শেষ নিধন রাবণের। রাবণের মৃত্যুতে লঙ্কা বীরশূন্য হয়েছিল। এক ঘরশত্রু বিভীষণ ছাড়া রক্ষরাজবংশে বাতি দিতে আর একটি পুরুষও জীবিত ছিল না। শুধু নিঃসহায়া নারীরা বিলাপের কলরোল তুলেছিল।

হেলেনেরই মতো আর এক পরবাসিনী বেদনা—অশোক কাননে সীতা। লঙ্কার উত্তর তোরণের সামনে যখন দিনের পর দিন ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে, অসংখ্য মানুষ মরছে, হানাদার শত্রুর আক্রমণে একের

পর এক রাক্ষসবীর নিহত হচ্ছে—লঙ্কাবাসীদের সেই ক্ষতি সেই আতঙ্ক সীতার প্রাণে বাজছে না, কানে আসছে না মৃত্যুশোকের ক্ষীণতম আর্তনাদ। আত্মচিন্তাই সীতার একমাত্র চিন্তা—আত্মবিলাপেই সে নিত্য আকুল। বন্দনমুক্তিই নিঃসহায়া বন্দিনীর প্রতি মুহূর্তের একমাত্র মনোবাঞ্ছা।

বঞ্চিতার আত্মবিলাপ শেষ পর্যন্ত। সত্যিই সীতা চিরবঞ্চিতা, জনম-দুঃখিনী। জন্ম থেকেই তার ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের ভ্রূকুটি। সেই মেঘ কদাচিৎ সরে। দিগন্তে দেখা দেয় সুখসৌভাগ্যের রশ্মিরেখা—আবার গাঢ়তর কালিমায় জীবনের দিক্‌চক্রবাল ঢেকে যায়।

জন্মলগ্নেই সীতা অবমানিতা। কোন্ নিষিদ্ধ মিলনের ফলে তার জন্ম কেউ জানে না। পিতৃমাতৃ-পরিত্যক্ত সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে রাজা জনকের শস্যক্ষেত্রে হলরেখার ফাঁকে পাওয়া গিয়েছিল—তাই তার নাম সীতা। এই পরিচয়হীনাকে রাজা জনক কন্যাসম পালন করেছিলেন—পালক পিতার নাম অনুসারে তার আর এক নাম জানকী।

পালক পিতার গৃহে সীতার বেশি দিন কাটে নি। রক্ষণশীল অভিভাবক কন্যাকে যে বয়সে গৌরীদান করে তার চেয়েও অল্প বয়সে সীতার বিবাহ হয়েছিল। বিবাহকালে সীতার বয়স মাত্র ছয় আর তার বালক স্বামী রামের বয়স বারো। রামের অনুজদের সঙ্গে মিথিলার রাজ-পরিবারের আরো তিনটি কন্যার বিবাহ হয়েছিল। শিশুবিবাহের এই নিদর্শনে ভারতীয় চিত্ত অবশ্য কখনো পীড়িত বোধ করে নি।

শিশুকন্যা সীতা শিশুবধূরূপে এক রাজসংসার থেকে আর এক রাজ-সংসারে নীত হলো। আর সীতা যখন প্রস্ফুটিতযৌবনা অষ্টাদশী—যখন তার জীবনে বাসনা-কামনা সুখ-সৌভাগ্যের সবে উন্মোচন তখন তার অরণ্যযাত্রা।

রাম শরৎকালীন মৃগয়াযাত্রায় অরণ্যে যান নি, চোদ্দ বছরের জন্যে তিনি নির্বাসিত হয়েছিলেন। স্বামীর সঙ্গে বনগমনের উচিত সিদ্ধান্তই

নিয়েছিল উদ্ভিন্নযৌবনা সীতাসুন্দরী। চোদ্দ বছরের স্বামীবিচ্ছেদ বিবাহবিচ্ছেদ বা বৈধব্য ছাড়া আর কী? কামদুর্বল বৃদ্ধ শ্বশুর, সর্পসমা সৎ শাশুড়ী আর অনির্ভর দেবরদের অধীনে বিপন্ন জীবন কাটানোর চাইতে স্বামীসহ বনবাসেও স্বস্তি। যার স্বামী গৃহত্যাগী উদাসীন সম্পন্ন সংসারে বাস করেও সে যে শূন্যময়ী তার প্রমাণ উপেক্ষিতা উর্মিলা। লক্ষণবিহনে তার ভাগ্যে কী ঘটেছিল কে তার খবর রাখে? বুদ্ধিমতী সীতা ইঙ্গিতময় ভাষায় রামকে বুঝিয়েছিল—তুমি আমাকে নিতান্ত বালিকা অবস্থায় বিবাহ করেছ। বহুকাল তোমার সঙ্গে বাস করেছি —এখন কি নটের মতো আমাকে পরের হাতে দিতে চাও?

শিশুবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ যে সমাজে প্রচলিত, সে সমাজে নারীর মূল্য কানাকড়ি। বাসনারজ্জুর বন্ধনে যে তার বহুপত্নীক স্বামীকে যতো শক্ত করে বাঁধতে পারে, ততোই তার কৃতিত্ব। সেই কৃতিত্ব কৈকেয়ীর। আদর্শ নারীর শুধু দেহ আছে, দেহের পবিত্রতা আছে। দেহের পবিত্র অর্ঘ্য সাজিয়ে স্বামীদেবতার পূজা করার ব্রত আছে। এই একনিষ্ঠ ব্রতপালনের নাম সতীত্ব—তেমন সতী সীতা।

বনবাসের কটি বৎসর সীতার জীবনের জীবনের শ্রেষ্ঠ ঋতু। পর্ণকুটীরের স্বস্তি রাজপ্রাসাদের চেয়ে অনেক বেশি। পর্ণশয্যা বিরহশয্যা নয়। বসন্তের হরিৎ মুকুল যেমন হেমন্তে স্বর্ণাভ ফলে পরিণত হয়, তেমনি পঞ্চবটীতে প্রকৃতির কোলে সীতার বিকশিত যৌবন পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল।

বনবাসের ত্রয়োদশ বর্ষে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ। সীতার বয়স তখন প্রায় ত্রিশ। এই ঘটনাই রামায়ণের সঙ্গে ইলিয়াডের তুলনাকে আসন্ন করে। সঙ্গে সঙ্গে হেলেনের সঙ্গে সীতার তুলনাকে মনশ্চক্ষে ফুটিয়ে তোলে—স্পষ্ট হয়ে ওঠে মিলের চেয়ে অনেক বেশি অমিল।

সীতা বীর্যশুল্কা, হেলেন স্বয়ংবরা। হরধনুভঙ্গের পরীক্ষা দিয়ে রাম সীতাকে লাভ করেছে, মেনিলাওসের গলায় হেলেন মালা দিয়েছে

নিজের পছন্দে। রামের অবর্তমানে রাবণ সীতাকে জোর করে ছিনিয়ে গেছে, মেনিলাওসের অবর্তমানে হেলেন নিয়েছে স্বেচ্ছায় স্বামীত্যাগের সুযোগ। প্রেমিক প্যারিসের অঙ্কশায়িনী হতে হেলেন এক মুহূর্ত দ্বিধা করে নি, আর মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে কামুক রাবণের আলিঙ্গনকে পরিহার করেছে সীতা। অশোক কাননে বন্দিনী সীতা কেঁদেছে আর ট্রয়ের রাজপালঙ্কে সুখাসীনা হেলেন হেসেছে।

রাবণ মহাবীর। লঙ্কার সিংহাসনে সে উত্তরাধিকার সূত্রে বসে নি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবেরকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে সে লঙ্কার অধীশ্বর হয়েছে। কুবেরের পেছনে ধাওয়া করে রাবণ তার পুষ্পকরথ কেড়ে নিয়েছে—কুবের সারা জীবনে আর লঙ্কামুখো হয় নি, আশ্রয় নিয়েছে সুদূর উত্তরে কৈলাসে। রাবণ স্বর্গরাজ্যেও হানা দিয়ে ইন্দ্র আর বিষ্ণুর সঙ্গে এক হাত লড়াই করেছে। যমরাজকেও সে হার মানিয়েছে। একমাত্র শিবের ত্রিশূলের কাছে মাথা নিচু করে ঐ দেবাদিদেবকে আরাধ্য বলে স্বীকার করেছে সে।

আর্যাবর্তের রাজারা রাবণের ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপত। কেউ তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে নি। রামের হাতে চরম পরাজয়ের আগে দুবার মাত্র হেরেছিল সে—এক মাহিষ্মতীরাজ কার্তবীর্যার্জুনের হাতে আর এক কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালীর হাতে। দুবারই সসম্মানে সন্ধি করে সে নিজের গর্ব বজায় রেখেছিল। এই দুই রাজাকে দ্বিতীয়বার সে ঘাঁটাতে যায় নি।

পররাজ্যের ধনসম্পদের সঙ্গে রাবণের লুণ্ঠনের প্রধান সামগ্রী ছিল পরনারী। শত্রুবধের সঙ্গে সঙ্গে নারীধর্ষণেই রাবণের একমাত্র পরিতৃপ্তি। তার বিশাল হারেম অপহৃতা ও ধর্ষিতা নারীতে ভর্তি থাকত। বিলাসে ব্যসনে তামসিক আহারে আর মদ্যপানে তারা বশীভূত থাকত, ভয়েও কাঁপত। সীতাহরণের কারণও রাবণের লাম্পট্য-লালসা।

এই সীতাসতীর প্রতি অঙ্গের রূপবর্ণনায় বাল্মীকির লেখনী লুব্ধ তস্করের মতো নির্লজ্জ। সীতার দেহত্বক চম্পকবর্ণা—তাতে তপ্ত কাঞ্চনের আভা। তার নখগুলি উন্নত ও রক্তবর্ণ। পূর্ণচন্দ্রের মতো তার মুখমণ্ডল। তার বিশাল দুই নয়ন পদ্মপলাশের মতো। তার গ্রীবাদেশ আকর্ষক। তার বক্ষযুগল পীনোত্তুঙ্গ। সীতা ক্ষীণকটি, কিন্তু তার বিস্তৃত জঘন—তার উরুদ্বয় হাতীর শুণ্ডের মতো মাংসল ও সুগোল। দেবী গন্ধর্বী যক্ষী বা কিন্নরী—রূপে সীতার কাছে কেউ না।

নারীদেহলোলুপ রাবণের প্রৌঢ় রক্তকে উদ্দীপ্ত করার জন্যে নায়িকার এই কামলোভা দেহবর্ণনা বাল্মীকির নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল না হোমারের—কেননা প্যারিস কামুক নয়, প্যারিস প্রেমিক। হেলেন তার কাছে দেহসর্বস্ব নিষ্প্রাণ কামভাণ্ড নয়—মনোলোভা প্রেমিকা। সীতা একনিষ্ঠা সতী—ভাগ্যের অভিশাপ-পীড়িতা পরম দুঃখিনী। হেলেন দ্বিচারিনী অসতী—প্রেমের আশীর্বাদধন্যা ভাগ্যবতী। শুধু সীতা নয়, হেলেনও কেঁদেছে। সীতা শুধু নিজের জন্যেই চোখের জল ফেলেছে। হেলেনের অশ্রু ঝরেছে অপরের জন্যে।

সীতা যাকে ঘৃণা করেছিল সেই রাবণের কীর্তি-অকীর্তি, পৌরুষ আর বীরত্বের বর্ণনায় মহাকবির একটুও কার্পণ্য নেই। কিন্তু হেলেন যাকে ভালবেসেছিল, সেই প্যারিসের কথা বলেছে কে ?

গ্রীক-ট্রোজানের পুরাণকথায় সবচেয়ে উপেক্ষিত চরিত্র প্যারিস—নিতান্ত অপাঙ্‌ক্তেয়। হীনতা, শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা, কাপুরুষতা—এই সব গুণ প্যারিসের ভূষণ। প্যারিসকে ভালো বলার মতো কিছু নেই, প্যারিসকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করাই যথেষ্ট। ক্ল্যাসিক্যাল যুগের গ্রীক নাট্যকাররা ট্রয় যুদ্ধের সূত্র ধরে নানা নাটক রচনা করেছেন, কিন্তু প্যারিসকে তাঁদের কোনো রচনায় স্থান দেন নি। ভার্জিলের ঈনিড কাব্যে ঈনিয়াস ট্রয়ের পতন বর্ণনা করেছেন, কিন্তু যার জন্যে পতন

সেই প্যারিসের নাম পর্যন্ত মুখে আনেন নি।

প্যারিস বীর নয়, যোদ্ধা নয়। জন্মকাল থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত সে বনবাসীদের মধ্যে মানুষ হয়েছে। তীর ছুড়ে বড়ো জোর হিংস্র অরণ্য-পশুকে শিকার করেছে—কিন্তু শেখে নি মানুষের ওপর হিংস্র বিক্রম প্রকাশ করতে। বর্ম পরতে শেখে নি, তরোয়াল ঘোরাতে বর্শা ছুড়তে শেখে নি—সম্মুখযুদ্ধে মানুষকে হত্যা করতে শেখে নি। সে বীর হবে কেমন করে?

প্যারিস জীবনে কখনো যুদ্ধ দেখে নি, রণসাজ পরে নি। ট্রয় যুদ্ধই মৃগয়াবাসী প্যারিসের যুদ্ধের প্রথম অভিজ্ঞতা—মানুষবধে প্রথম হাতে খড়ি। সেই অনভিজ্ঞ কাপুরুষকে বীর হেকটর বারে বারে হাঁক দিয়ে ডেকেছে—বর্ম আঁটো, শিরস্ত্রাণ পরো, হাতে তুলে নাও অস্ত্র। স্ত্রী-লোকের আঁচল ধরে ঘরে বসে থেকো না, চলো আমার সঙ্গে যুদ্ধে।

প্যারিস বীর নয়, প্রেমিক। হেলেন তার উনিশ বছরের প্রেমসঙ্গিনী। দীর্ঘ উনিশ বছর ধরে ট্রয়ের প্রাসাদে প্যারিস হেলেনকে বুকে নিয়ে কাটিয়েছে। উনিশ বছর পরেও হেলেনের প্রতি প্রেম তার অফুরান। প্রতিরাত্রে সে হেলেনকে নতুন করে পায়, প্রতি প্রভাতে সে নতুন করে হেলেনের মুখ দেখে একনিষ্ঠ অনুরাগে উনিশটি বসন্তের ফুল এমনি ভাবে একে একে চয়ন করে সে পৌঁছেছে প্রৌঢ়ত্বের হেমন্ত-গোধূলিতে। এই পরমাশ্চর্য প্রেমের সপক্ষে কোনো কবি কোনো সাহিত্যিক একটি কথা বলেন নি। প্যারিস-হেলেনের জীবন নিয়ে একটি সমবেদনা ভরা চিত্র রচনা করেন নি।

কিন্তু যুদ্ধ? হেলেনের জন্যে? হেলেনকে ভালবাসার জন্যে? যুদ্ধ মানে যে রক্তপাত, অগণিত মৃত্যু, সম্ভাব্য সর্বনাশ!

প্রেমিকা হেলেনের মতো প্রেমিক প্যারিসেরও একই ভাবনা—

প্রেমের এতো মূল্য দেবে পৃথিবী!

তাই দশম বর্ষের প্রথম সম্মুখযুদ্ধের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অক্লান্তপ্রেমী প্যারিস

মেনিলাওসের সঙ্গে এক আশ্চর্য চুক্তি করল।

হেলেনকে চাও ? তাকে না পেলে চূরমার করে দেবে রাজ্য, ছারখার করে দেবে পৃথিবী ? বেশ, এই ছাখো, সহস্র যোদ্ধার চোখের সামনে শস্ত্রসাজে সেজে তোমার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো, তাতে তোমার বীরখ্যাতি হবে উজ্জ্বল। তুমি আমাকে হত্যা করো, তাতে আমার প্রেম হবে অনন্ত। তারপর হেলেনকে নিয়ে যাও !

প্রেম বুঝি কুসুমের কারাগার ! সেই কারাগার থেকে মুক্তি একমাত্র মৃত্যুই দিতে পারে। সেই মুক্তির ফলে দেশ বাঁচবে, জাতি বাঁচবে। মেনিলাওসের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে আত্মহত্যার ঘোষণা করেছিল প্যারিস।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের সঠিক বর্ণনাই হোমার দিয়েছেন। একমাত্র দূর থেকে ধনুর্বাণ চালাতেই যে শিখেছে, সে প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে কেমন করে ? ঢাল তরোয়াল আর বর্শা হাতে নিয়ে সে রঙ্গমঞ্চের বীর হতে পারে, যুদ্ধক্ষেত্রে বীর হতে হলে তার হাস্যকর পরাজয় ঠেকাবে কে ? সে তো সিংহচর্মাবৃত গর্দভ মাত্র ! নিজের ইচ্ছাতেই প্যারিস এমনি গর্দভ সেজেছিল।

কোনো অস্ত্রই প্যারিসের কাজে লাগে নি আর মেনিলাওসের প্রতিটি অস্ত্র নির্ভুল আঘাত হেনেছিল—নিতান্ত বর্ম আর শিরস্ত্রাণের জোরে সে আঘাত থেকে পারিস বেঁচেছিল। ঘাতক যেমন নিরীহ ছাগশিশুর গলার দড়ি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায়, শিরস্ত্রাণের ঝুঁটি ধরে অক্ষম প্যারিসকে তেমনি টেনে নিয়ে চলেছিল মেনিলাওস—ছাগ-শিশুরই মতো বলি দেবে বলে। শিরস্ত্রাণের চামড়ার ফাঁসে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ। নিশ্বাসও রুদ্ধপ্রায়। চোখে অন্ধকার।

সেই অন্ধ চোখের সামনে ভেসে উঠল দেবী ভিনাসের মুখ। দেবী তাকে প্রেমের বর দিয়েছেন। হঠাৎ প্যারিসের বাঁচবার সাধ হলো– গলার ফাঁস যেন প্রেমের পিপাসা। আর একবার এ পিপাসা মেটাতে হবে,

এ স্বাদ পেতে হবে। এই প্রেমের জন্যে আরো একটি রাত বাঁচতে হবে। সেই মুহূর্তে গলার ফাঁসটা ছিঁড়ে গেল, বুঝি বা দেবী ভিনাসেরই দয়ায়। পেছন দিকে সোজা দৌড় দিল প্যারিস।

হেলেনের দরজায় এসে আকুল করাঘাত করছে প্যারিস। গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না, হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছে, ঘামে জবজব করছে সারা গা।

হেলেন বলছে—

পালিয়ে এলে ? মেনিলাওসকে খুন করতে পারলে না ? মরতে পারলে না তার হাতে ? তুমি না বীব ?

হেলেনের মুখের দিকে ক্লিষ্ট চোখে তাকিয়ে প্যারিস বললে—

আমি বীর নই হেলেন—তাই মারতেও পারলাম না, মরতেও পারলাম না। আমি শুধু প্রেমিক, তাই জীবনটুকু নিয়ে আবার তোমার কাছে ফিরে এলাম !

২২

বর্বর ধর্ষকামিতায় রাবণের কোনো তুলনা নেই। তাই বলে পুরুষের কামুকতা কোনো হীনবৃত্তি নয়—কামুকতা গর্বের বস্তু, বীরের ভূষণ। শত্রুসংহার আর নারীসংগম—উভয় ক্রিয়াতেই বীরের বীর্যমোক্ষণ। গ্রীক পুরাণে বীরের পৌরুষধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রতীক দেবশ্রেষ্ঠ সম্রাট জুপিটার।

টাইটান বংশে জুপিটারের উদ্ভব। হাতে তাঁর বজ্র—সৃষ্টির ভয়ালতম সংহার-প্রকরণ। সেই বজ্রের আঘাতে আপন পিতা ক্রোনাসকে বধ করে আর বিদ্রোহী টাইটানদের ধ্বংস করে জুপিটার সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করেন।

অলিম্পাসের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জুপিটার এক ভাই নেপচুনকে দেন সমুদ্রের কর্তৃত্ব আর এক ভাই প্লুটোকে দেন পাতালের অধিকার। কিন্তু সৃষ্টির সর্বময় অধিকর্তা তিনি। তাঁর কথায় সূর্য চন্দ্র ওঠে বসে, আকাশমণ্ডলে নতুন নতুন গ্রহতারা জন্ম গ্রহণ করে। তাঁর ভ্রূকুটিতে সব দেবতা থরথরিয়ে কাঁপে—কেউ যদি কখনো তাঁকে অমান্য করে, এমন শাস্তি সে পায়, যা কখনো ভোলে না।

আদর্শ বীর দেবরাজ জুপিটারের কামুকতার নির্লজ্জ প্রকাশ বহুনারী-সম্ভোগে। দেবতা হলেও মর্ত্যনারীর প্রতি তাঁর নিত্য লোলুপতা। টাইরেসিয়াস বলেছেন, রতিসুখের ন-ভাগ পায় নারী আর মাত্র এক ভাগ পায় পুরুষ। তাই পত্নী জুনোকে যতোটা রতিতৃপ্তি জুপিটার দেন, তার সমান সমান তৃপ্তিলাভের জন্যে জুপিটারের আরো নটি নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কের দরকার। এ কথা সরাসরি রানীর কাছে কবুল

করতে জুপিটারের লজ্জা নেই। গ্রীকপুরাণে জুপিটারের অন্তত ন-জন মর্ত্যপ্রণয়িনীর উল্লেখ আছে। দেবরাজের সাময়িক লালসাকে অঙ্গে পোষণ করে তাদের কেউ বা মাতৃত্বের গর্বে গরবিনী হয়েছে, কেউ বা বঞ্চনার অশ্রুজলে অতিবাহিত করেছে ব্যর্থ তিক্ত জীবন।

মর্ত্যের বীরও নারীর প্রতি ব্যবহারে দেব-আদর্শকে অনুসরণ করে। বীর স্ত্রৈণ হয় না, সারাজীবন ধরে একই নারীর পা চাটে না, একই নারীর কামকুণ্ডে বীর্য নিবেদন করে না। বীরের কামুকতা তার বীরত্বেরই উপঢৌকন।

কিন্তু প্যারিসের কামুকতা বীরত্ব নয়, কাপুরুষতা। কাপুরুষ বলেই অনন্যা প্রেয়সী হেলেনের প্রতি তার সুদীর্ঘস্থায়ী কামাশক্তি। যৌবন থেকে প্রৌঢ়কাল পর্যন্ত একই শয্যায় শয়ন, একই পঙ্কে নিত্য স্নান। এইজন্যে বীরের জগতে প্যারিস অপাঙ্‌ক্তেয়—বীরকাহিনীর চারণ প্যারিসকে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু করে না।

মেনিলাওসের কান-ফাটানো চিৎকার—হেলেনকে ফিরে পেতে হবে, হেলেনের জন্যে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে হবে। আসল রাগ প্যারিসের ওপর। বিশ্বাসঘাতক প্যারিস, কাপুরুষ প্যারিস—তাকে শাস্তি দিতে হবে। ক্রৌঞ্চবিলাপ করে নি মেনিলাওস—ক্রোধোন্মত্ত চিৎকারে সে আকাশে ছুড়েছে তার প্রার্থনা--

প্রভু এই বর তুমি দাও, প্যারিসকে যেন ধ্বংস করতে পারি!

উনিশ বছর আগে। সেদিন তরুণ প্যারিস আর তরুণী হেলেন এক-সঙ্গে সমুদ্রে ভেসেছিল—হাতে হাত ধরে, চোখে চোখ রেখে। দুজনেরই রক্তে একমুখী জোয়ার—কখন এক তরঙ্গে আর এক তরঙ্গ মিশে যাবে! তীরভূমির অদূরে ক্র্যানি দ্বীপে নোঙর ফেলেছিল তাদের জাহাজ। জাহাজ থেকে নেমে সেই দ্বীপের উপকূলে তারা সাজিয়েছিল প্রথম মিলনরাত্রির বাসরশয্যা।

বাঁশি বাজেনি, আলোর মালায় সজ্জিত হয় নি বিবাহমণ্ডপ। কোমল শয্যা ঢাকে নি ফুলের আস্তরণে। আমন্ত্রিতের কলরব আর পুরনারীদের হুলুধ্বনিতে বিক্ষিপ্ত হয় নি নিভৃত নিস্তব্ধতা। শুধু মনভোলানো প্রেমিক আর ঘরপালানো অভিসারিকা। পায়ের নিচে তৃণের ফিসফিসানি।

সেই ক্ষণবাসরের ছায়ায় চাঁদের মৃদু আলোয় হেলেন খুলে ফেলল তার হেম মেখলা—তার নির্বসনা দেহের জ্যোতিতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল প্যারিসের। দু-পা এগিয়ে স্থানু হয়ে সে দাঁড়াল। নিশ্চল হয়ে গেল তার ব্যাকুল দু-হাত। মুখে একটি কথা নেই, পলক পড়ে না চোখে।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর বিকচ মূর্তির দিকে নিস্পন্দ হয়ে প্যারিস তাকিয়ে রইল। জলস্থল-অন্তরীক্ষ্যের সমস্ত লাবণ্য সমস্ত রহস্য এক মানবপ্রতিমার রূপ ধরে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

নগ্নিকা স্বর্গদেবী নয়—তুলনা নয়, প্রলোভন নয়। অতুলনীয়া মানব-কন্যা। বুকে যুগল সুবর্ণ কলস প্রেমের অমৃতে কানায় কানায় ভরা। যুগল ঊরুর ছায়াসন্ধিতে গভীর গোপন তীর্থ, প্রেমনির্ঝরিণীর উৎসমুখ!

ঐ উৎসে সে পৌঁছবে, ঐ অমৃত সে পান করবে—এতো ভাগ্য তার?

হঠাৎ হেলেন প্যারিসের বুকে রাখল হাত। চমকে সম্বিত ফিরে পেল প্যারিস—হৃৎপিণ্ডের সমস্ত রক্ত জোয়ারের বেগে তার মত্ত পৌরুষকে উত্তুঙ্গ করে তুলল। সে আর স্থির থাকতে পারল না।

দাও আমাকে দাও, আর আমি অপেক্ষা করতে পারি নে!

তখন প্যারিসের চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে হেলেন বললে এক আশ্চর্য কথা—যা কোনো নারী কোনো পুরুষকে এ পর্যন্ত বলে নি। যে কথা আত্মময়ী নারীর প্রথম আত্মঘোষণা।

আমি কেন দেব? আমাকে চেয়ো না, কেড়ো না কিছু আমার কাছ থেকে—তুমি শুধু আমাকে দাও!

আমি দেব? তুমি দেবে না?

ফুলের মতো নিজেকে উন্মোচিত করে পাপড়ির মধ্যে প্যারিসকে ভরে

নিল হেলেন।
অস্ফুট গলায় বললে—
তুমি যদি দাও, তা হলেই আমার দেওয়া হবে।
এই দেওয়ার মূল্যেই তাদের পাওয়ার মূল্য হলো অপরিসীম। জীবন-ভোর অপরিম্লান রইল তাদের পাওনা-দেনার আকুতি। এরই নাম প্রেম। উনিশ বছর আগে প্রথম মিলনরাতে যেমন, ঠিক তেমন উনিশ বছর পরে মৃত্যুমুখর বিপন্ন সায়াহ্নে।
একটি আশ্চর্য দৃশ্য সাজিয়েছেন হোমার। মেনিলাওসের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ঠিক পরবর্তী দৃশ্য। সেই দৃশ্যে প্যারিস আর হেলেন—আর কেউ নেই। প্যারিসের প্রতি মহাকবির তীব্র ঘৃণা আর নিষ্ঠুর শ্লেষ সে দৃশ্যের রূঢ় পটভূমি।
প্যারিসের মতো কাপুরুষ দ্বিতীয় আছে নাক? তাই তো সে অস্ত্র ফেলে প্রাণভয়ে পালায়, নগরবাসীর দৃষ্টি থেকে মুখ লুকিয়ে আত্ম-গোপন করে শোবার ঘরে। এমনি কাপুরুষতা দেখে হেলেনেরও ঘেন্না ধরে গেছে। মুখ ফিরিয়ে গঞ্জনা দিচ্ছে—
হেরে গেলে, পালিয়ে এলে?
লজ্জা বিশ্বজনের কাছে, কিন্তু হেলেনের কাছে লজ্জা নেই প্যারিসের। সে দু-হাত বাড়িয়ে জোর করে জড়িয়ে ধরেছে হেলেনকে। বিলোল স্বরে বলছে—
জিতব, জিতব। অনেক যুদ্ধ করব। জানো, একদিন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যে পালিয়ে আসে, আর একদিন যুদ্ধ করার জন্যেই সে বেঁচে থাকে।
হেলেন মুখ ঘুরিয়ে তীব্র কণ্ঠে বলে—
তাই নাকি?
কেন জানো না? স্বস্তির জন্যে নয়, শান্তির জন্যে নয়, যুদ্ধের জন্যেই তো বেঁচে আছি। এখন আর দেরি করো না। বিছানায় চলো!
বিছানায়? ছি ছি!

ছি ছি ? ছিছি কীসের ? মনে পড়িয়ে দেব সেই প্রথম দিনের কথা ? যেদিন গ্রীসের বন্দরে আমার জাহাজে তুমি উঠলে আর ক্র্যানি দ্বীপে সারাটা রাত আমরা এক সঙ্গে কাটালাম ! সে রাত্রে তোমাকে যতো ভালবেসেছিলাম ততো ভালো আজও তোমাকে বাসছি ! সেই একই তৃষ্ণায় এখনো আমার বুক ফাটছে ! তোমার ফাটছে না ? তাড়াতাড়ি করো—জীবনের ঘটে যেটুকু রস এখনো আছে, এসো আমরা একসঙ্গে পান করে নিই !

তারপর দিনের পর দিন—মৃত্যুর পর মৃত্যু। রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠে হেলেন বসে থাকে একলা। সেই প্রকোষ্ঠ ঘিরে ঘৃণার ঝঞ্ঝা আর শোকের বন্যা। হেকটর নেই—সারা ট্রয়ে বন্ধু বলতে একজনও নেই হেলেনের। কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না, তার ছায়াটুকু মাত্র দেখলে সবাই শিউরে ওঠে।

প্যারিস তখন কোথায় ? শত্রু মিত্র যখন তীব্র কটাক্ষ পর্যন্ত ফিরিয়ে নিয়েছে, তখন প্যারিস কী চোখে দেখছে হেলেনকে ?

সেই একই চোখে—যে চোখে উনিশ বছর আগে প্রথম তাকে দেখে-ছিল। স্পার্টার রাজসভার সেই ভূষণ-অলঙ্কারগর্বিতা রানীকে, ক্র্যানি দ্বীপের সেই নির্বসনা রতিকে।

প্যারিসের নেই বীরত্বের ভূষণ, হেলেন রূপহীনা। তারা পৃথিবীর প্রথম প্রেমিক-প্রেমিকা। সাগরতলের মুক্তাকে যে চোখে দেখে নি, সে কি মুক্তার দাম জানে ? পৃথিবী যে প্রেমকে চেনে না, সে প্রেমের কী মূল্য দেবে পৃথিবী ?

২৩

হোমার নির্লিপ্ত মহাকবি। তিনি ট্রোজান নন, এখিয়ান নন। অন্তত চার শতাব্দী পরেকার আইওনিয়ান।

তাই তিনি গ্রীক-ট্রোজানদের শক্তি সম্পদ বীরত্ব আর দুর্ভাগ্যকে নিরপেক্ষ তুলাদণ্ডে বিচার করেছেন দেবরাজ জুপিটারের মতোই। সমান রঙ আর রেখায় গ্রীক-ট্রোজান চরিত্র এঁকেছেন। বরং পরাজিতের প্রতিই তাঁর বেশি মমতা।

প্রায়ামের আন্তরিক রাজসিকতার পরিচয় তিনি অকৃপণ ঔদার্যে দিয়েছেন। বীর্যের সঙ্গে ক্ষমা, কর্তব্যের সঙ্গে মানবিকতা, পৌরুষের সঙ্গে স্নেহের এক অপূর্ব সমন্বয়ে তিনি হেকটর চরিত্রের মর্মোদ্‌ঘাটন করেছেন। পতিপ্রাণা অ্যানড্রোম্যাকি আর পুত্রহারা হেকিউবার চোখের জলে নিজের অশ্রু মিশিয়েছেন। কিন্তু প্যারিসের চরিত্র বর্ণনায় তাঁর লেখনী শুধু কলঙ্ক উদ্গার করেছে—কামুক, কাপুরুষ—প্যারিসের জন্যে এই তাঁর দুটি মাত্র বিশেষণ।

প্যারিস এক মহৎ গৌরবের অধিকারী। সে কথা হোমার বলেন নি। সেই গৌরব-ঘটনার আগেই তাঁর মহাকাব্য শেষ হয়েছে। বীরশ্রেষ্ঠ অ্যাকিলিসকে মারল কে? মারল ঐ কাপুরুষ প্যারিস।

অ্যাকিলিসকে বধ করবার ক্ষমতা কারুর ছিল না। দৈব বরে তার দেহ ছিল পাথরের মতো দুর্ভেদ্য—তার ওপর তার গায়ে ছিল দেব-দুর্লভ বর্ম। কতো যুদ্ধ সে করেছে, কতো মৃত্যু সে হেনেছে—তার গায়ে আঁচড়টি লাগাতে পারে নি কেউ। সেই অসাধ্য সাধন প্যারিস করল।

যুদ্ধ বলতে বীরের সঙ্গে বীরের সম্মুখযুদ্ধ। সে যুদ্ধে প্যারিস অপারগ। শিশুকাল থেকে অরণ্যে ঘুরে ঘুরে একটি বিদ্যাই সে আয়ত্ত করেছে। ধনুর্বিদ্যায় সে অপরাজেয়। তার মতো তীরন্দাজ কেউ নেই।
মাথা থেকে পা পর্যন্ত অ্যাকিলিসের বর্মে মোড়া। সে বর্মে হেকটরের ভল্লও চিড় ধরাতে পারে নি। কিন্তু পায়ের গোড়ালিটা খোলা। সেখানে কোনো ধাতব আবরণ নেই।
অব্যর্থলক্ষ্য প্যারিস একদিন অ্যাকিলিসকে তার তীরের পাল্লার মধ্যে পেল। প্রাচীরের পেছনে দাঁড়িয়ে একটি মাত্র তীর সে ছুড়ল অ্যাকিলিসের গোড়ালি লক্ষ্য করে। তীরের সেই মর্মান্তিক আঘাতে অ্যাকিলিস পড়ল, আর উঠল না। ভবিষ্যৎবাণী এমনি করে ফলল তার ভাগ্যে।
দুপক্ষের তীরন্দাজরা অনেক তীর ছুড়েছে, প্যারিস একটি তীরে অ্যাকিলিসের মতো মহাবীরকে বধ করল। প্যারিসের এই কৃতিত্ব অতুলনীয়। কিন্তু এই গৌরব কাপুরুষ প্যারিসকে দিতে পুরাণকারদের বেধেছে। কেউ বলেছেন—ও তীর তো প্যারিস ছোঁড়ে নি, ছুঁড়েছেন অ্যাপোলোদেব স্বয়ং। প্যারিসকে হেয় করবার আগ্রহে অ্যাকিলিসকে হেয় করতেও বাধে নি—তাই কেউ আবার বলেছেন প্রায়ামের সুন্দরী কন্যা পলিকসেনার লোভ দেখিয়ে ওরা অ্যাকিলিসকে প্রাসাদের মধ্যে ডেকে নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে হত্যা করেছে। আর মহাকবি ওভিড ঘটনাকে স্বীকার করেও তীব্র খেদের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন—হায়, হায়, এর চেয়ে দুঃখের ব্যাপার আর কী আছে? বীরশ্রেষ্ঠ অ্যাকিলিস, অপরাজেয় অ্যাকিলিস—সে কিনা পরাস্ত হলো একটা হীন কাপুরুষের হাতে, একটা নীচ পরস্ত্রীহরণকারীর হাতে! ছি ছি! এর চেয়ে একটা অ্যামাজন নারীসেনার হাতে তার মৃত্যু হলো না কেন?
প্যারিস বীরযুগের মূর্তিমান অসম্মান। কিন্তু মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠ বীরের হন্তারক। শত্রুনিপাতের সফলতম নায়ক সে। এ সম্মানটুকু কেউ

তাকে ছায় নি।

শুধু তাকে কাছে ডেকে আশীর্বাদ করলেন বৃদ্ধ রাজা প্রায়াম। সেই শোকলাঞ্ছিত অপমানের কথা তিনি স্মরণ করলেন। এই তো কদিন আগেকার কথা—হেকটরের ধূলিমলিন গলিত মৃতদেহটাকে ফিরে পাবার জন্যে ঐ অ্যাকিলিসের পা ধরে কতো কান্না তিনি কেঁদেছিলেন! তারপর প্রায়ামের আশীর্বাদ মাথায় নিয়েই প্যারিস ছুটল হেলেনের কক্ষে।

হেলেন, হেলেন, দরজা খোলো, দেখাও তোমার মুখ! ছাখো, হেকটরের মৃত্যুর শোধ নিয়ে আমি এসেছি!

মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে মাথা বাঁচিয়ে হেলেনের দ্বারে একদিন পালিয়ে এসেছিল প্যারিস। আর একদিন এসেছিল বিরাট এক মৃত্যুর হোতা হয়ে।

শেষদিন এলো মৃত্যুকে বুকে নিয়ে।

অ্যাকিলিসের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্যে গ্রাকবীররা হন্যে হয়ে ঘুরছে। কিন্তু প্যারিসকে তারা কিছুতেই ধরতে পারছে না। প্যারিস সম্মুখযোদ্ধা নয়—সে যুদ্ধক্ষেত্রে সামনা সামনি আসে না। তাকে ধরা যায় না, মারা যায় না। বীরেরা যখন বর্শা ছোড়ে, তলোয়ার ঘোরায়, তখন সে দূরে দূরে পা ফেলে, তক্কে তক্কে থাকে। দূর থেকে ধনুকের ছিলায় বাণ লাগায় আর নির্ভুল লক্ষ্যে একটি একটি শত্রুসৈন্যকে ঘায়েল করে—যেমন করেছে অ্যাকিলিসকে। তার অস্ত্রেই তাকে মারতে হবে, তা ছাড়া উপায় নেই।

সেই অস্ত্র আছে ফিলকটিটিসের হাতে। মহাবীর হারকিউলিসের ধনুর্বাণ, যা তিনি মৃত্যুর আগে ফিলকটিটিসকে দিয়ে যান।

তারপর একদিন মধ্য গগনে যখন সূর্য, দ্বিপ্রহরের খররোদে প্যারিসের

উষ্ণীষ যখন জ্বলজ্বল করছে তখন দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়ল ফিলকটিটিস। একটি তীরে যদি কাবু না হয়—তাই তীরের পর তীর। প্রথম তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, দ্বিতীয় তীর বিঁধল ডান চোখে, তৃতীয়টা লাগল বাঁ হাতে, আর চতুর্থ তীর ঢুকে গেল গোড়ালির মধ্যে। ঠিক অ্যাকিলিসের পায়ে প্যারিসের তীর যেখানে বিঁধেছিল সেইখানে।

পর পর তিনটি তীরের মারাত্মক আঘাত—তবু প্যারিস রণক্ষেত্রে লুটিয়ে পড়ল না। নিজের হাতে নিজের গা থেকে তীরগুলো সে টেনে টেনে খুলল। তারপর রক্তাক্ত দেহে টলতে টলতে প্রাচীরদ্বার পার হয়ে প্রাসাদের মধ্যে ঢুকল।

একদিকে হর্ষের হুহুংকার, অন্যদিকে আশঙ্কার আর্তনাদ! কোনো কিছু কানে এলো না প্যারিসের। শুধু শুনল দেবী ভিনাসের প্রথম দিনের আশীর্বাদ। কানে এলো হেলেনের প্রথম দিনের কথা—

কেড়ো না কিছু আমার কাছ থেকে! শুধু আমাকে দাও!

ঐ তো অদূরে মুক্তদ্বার কক্ষ। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে হেলেন। দুহাত বাড়িয়ে যেন বলছে—

আমার বুকে এস প্যারিস! আমাকে দাও!

অনেক পথ পার হয়ে এসেছে রক্তমাখা দেহে। অন্ধ চোখের ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে ভিজিয়ে দিয়েছে সারা বুক। ভাঙা হাতে তীর ধনুক আর নেই। শ্লথ খঞ্জ পায়ে অনেক হেঁটেছে। পৌঁছেছে বাঞ্ছিত আশ্রয়ে। হেলেনের কাছে।

বাসনাব্যাকুল প্রতিটি হৃৎস্পন্দন সে দিয়েছে হেলেনকে এতোদিন—আর বাকি কি আছে দেবার?

লুটিয়ে পড়ল প্যারিস।

হেলেন হেলেন! তোমাকে দিতে এসেছি হেলেন! প্রেম তোমাকে দিয়েছি, জীবন তোমাকে দিয়েছি—এবার দিতে এসেছি আমার মৃত্যু!

বলো, আমাকে তুমি কি দেবে !

এই মৃত্যুই হেলেনের হাতে প্যারিসের শ্রেষ্ঠ দান। এই মৃত্যুই তার প্রেমের পরম প্রতিদান। মহাযুদ্ধ তো বিপুল মৃত্যুর বাহক, কিন্তু প্যারিসের মতো এমন মরণ কেউ মরে নি। এই মৃত্যুর জন্যে শত্রুকে ধন্যবাদ, মিত্রকে ধন্যবাদ, দেবতাদের ধন্যবাদ।

পুরাণের সেই মহাবীরদের আবার স্মরণ করি—তাদের মৃত্যুর কথা ভাবি। সেই পার্সিউস, জেসন, হারকিউলিস আর থেসিউস। অতর্কিত আক্রমণে গগনবিজয়ী পার্সিউসকে হত্যা করে এক হীন আততায়ী। পত্নীহারা সংসারহারা জেসন বদ্ধ বয়সে বসে থাকতেন সমুদ্রতীরে, সেই পুরোনো আর্গো জাহাজের পাশে একা চুপটি করে। একদিন সেই জাহাজেরই পাঠাতনের একটা কাঠ ভেঙে পড়ে তার মাথায়। সেই আকস্মিক আঘাতে তাঁর নিঃসঙ্গ মৃত্যু। হারকিউলিসের স্ত্রী হিংসার জ্বালায় এক বিষমাখানো পোশাক উপহার দিয়েছিল স্বামীকে। সারা গায়ে বিষের জ্বালায় ছটফটিয়ে মরেছিলেন হারকিউলিস। আর আত্মীয়বন্ধুহীন দূর বিদেশে নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতায় অপঘাতে নিহত হয়েছিলেন থেসিউস। কারুরই মৃত্যুর সময় এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবার মতো একটি প্রি জন ছিল না পাশে।

এই ট্রয় যুদ্ধে শত শত লোক মরেছে। বছরের পর বছর ধরে বালুকা-বেলায় মুখ থুবড়ে মরেছে তারা। গ্রাকদের আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কেউ নেই পাশে। অপরিচিত বিদেশের নিষ্ঠুর পরিবেশে তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। যুদ্ধসঙ্গীরা কিছু দেহ দাহ করেছে, কিছু ফেলেছে পরিখার গর্ভে আর বাকি ভেসে গেছে স্ক্যামাণ্ডারের জলে। আর ট্রোজানরা যারা মরেছে, আত্মীয়রা তাদের সন্তর্পণে কুড়িয়ে এনেছে যুদ্ধবেলা থেকে—মুখে বড়ো জোর আগুনটুকু জুটেছে নিষ্প্রাণ দেহগুলির।

প্যাট্রোক্লস আর অ্যাকিলিসের মরদেহ সমারোহের সঙ্গে দাহ হয়েছে।

কিন্তু তাদের জন্যে কে কেঁদেছে শোকের কান্না ? হেকটরের স্নেহশীল চোখ বুঁজবার আগে কোনো প্রিয় মুখ দেখে নি। হত্যাকারীর রক্ত চক্ষুর দিকে তাকিয়ে নিবেছে তার মরণাহত দৃষ্টি।
সবচেয়ে নৃশংস মৃত্যু গ্রীক অধিনায়ক অ্যাগামেমননের। যুদ্ধে জিতে রণতরীতে সুন্দরী বন্দিনীর ঝাঁক তুলে তিনি নিরাপদে পৌঁছেছেন নিজের দেশে। আর প্রাসাদের মধ্যে পা দিতে না দিতেই বুকে ছুরি বসিয়ে তাকে হত্যা করেছে তাঁর বিশ্বাসঘাতিনী ব্যাভিচারিণী স্ত্রী।
প্যারিস বীর নয়, তাই বীরের মৃত্যু তার ভাগ্যে নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে সে মরে নি। প্যারিস ব্যাভিচারী নয়, তাই ঘরের দুয়ারে তার অপঘাত মৃত্যু হয় নি। প্যারিস মরেছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ঘরে ফিরে, ঘরের আশ্রয়ে। গ্রীকরা ঘৃণা করে, ট্রোজানরা ছায়া দেখলে সরে যায়।—কেই বোঝে না হেলেনকে, কেবল প্যারিস ছাড়া। কেউ ভালবাসেনা হেলেনকে, কেবল প্যারিস ছাড়া। কেউ ছাখেনা হেলেনের মুখ, কেবল প্যারিস ছাড়া।
সেই হেলেনের কাছে মরবার জন্যে প্যারিস ফিরে এসেছে। হেলেনের মুখের দিকে মৃত্যুধূসর দৃষ্টি রেখে ফাউস্টের ভাষায় ম্লান অনুরণনে বলছে—

কালের কৃষ্ণ অবগুণ্ঠন আমি খুলেছি,
দেখেছি হেলেনের মুখ।
যে মুখের জন্যে সহস্র রণতরী ভাসল সাগরে,
দগ্ধ হলো ট্রয়ের উত্তুঙ্গ টাওয়ার।
মদিরময়ী হেলেন,
সেই মুখ আমার মুখে তুমি নামাও।
তোমার দুটি ওষ্ঠের মাঝখানে
আমার আত্মার আশ্রয়,
আয়ুর পরিপূর্ণতা।

রাখো চোখ আমার চোখে,
ছাখো আমি তোমার সেই প্যারিস।
আমার উষ্ণীষ আমি রাঙিয়েছি তোমার রঙে,—
মেনিলাওসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি,
অ্যাকিলিসের গোড়ালিতে হেনেছি
অমোঘ আঘাত।
এবার মৃত্যুর উপহার নিয়ে
ফিরে এসেছি তোমার অধরোষ্ঠের দ্বারে।
কথা রাখো,
মৃত্যূত্তীর্ণ করো একটি চুম্বনে।

হোমার বর্ণিত বীর যুগ কবে শেষ হয়েছে। কবে মুছে গেছে মাই-কেনিয়ান সভ্যতা, বিশ্বমানুষের তরঙ্গে কোথায় মিশে গেছে এখিয়ান জাতি। কিন্তু সেই সমাজ এখনো আছে। পুরুষপ্রধান সমাজ, পুরুষ-বাঞ্ছিত রীতিনীতি। পুরুষরা বীর না হলেও বীরপুরুষ। এ সমাজেও নারী শয্যার সঙ্গিনী, সংসারের সঙ্গিনী—আত্মার সঙ্গিনী নয়। জায়া, মাতা, কন্যা—জীবনরঙ্গিনী নয়। তাই এ যুগের সমাজ প্যারিসের ভাগ্যকে হেয় করে, পুরুষের লাম্পট্য দেখে মুচকি হাসে, দল বেঁধে যুদ্ধ-করবার বীরত্ব না থাকলেও সভা ডেকে হেলেনের অসতীপনার শাস্তি-বিধান ছায়।

কিন্তু তিন হাজার বছর আগেকার প্যারিস ছিল অনন্য—অনন্য যেমন আজও। সে যুগের নিরিখে সে বীর নয়, এ যুগের নিরিখে সে বীর-পুরুষ নয়।

প্যারিস ছিল মানুষ। মানুষের নিভৃত মনের চিরন্তন যে আকুতি, সেই আকুতিকে সে প্রকাশ করেছিল। প্রেমের আকুতি। মানুষ মানুষের কাছেই প্রেম চায়—সেই প্রেমই তার মাথায় পরিয়েছিল মনুষ্যত্বের

গৌরব-মুকুট। হেলেনের প্রেম ভুবন-জোড়া সাম্রাজ্যের গরিমা আর বিশ্ববিজয়ী বীরখ্যাতির চেয়ে বড়ো।

যে যুগের ওরা জন্মেছিল সে যুগে পুরুষের ভাগ্য রক্তক্ষরণ—নিজের, না হয় অপরের। নারীর ভাগ্য বন্ধন—বাহুর, না হয় শৃঙ্খলের। সে যুগে দুটি মাত্র ঋতু—বীর্যের খরগ্রীষ্ম না হয় ব্যর্থতার তুহিন রাত।

প্রকৃতির সেই নিদারুণ নিষ্ঠুরতায় আত্মার সেই নিরাশ নিঃসঙ্গতায় সমাজের সেই ঊষর মরুতে একটি আশ্চর্য শতদল ফুটেছিল। আকাশে ছড়িয়েছিল তার অদৃষ্টপূর্ব সুবর্ণজ্যোতি, বাতাস ভবেছিল অনাস্বাদিত-পূর্ব আঘ্রাণে।

হেলেন আর প্যারিসের প্রেম।

সেই শতদল মুদিত হলো, প্যারিস মরল।

২৪

প্যারিসের মৃত্যুতেও ট্রয় যুদ্ধের শেষ হলো না। দুপক্ষের মহাবীর নিহত, আসল অপরাধী প্যারিসও নিহত, কিন্তু সন্ধির কোনো সম্ভাবনা নেই, নেই আশার ছলনা।

যুদ্ধ চলল।

ট্রোজানরা বুঝল গ্রীকদের তাড়াবার আর কোনো উপায় নেই। যতো দিন সম্ভব প্রাচীরের পেছনে আত্মগোপন করে থাকতে হবে আর নিঃশক্ত নিরুপায় হয়েও মাঝে মাঝে শক্রর ওপর হানা দিতে হবে। গ্রীকরা বুঝল, ঐ দুর্মদ প্রাচীরে বাইরে থেকে ফাটল ধরাবার কোনো উপায় নেই, যতোদিনে হোক যেভাবে হোক খোলা তোরণদ্বার পার হয়েই তাদের নগরের মধ্যে ঢুকতে হবে।

দুপক্ষই বুঝল—সন্ধির আর কোনো আশা নেই। হেলেনই এই যুদ্ধের কারণ—কিন্তু বছরের পর বছর ধরে অসংখ্য মানুষের রক্তস্রোতে সে কারণ ভেসে গেছে। এখন হেলেনকে ফেরত দিলেও যুদ্ধ থামবে না, হেলেনের সঙ্গে শত উপঢৌকন দিলেও শান্তি আসবে না। এতো মৃত্যু আর এতো ধ্বংসের পর চরম মৃত্যু আর চরম ধ্বংসই শুধু শান্তি আনবে। জয়পরাজয় মরীচিকা হলেও ঐ মরীচিকাকে মুষ্টিগত না করে উপায় নেই।

ট্রয়ের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল বিভীষণের অভাবে। লঙ্কাকে রক্ষা করেছিল বিভীষণ। ট্রয়কে রক্ষা করবে কে?

বিভীষণ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। একই গর্ভের দুই সন্তান। তবে চরিত্রে ব্যবহারে দুই ভাই সম্পূর্ণ বিপরীত। যেহেতু রাবণ অধার্মিক, বিভীষণ

ধর্মাত্মা। যেহেতু রাবণ দুশ্চরিত্র, বিভীষণ মহা চরিত্রবান। যেহেতু রাবণ রাজা, বিভীষণ রাজ্যাভিলাষী। যেহেতু রাবণের শত্রু রাম, অতএব রাম বিভীষণের মিত্র।

ধার্মিক বিভীষণ সর্বসমক্ষে রাবণকে বারে বারে অবহিত করেছে সীতা-হরণের কুফল সম্পর্কে—রামের সঙ্গে সন্ধি করতে রাবণকে অনুনয় করেছে। রাবণ তার কথায় কর্ণপাত না করায় ধর্মের অনুশাসন মেনে সে লঙ্কাপুরী ত্যাগ করে গেছে।

কোথায়? বনবাসে নয়, ত্রিকূট পর্বতে গুহাশ্রয়ী সন্ন্যাসী হতে নয়—সমুদ্রের অপর পারে, রামের শিবিরে। রাম লঙ্কা আক্রমণ করবেন, বিভীষণ তাঁকে মদত দেবে। অধার্মিক রাবণকে উচিত সায়েস্তা করে সীতা-উদ্ধারের আগ্রহে বিভীষণ গ্রাহ্যও করেনি যে ঐ রাবণের হাতেই সে তার পতিব্রতা স্ত্রীকে ফেলে এসেছে।

বুঝতে অসুবিধা নেই যে উদ্দেশ্য অন্য। বিভীষণের আদর্শ রাবণ নয়, নয়, রামও নয়—সুগ্রীব। তবে কিনা সুগ্রীবের চেয়ে বিভীষণ অনেক করিৎকর্মা। রাম তাকে সন্ধান করেননি। নিজেই সে উপযাচক।

বিশ্বাসঘাতকতার বিনিময়ে রামের কাছ থেকে লঙ্কার সিংহাসনলাভের প্রতিশ্রুতি আদায় করতে কালবিলম্ব করেনি বিভীষণ। লঙ্কাযুদ্ধ শুরু হবার আগেই রাম তাকে রাক্ষসরাজ পদে অভিষিক্ত করেছেন। বিনিময়ে ঐ ঘরশত্রুর কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছেন তার কোনো তুলনা নেই। বিভীষণই তাঁকে সেতুর সাহায্যে সমুদ্রপারের উপদেশ দিয়েছে, রাবণের গুপ্তচরদের ধরিয়ে দিয়েছে, নিজে রামের গুপ্তচর হয়ে রাক্ষসসৈন্য দেখিয়ে দিয়েছে, রামের পাশে দাঁড়িয়ে সর্বদা তাঁকে লঙ্কাজয়ে উৎসাহিত করেছে।

রাজ্যলোভী বিভীষণের সবচেয়ে ঈর্ষা ইন্দ্রজিতের ওপর। সে জানে রাবণের উত্তরাধিকারী ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্রজিৎ বেঁচে থাকলে তার সিংহাসনের আশা নেই। তাই আগে ইন্দ্রজিতকে মারতে হবে। ইন্দ্রজিতের আঘাতে

আঘাতে রামলক্ষ্মণ যখন মৃতপ্রায়, তখন ককিয়ে উঠেছে বিভীষণ—

হায় হায়, যাদের ওপর ভরসা করে আমি গদীর খোয়াব দেখেছিলাম, তারাই যে খতম হতে চলল !

রতনই রতন চেনে। এক রতনের পিঠে আর এক রতন হাত বোলায়। সুগ্রীব তাই বিভীষণকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে—

রামলক্ষ্মণ আছেন, মরেননি। ভয় কি তোমার ? আমি বলছি শোনো, আমি যেমন কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসেছি লঙ্কার সিংহাসনে তুমিও তেমনি নির্ঘাত বসবেই !

আবার ইন্দ্রজিতের কৌশলে মায়াসীতা দেখে রাম যখন মুহ্যমান, তখন চতুর বিভীষণই তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলেছে—

ঘাবড়াবেন না প্রভু—ওটা ম্যাজিক, সত্যি নয় !

বিভীষণ রামলক্ষ্মণকে জানিয়েছে ইন্দ্রজিতের শত্রুঞ্জয় শক্তির উৎস। যুদ্ধযাত্রার আগে ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা গুহায় যায়। সেখানে আছে তার যজ্ঞাগার। যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে সে যুদ্ধে যায়—তাই সে অজেয়। অতএব যজ্ঞ সম্পূর্ণ করবার আগেই তাকে বিনাশ করা চাই।

তাই লক্ষ্মণকে পথ দেখিয়ে নিকুম্ভিলায় নিয়ে এসেছে বিভীষণ, সঙ্গে সৈন্যদল। যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিৎ, দ্বারে রাক্ষস সৈন্যদের পাহারা। তাই দেখে বিভীষণ লক্ষ্মণকে উপদেশ দিচ্ছে—

এখনই তুমুল যুদ্ধ শুরু করো, তাহলে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ রেখেই ইন্দ্রজিৎ বেরিয়ে আসবে।

তাই হলো। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞাগার থেকে দ্রুত বার হয়ে এল। বিভীষণকে দেখেই ইন্দ্রজিৎ বুঝতে পারল চক্রান্ত কার। যজ্ঞ তার সম্পূর্ণ হয়নি, অজেয় সে নয়। সামনে কৃতান্তরূপী লক্ষ্মণ। তার ঘৃণা সমর্থ শত্রু লক্ষ্মণের প্রতি নয়, নিজের বিশ্বাসঘাতক পিতৃব্যের প্রতি। মধুসূদন দত্তের কটি বিস্ফোরিত পংক্তিতে সেই ঘৃণা সে বিভীষণের মুখের ওপর ছুড়ে মারল—

হায় তাত, উচিত কি তব
এ কাজ ? নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষোশ্রেষ্ঠ, শূলীশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ, ভ্রাতুষ্পুত্র বাসববিজয়ী।
নিজ গৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে ?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে ?

রাঘবের দাস বিভীষণ মেঘনাদের সেই ঘৃণাভরা বাক্যবাণ সহ্য করতে পারেনি। বাম সেনাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে মাথা নেড়ে বললে—
জানো বৎসগণ, এই ইন্দ্রজিৎ আমার পুত্রতুল্য। কিন্তু রামের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আমি মনকে পাথর করে তার বধের ব্যবস্থা করছি।
অপ্রস্তুত ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের হাতে মরল। উদ্দেশ্য সাধন হলো। শুধু রামের নয়, লক্ষ্মণের নয়, বিভীষণেরও। পথের কাঁটা দূর হলো।
রাবণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিভীষণের চতুর বুদ্ধি শ্যাম কুল দুই-ই বজায় রেখেছে। একদিকে সে লঙ্কাবাসীকে শুনিয়ে শুনিয়ে প্রবল-প্রতাপ খ্যাতনামা মহাবীর মহানীতিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্যে সরবে বিলাপ করেছে, আর একদিকে করজোড়ে রামকে বলেছে—
ঐ পরস্ত্রীপীড়ক দুষ্কৃতিপরায়ণ অধর্মাচারীর দেহের সৎকার আমি করব ? এমনি ঘৃণিত কাজ করতে আমাকে হুকুম দেবেন না প্রভু !
রামের নির্দেশে বিভীষণ বাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনে রাজি হয়েছে। রামও কথা রেখেছেন। রাবণের মৃতদেহ চিতায় ভস্মীভূত হতে না হতেই বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসিয়ে তার মাথায় পরিয়ে দিয়েছেন রাবণের রাজমুকুট।
বিভীষণের চরিত্রচিত্রকে সম্পূর্ণ করতে আরো কিছু বাকি ছিল। বাল্মীকি দ্বিধা করলেও রামায়ণের পরবর্তী কবিরা সংগতি রেখেছেন। কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ সুগ্রীবের মতো লঙ্কারাজ বিভীষণও সদ্যবিধবা ভ্রাতৃবধূকে রাজ-পালঙ্কে তুলতে দেরি করে নি।

রাম বিভীষণকে শুধু রাজ্যই দেন নি, দিয়েছিলেন চিরঞ্জীব হবার বর। ঠিকই বর। আজ রাম নেই, রাবণও নেই, রামের সে অযোধ্যা নেই, রাবণের সে লঙ্কাও নেই। কিন্তু ঘরশত্রু বিভীষণ আছে। অক্ষয় অমর অবিনশ্বর এই চরিত্র।

গ্রীক সেনাপতি অ্যাগামেমনন ঘোষণা করেছিলেন—
ট্রয়কে গুঁড়িয়ে দেব, পুড়িয়ে দেব, নিশ্চিহ্ন করে দেব।
বিভীষণ-বুদ্ধির যদি ছিটেফোঁটাও থাকত তাহলে অ্যাগামেমননের এ ঘোষণা টিঁকত না। ট্রয়কে রাখতে পারত ঈনিয়াস—ট্রোজানরা যাকে রাজপুত্র বলে সম্মান করত।
ঈনিয়াস ট্রয়ের অধিবাসী, ট্রয় নগরে তার নিজস্ব প্রাসাদ, কিন্তু প্রায়াম তার পিতা নন, হেকটর-প্যারিসের মার সন্তান সে নয়।
ঈনিয়াসের পিতা অ্যাঙ্কাইসেস, সম্পর্কে প্রায়ামের ছোট ভাই। ট্রয়ের দক্ষিণ-পুবে স্ক্যামাণ্ডারের পারে ডার্ডানিয়া রাজ্যের রাজা। দেবীগর্ভ-সম্ভূত সে, মা তার দেবী ভিনাস।
অ্যাঙ্কাইসেস অকালে পঙ্গু হয়ে যান। ডার্ডানিয়া রাজ্যকে প্রায়ামের শাসনাধীনে দিয়ে পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ট্রয়ে বসবাস শুরু করেন। ঈনিয়াস রাজপুত্র হলেও রাজা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই তার। ট্রয়ের রাজশাসনে ডার্ডানিয়ার কোনো আলাদা অস্তিত্ব নেই।
ঈনিয়াস রাজপুত্র আর এক কারণে—রাজা প্রায়াম তাকে নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসেন। হেকটর প্রমুখ অন্য রাজপুত্রদের সঙ্গে একই শিক্ষাদীক্ষায় একই সম্মানে সে বড়ো হয়েছে। শুধু বড়োই হয় নি—হেকটরের মতোই বীর হয়েছে।
হেকটরের মতো ঈনিয়াসও বিবাহিত। হেকটরের মতোই সে তার স্ত্রীকে ভালোবাসে। অশক্ত পিতা অ্যাঙ্কাইসেস তার পরমপূজনীয়। প্যারিস যখন নৌবহর সাজিয়ে গ্রীসে যায় তখন ঈনিয়াসও তার সঙ্গে

ছিল। তবে প্যারিসের অভিপ্রায় তার জানা ছিল না। প্যারিস যখন স্পার্টার রানী হেলেনকে জাহাজে তুলল তখন সে চমকে উঠেছিল। হেলেন-হরণে তার সমর্থন ছিল না, তাই বলে বন্ধুকে সে বিদেশে পরিত্যাগ করেনি, একই জাহাজে দেশে ফিরেছিল।

পরস্ত্রীকে ফুসলিয়ে এনে নিজের ঘরে নিজের স্ত্রী করে রাখবে, প্যারিসের এ ব্যবহারে ঈনিয়াসের মন সায় ছ্যায় নি। তবু যে আনন্দ-উৎসব করে ট্রয়ের রাজ-পরিবার হেলেনকে বরণ করে নিয়েছিল তাতে তার বলার কিছু ছিল না।

সম্মানজনক সন্ধিব মাধ্যমে গ্রীকদের হাতে হেলেনকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক—এ মত ঈনিয়াস গোপন রাখে নি। প্রথম দিকে গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও সে নামেনি। নিরপেক্ষ নির্লিপ্ত হয়েই থাকতে চেয়েছে।

কিন্তু এতো শুধু নারী নিয়ে দুই পুরুষের কাড়াকাড়ি নয়, রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ, এক দেশের নিরীহ অধিবাসীদের বুকে অন্য দেশের সৈন্যদের নৃশংস হানাদারি। গ্রীকবা যখন তীর আর প্রান্তরের জনপদগুলি ছারখার করতে লাগল তখন ঈনিয়াস আর স্থির থাকতে পারল না। যুদ্ধসাজ পরল, হাতে নিল অস্ত্র, ঝাঁপিয়ে পড়ল যুদ্ধে।

হেকটরের মতো বীর, হেকটরের মতো দেশপ্রেমিক। তেমনি পারদর্শী তেমনি অকুতোভয়। অগণিত শত্রুসৈন্যকে হতাহত করে, গ্রীক বীরদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়ে যায়। অনেক যুদ্ধ ঈনিয়াস করেছে, তবু ভাগ্যের আশীর্বাদে অক্ষত আছ তার শরীর।

হেকটর মরেছে, প্যারিস মরেছে—প্রায়ামের পঞ্চাশজন পুত্রের মধ্যে দুর্বল অপদার্থ কটি ছাড়া মরতে আর কেউ বাকি নেই। মুষ্টিমেয় সৈন্য-সংখ্যা—সিংহদ্বার খুলে সম্মুখযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মনোবল ট্রোজান বাহিনীর আর নেই। বৃদ্ধ রাজা প্রায়াম আর তোরণশীর্ষে উঠে যুদ্ধ দেখেন না, প্রাসাদে বসে শুধু চরম দুর্গতির কথা ভাবেন—পাশে শোক-বিহ্বলা রানী। শোকার্ত ভয়ার্ত প্রজারা শেষের দিন গোনে—ভরসা শুধু

ট্রয়ের প্রাচীর। এতো দুর্গতি, এতো ভয় আর এতো শোকের যে কারণ, ট্রয়ের প্রাচীরের আড়ালে সেও আছে। তার রুদ্ধদ্বার নির্জন প্রাসাদের কক্ষে নিঃসঙ্গ হয়ে।

ঐ হেলেন।

আর আছে ঈনিয়াস, ট্রয়ের শেষ বীর।

হেলেনকে কী চোখে দেখেছে ঈনিয়াস? হোমার সে কথা জানান নি। হেলেনের সঙ্গে ঈনিয়াসের সাক্ষাতকারের কোনো বিবরণ উল্লেখ নেই ইলিয়াডে।

তবে হেলেনকে নিশ্চয়ই সে দেখেছে ট্রয়ের চরম রাত্রিতে। তখন রাজা নিহত, রানীর পায়ে শৃঙ্খল, ট্রয়ের পথঘাট ভেসে যাচ্ছে রক্তে। প্রতি গৃহের চূড়ায় চূড়ায় জ্বলছে আগুন। ভাগ্যের বরে সেদিনও ঈনিয়াসের গায়ে আঁচড়টি লাগেনি। নিরুপায় প্রতিরোধের তাড়নায় সে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তাকে ধরবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে গ্রীক ঠ্যাঙাড়ের দল।

এমনি সময় এক মুহূর্তের জন্যে সে হেলেনকে দেখেছে। সর্বনাশী পাপীয়সী এককোণে চুপটি করে বসে আছে, কুণ্ডলীপাকানো কাল-নাগিনীর মতো। প্রচণ্ড ঘৃণায় পেছন থেকে তার মাথায় তরবারি তুলেই নিজেকে সংযত করেছে ঈনিয়াস। এই দৃশ্য সাজিয়েছেন ভার্জিল তার ঈনিড মহাকাব্যে।

সেই চরম সর্বনাশের ক্ষণ যতোদিন আসেনি ট্রয়ের অতিসন্ত্রস্ত জনতা ঈনিয়াসের দিকেই তাকিয়ে আছে ততোক্ষণ। যদি কেউ তাদের বাঁচায়, ঈনিয়াসই বাঁচাবে। সেই তো শেষ বীর, শেষ নায়ক। তার কি কোনো দায়িত্ব নেই? আসন্ন সর্বনাশকে পরিহার করবার জন্যে ঈনিয়াসের কি কোনো কর্তব্য নেই?

আছে বৈকি কর্তব্য—পারলে ঈনিয়াসই পারে। ভরসা শুধু ট্রয়ের দুর্ভেদ্য প্রাচীর আর ভরসা দুর্ভেদ্যমনা ঈনিয়াস। ঈনিয়াসের মনে যদি একটু

চিড় ধরে তাহলে ট্রয় বাঁচবে, ট্রয়ের প্রাচীর বাঁচবে। কিন্তু চিঁড় ধরেনি।
হেলেন-হরণের অন্যায়কে গোড়া থেকে অপছন্দ করলেও যুদ্ধে সে পিছুপাও হয় নি। পাল্টা আঘাতই যে বহিঃশত্রুকে প্রতিহত করার একমাত্র উপায়, সেই বিশ্বাস থেকে টলে নি। যুদ্ধক্ষেত্রে কয়েকবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে দৈববলে পরিত্রাণ পেয়েও যুদ্ধ থেকে সে পিছু হটেনি।

কিন্তু এখন ? কোন্ বন্ধুকে পাশে নিয়ে সে যুদ্ধ করবে ? একলাই বা সে পরিচালনা করবে কোন্ বাহিনীকে ?

এখন ঈনিয়াসই পাবে গ্রীকদের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র বাঁধতে, ঐ কালনাগিনী হেলেনকে ফিরিয়ে দিয়ে গ্রীকদের সঙ্গে সন্ধি করতে। আর গ্রীক মিতালীর সর্ত হিসেবে মূঢ় বৃদ্ধ রাজা প্রায়ামকে সরিয়ে ট্রয়ের সিংহাসনে নিজের আধিপত্যকে কায়েম করে নিতে। তার চেয়ে যোগ্য প্রার্থী কে ? দশ বছরের যুদ্ধ আর নিশ্চিত সর্বনাশকে ন্যূনতম উপায়ে যে রোধ করতে পারে, তারই মাথায় তো রাজমুকুট, তারই নামে তো জয়জয়কার !

কিন্তু ঈনিয়াস পারল না। না পারল ট্রয়কে বাঁচাতে, না পারল রাজা হবার সুযোগ নিতে। প্রাচীরের এপারে নিষ্ফল বীর্য আর পুঞ্জীভূত ক্রোধযন্ত্রণা নিয়ে স্কীয়ান তোরণের ছায়ায় পাথরের মতো বসে রইল। একজোড়া নিরুপায় বদ্ধমুষ্ঠিতে বর্শা আর তলোয়ার।

শেষ দিন পর্যন্ত ঈনিয়াস বিভীষণ হতে পারল না।

মতলবটা এসেছিল ইউলিসিসের মাথায়। বুদ্ধিমান বলে তার খ্যাতি, চাতুর্যে তার জুড়ি নেই।

তার মতলব অনুসারে সমুদ্রতীরে বিরাট একটা কাঠের ঘোড়া বানালো গ্রীকরা। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কুঁদেকাটা সুন্দর কারুকার্য। পেটটা ফাঁপা। অস্ত্রে বর্মে সজ্জিত হয়ে কাঠের সেই ফাঁপা পেটের মধ্যে ঢুকল কুড়িজন বিখ্যাত যোদ্ধা—ইউলিসিস নিজে, তা ছাড়া মেনিলাওস, ডায়োমিডিস প্রভৃতি। তারপর সেই ঘোড়ার পেটটা বাইরে থেকে একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হলো। অ্যাগামেমননের নেতৃত্বে সমস্ত গ্রীক সৈন্য জাহাজে উঠল। ছেড়ে গেল ট্রয়ের সমুদ্রতীর।

পরদিন সকালবেলা প্রাচীরের মাথা থেকে ট্রোজানরা দেখল সমুদ্রতীর একেবারে ফাঁকা। একটি জাহাজ নেই, একটি শত্রুসৈন্য নেই। পরিত্যক্ত শিবিরে একটি যোদ্ধা নেই, একটি যুদ্ধাস্ত্র নেই। শুধু নির্জন বেলাভূমিতে বিশাল একটা কাঠের ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি মাত্র নিরস্ত্র লোক।

পিলপিল করে বার হয়ে এলো ট্রয়ের মানুষ। লোকটাকে ঘিরে ধরল।

কী ব্যাপার ?

ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে লোকটা বলল—সব চলে গেছে !

চলে গেছে ? তার মানে ?

হ্যাঁ। আর যুদ্ধ করবে না—যথেষ্ট হয়েছে। দেখছ না, সারা সমুদ্রতীরে আমাদের একটি সৈন্য নেই ! একটাও জাহাজ নেই !

সত্যি ? তা তুমি পড়ে রইলে কেন ? তুমি কে ?

আমি দূত। আমাকে শুধু রেখে গেছে খবরটা তোমাদের দেবার জন্যে।

বটে? তা এই ঢাউস কাঠের ঘোড়াটা কিসের জন্যে?

হাঁ হয়ে গেল দূত।

জানো না বুঝি? ওটা তো দেবী মিনার্ভার পায়ে আমাদের অর্ঘ্য! তোমাদের মিনার্ভা মন্দিরে যদি ওটা সাজিয়ে রাখো তা হলে সব দ্বন্দ্বের শান্তি, সব পাপের পরিত্রাণ। দেবীর আশীর্বাদে গ্রীকরাও ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরবে আর তোমরা ট্রোজানরাও পাবে বরাভয়। তবে দেবীর অর্ঘ্য যদি বাইরে ফেলে রাখো—জানিনে, হয়তো তাঁর অভিশাপ নতুন করে লাগবে তোমাদের মাথায়!

শেখানো মুখস্থ বুলি দূত একেবারে গড়গড়িয়ে বলে গেল। তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় হাতজোড় করে অনুনয় করল—

আমাকে কিন্তু মেরো না বাবারা! আমি একেবারে নিরীহ নিঃসঙ্গ দূত!

ব্যস, ব্যস, আর বলতে হবে না। সোনার ট্রয়ে তুমি সোনার খবরের দূত—তোমাকে মারব কেন?

যুদ্ধ শেষ হয়েছে, রাহুমুক্ত হয়েছে ট্রয়ের তীর। প্যারিস তার মৃত্যু দিয়ে শোধ করেছে দেবী মিনার্ভার ক্রোধঋণ। তিনি সদয় হয়েছেন, তাই দশ বছরের কালরাত্রির হয়েছে অবসান। তাঁর অর্ঘ্য তো তাঁকে দিতেই হবে, তাঁর পূজা তো করতেই হবে।

প্রায়াম নিজে এলেন সমুদ্রতীরে। সব দেখলেন, সব শুনলেন। তাঁর হুকুম মতো ট্রোজান প্রজারা কাঠের চাকাওয়ালা একটা পাটাতন বানালো, সেই পাটাতনের ওপর চড়াল কাঠের ঘোড়া। তারপর স্কীয়ান তোরণ হাট করে খুলে সেই ঘোড়ার গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গেল দেবীমন্দিরের সামনে। মন্দিরের পুরোহিত ঘোড়ার গলায় মস্ত মালা পরিয়ে তাকে বরণ করলেন। বললেন—

শান্তি! শান্তি! কাল হবে মহাপূজা, আজ হোক শান্তির উৎসব।

শুধু আনন্দের উৎসব নয়, স্বস্তির উৎসব। বিজয়ের উৎসব। জিতেছে

তো ট্রোজানরাই। তারা রক্ত দিয়েছে, কিন্তু হেলেনকে ছায় নি। শত্রুর হাতের একটি আঁচড় লাগাতে ছায় নি তাদের প্রিয় নগরের গায়ে। ব্যর্থ করে দিয়েছে এখিয়ান দস্যুদের অভিযান। লজ্জা বাঁচাতে ওরা মানে মানে সরে পড়েছে চুপিচুপি।

শোকের সঙ্গে আনন্দের এক বিচিত্র সংমিশ্রণে মহার্ঘ্য এই উৎসব। শুধু রাজপরিবার নয়, রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে শোকের আঘাত। শুধু রাজপ্রাসাদ নয়, ট্রয়ের প্রতিটি গৃহে স্বস্তির প্রসাদ। আনন্দ বুঝি শোকের সান্ত্বনা। সেই আনন্দে আত্মহারা হলো আবালবৃদ্ধবনিতা। সৈনিক ফেলে দিল তার অস্ত্র, প্রহরী খুলে ফেলল তার পোশাক। বাঁধনহারা মত্ততা—শুধু আলিঙ্গন আর অভিবাদন, নাচ আর গান, আহার আর পান। গভীর রাত পর্যন্ত উৎসব করে শ্রান্ত তৃপ্ত নগরবাসীরা ঢলে পড়ল নিশ্চিন্ত নিদ্রার কোলে।

তারপর সমস্ত ট্রয়বাসী যখন নিদ্রামগ্ন, তখন সেই কাঠের ঘোড়ার পেটের মধ্যেকার গোপন দরজা খুলল, চুপিচুপি বার হয়ে এলো গ্রীক বীররা। ওদিকে সেই নিরীহ দূত সমুদ্রতীরে জ্বালল আগুনের সঙ্কেত। সেই সঙ্কেত বুঝে চক্রবালের প্রান্ত থেকে ফিরে আসতে লাগল গ্রীক জাহাজের দল। ওরা সত্যিই চলে যায় নি, অদূরে টেনেডস দ্বীপের পেছনে সারাদিন লুকিয়েছিল। নিঃশব্দে নোঙর ফেলে তীরে নামল গ্রীক সৈন্যরা, চুপিসারে এগিয়ে আসতে লাগল ট্রয়ের প্রাচীরের দিকে। আর কাঠের ঘোড়ার বীররা ভেতর থেকে স্কীয়ান তোরণ হাট করে আহ্বান করল সঙ্গীদের।

কেউ টের পেল না। একটি ট্রয়বাসী জানল না যে শত্রুপক্ষের প্রতিটি বীর প্রতিটি সৈন্য তাদের নগরের মধ্যে ঢুকেছে, প্রতিটি অস্ত্র উদ্যত হয়েছে তাদের মাথার ওপর। যে প্রাচীর এতোদিন তাদের রক্ষা করেছে শত্রুর চাতুরীতে সে প্রাচীর আজ পরাভূত, যে তোরণদ্বার এতোদিন তারা শত্রুর মুখের ওপর বন্ধ রেখেছে সেই দ্বারই করেছে শত্রুকে আমন্ত্রণ!

শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে নয়, চাতুরীতে ট্রয়কে জয় করল গ্রীকরা। কাঠের ঘোড়ার চাতুরী। সেই চাতুরীতে সবাই ভুলেছিল—একেবারে ভুলেছিলেন রাজা প্রায়াম নিজে। তিনি নিজে নির্দেশ দিয়েছিলেন কাঠের ঘোড়াকে নগরের মধ্যে এনে মিনার্ভা মন্দিরের সামনে দাঁড় করাতে – ঘোড়ার মাথা তোরণদ্বারের চেয়ে উঁচু ছিল বলে তোরণশীর্ষের কটা পাথরও খসাবার হুকুম তিনি দিয়েছিলেন। আর মন্দিরে পূজারীরা যখন ফুলের মালা পরিয়েছিল ঐ ঘোড়ার গলায়, তখন হর্ষভরা মনে তা তিনি দেখেছিলেন।

কেবল হেলেন ভোলে নি। সে এখিয়ান জাতের মেয়ে, তাই ঐ কাঠেব ঘোড়াকে অন্ধ বিশ্বাসে মেনে নেয় নি। প্রাসাদের পুরনারীদের সঙ্গে সেও পায়ে পায়ে গিয়েছিল ঘোড়াটাকে দেখতে। দেখেই তার কেমন সন্দেহ হয়েছিল।

বিকেলের উৎসবের উল্লাসে সবাই যখন গৃহে গৃহে মত্ত, মন্দির যখন জনবিরল, তখন হেলেন আবার এসে দাঁড়াল ঘোড়াটার কাছে। তার কাঠের তৈরি পেটের গায়ে কান ঠেকিয়ে শুনতে চেষ্টা করল মানুষের গলা। তারপর সেই পেটে মুখ রেখে সে মৃদু গলায় উচ্চারণ করল—ইউলিসিস, মেনিলাওস, ডায়োমিডিস! প্রত্যেক গ্রীক বীরকে সে নাম ধরে ডাকল প্রত্যেকের স্ত্রীর গলা অনুকরণ করে। একজন তো চেঁচিয়ে উঠে উত্তর দিয়ে ফেলে আর কী ? ইউলিসিস দুহাত বাড়িয়ে নিঃশব্দে তার গলাটা টিপে ধরল।

আর কেউ উত্তর দিল না। হেলেনের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

বীরত্ব আর পাশবিকতার মধ্যে সীমারেখা অতি ক্ষীণ। সেই রেখার ওপর দাঁড়িয়ে আছে স্কীয়ান তোরণ। সেই সীমারেখাকে অতিক্রম করে গ্রীক অভিযাত্রীরা নিশীথ রাতে ট্রয়ের মধ্যে ঢুকেছে। আর বীরত্ব নয়, এবার শুধু পাশবিকতা, আর মহত্ব নয়, শুধু বীভৎসতা, আর নিঃশব্দ

অনুপ্রবেশ নয়—এবার উন্মত্ত হুহুংকার।

সেই পাশবিকতার উল্লাস পুরাণকারদেরও মত্ত করেছিল। নইলে অমন নিষ্ঠুর উৎসাহের সঙ্গে ট্রয় ধ্বংসের কাহিনী তাঁরা গেয়ে বেড়াতেন কী করে? বিশেষ করে বীরশ্রেষ্ঠ অ্যাকিলিসের কিশোর পুত্রের দানবিক লীলাকে অমন উৎসাহের সঙ্গে বর্ণনা করেছিলেন কেমন করে?

এই বর্ণনা অবশ্য হোমারের নয়। হেকটরের মৃত্যুতে ইলিয়াডের সমাপ্তি, অডিসিতে ট্রয় ধ্বংসের উল্লেখ মাত্র। এপিক বৃত্তের অন্য কবিদের রসনা অবশ্য মূক থাকে নি তাঁদের বর্ণনা আবার পরবর্তী ক্ল্যাসিক্যাল লেখক-দের রচনায় পরিপুষ্ট হয়েছে। ঐ বীভৎসতার বেদনাকে নাটকে রূপ দিয়েছেন ইউরিপিডেস, মহাকাব্যে স্থান দিয়েছেন ভার্জিল।

উন্মুক্ত স্কীয়ান গেটের মধ্যে দিয়ে দস্যুর মতো মার মার চিৎকার করতে করতে গ্রীকরা ঢুকল। ট্রয়ের প্রশস্ত রাজপথ ধরে তারা দৌড়ল। তুপাশে বড়ো বড়ো অট্টালিকা—প্রতিটি অট্টালিকার দরজা তারা ভাঙল। তার পর তিনটি দলে তারা ভাগ হয়ে গেল। প্রথম দলের কাজ প্রত্যেকটি নিরস্ত্র পুরুষকে হত্যা করা। দ্বিতীয় দলের কাজ প্রত্যেকটি নারীকে ধর্ষণ বা বন্দী করে সমস্ত ধনরত্ন লুট করা। তুদলের কাজ শেষ হতে না হতে তৃতীয় দল মহাসমারোহে বাড়িতে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল।

এমনি ভাবে নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় এগোতে এগোতে গ্রীকরা পৌঁছল প্রায়ামের প্রাসাদে। এখানে নেতৃত্ব নিল অ্যাকিলিসের ছেলে নিঅপ-টলেমাস। নতুন যুগের নতুন প্রজন্মের বীর।

নিঅপটলেমাসের নাম আমরা ইলিয়াডে শুনিই নি। খবরই রাখি নি যে সে অ্যাকিলিসের একমাত্র পুত্র। ট্রয় অভিযানে আসার আগে স্কাইরস দ্বীপের রাজঅন্তঃপুরে কিছুদিন লুকিয়েছিল অ্যাকিলিস নারী-বেশে রাজকুমারীর সখী সেজে। সেই রাজকুমারীরই গর্ভে জন্মে ছিল অ্যাকিলিসের এই পুত্র। অ্যাকিলিস হয়তো এই শিশুর মুখও দেখে নি। দশ বছরের যুদ্ধ আর শিবিরবাসের দিনে রাতে একবারও হয়তো

তার মনে পড়ে নি স্কাইরস দ্বীপের লালিত এই আত্মজের কথা।
শিশুকাল থেকে নিঅপটলেমাস শুনেছে তার অদেখা পিতার নাম, তার কীর্তিকাহিনী। অপেক্ষা করে থেকেছে কবে যুদ্ধ শেষ হবে, কবে গ্রীক বীররা দেশে ফিরে আসবে। সেদিন সে তার বীর পিতাকে দেখবে, সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, বলবে—
ছাখো আমাকে, আমি তোমার ছেলে।—তোমার তলোয়ারটা আমার হাতে দাও, তোমার মত বীর আমিও হব।
সেই বীর কিশোর ট্রয়ে এলো—অ্যাকিলিসের মৃত্যুর পরে। পিতৃহন্তাকে খতম করেছে তীরন্দাজ ফিলকটিটিস। নিঅপটলেমাস বীরত্ব দেখাবে কোথায়? মৃত পিতার মুখোজ্জ্বল করবে কেমন করে?
ইউলিসিসকে বললে—
বাবার অস্ত্র বর্ম সব আমাকে দাও! আমিও ঢুকব তোমার ঐ কাঠের ঘোড়ার পেটের মধ্যে!
প্রায়ামের প্রাসাদের মধ্যে নিঅপটলেমাস ঢুকল খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে। সৈন্যদের হুকুম দিল—যাকে দেখতে পাও খুন করো, একটা পুরুষও যেন বেঁচে না থাকে! আর মেয়েগুলোর কোমরে দড়ি বাঁধো!
লুটেরাদের হুকুম করল—সোনারূপো গয়নাগাঁটি সব ছিনিয়ে নিয়ে জড়ো করো। একটা দানাও যেন কোথাও না পড়ে থাকে!
তারপর শেষ হুকুম—আগুন লাগাও!
সারা নগরে তখন একই দৃশ্য। ট্রয়ের একটি পুরুষও অস্ত্র তুলবার সুযোগ পায় নি। গ্রীক হানাদাররা প্রত্যেককে কুপিয়ে কাটছে। এমনকি দেব-মন্দিরের অবরোধে আত্মগোপন করতে পারছে না ট্রোজান নারী। গ্রীক দস্যুরা মন্দিরের পবিত্র আশ্রয় থেকে টেনে এনে তাদের লাঞ্ছিত করছে। প্রতিটি অভিজাত প্রাসাদ আর অট্টালিকা, প্রতিটি সাধারণ মানুষের গৃহ জ্বলছে। আগুনের শিখায় লাল হয়ে গেছে আকাশের নীরন্ধ্র অন্ধকার, সেই আরক্ত আকাশের নিস্তব্ধতা টুটে গেছে হুংকারে আর

হাহাকারে।

প্রায়ামের প্রাসাদ জ্বলছে। একটি লোকও নেই সে প্রাসাদে। মৃতদেহ স্তূপ হয়ে পড়ে আছে সভাকক্ষে—মসৃণ মেঝে টাটকা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। রানী হেকিউবা বৃদ্ধ প্রায়ামের হাত চেপে ধরেছেন।

চলো চলো, পালাবে চলো!

পালাব? আমি ট্রয়ের রাজা প্রায়াম! আমার প্রাসাদ ছেড়ে আমি কোথায় পালাব?

হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমিই তো রাজা! আর এই ছাখো, আমি রানী। পাশে তোমায় বিধবা পুত্রবধূ, তোমার মেয়েরা। তুমিই তো আমাদের রক্ষা করবে। কিন্তু প্রাসাদ যে জ্বলছে!

প্রায়ামের অশক্ত ডান হাতে একটা খোলা তলোয়ার। বাঁ হাত ধরে টানতে টানতে তাঁকে বাইরে নিয়ে এলেন হেকিউবা। প্রাসাদের প্রাঙ্গণে একটা প্রাচীন লরেল গাছ, তার পাশে জুপিটারের মন্দির। সেই মন্দিরে নিলেন আশ্রয়।

প্রায়ামের পঞ্চাশটি পুত্রের কটি মাত্র অবশিষ্ট। নিরস্ত্র আধঘুমন্ত অবস্থায় তারা পালাচ্ছিল, তাদের বীরবিক্রমে খুন করল নিঅপটলেমাস আর তার সঙ্গীরা। অদূর থেকে সেই নিরুপায় মৃত্যুর দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না প্রায়াম। মন্দির থেকে ছুটে বার হয়ে এলেন।

তুমি কে? দেখি তো কুমার কিশোর—কিন্তু এমনি হীন ঘাতক হতে কে তোমার শিখিয়েছে?

নিঅপটলেমাস থমকে দাঁড়াল। শুভ্র কেশের দিকে দৃষ্টি পড়ল।

তুমি প্রায়াম না? তুমিই শিখিয়েছ। এবার গুরুদক্ষিণা দেবার সময় এসেছে।

প্রায়াম দুর্বল হাতে অস্ত্র তুললেন। তার আগেই নিঅপটলেমাস হেনেছে আঘাত। এক আঘাতে ঘাড় থেকে ছিন্ন হয়ে রাজার মুকুটহীন মাথা মাটিতে গড়াগড়ি খেল।

গ্রীক নেতারা ততোক্ষণে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছেছে। তারা দেখল প্রায়ামের ছিন্নমুণ্ড কোলে রানী হেকিউবা, তাঁর দুই পাশে তাঁদের দুই কুমারীকন্যা ক্যাসানড্রা আর পলিকসেনা—পিছনে বিধবা রাজবধূ অ্যানড্রোম্যাকি।

নিঅপটলেমাস গর্জন করে উঠল—

প্রায়ামকে আমি মেরেছি। এইসব মেয়েগুলো এখন আমাদের। বলো কে কাকে নেবে?

প্রৌঢ় ইউলিসিস এগিয়ে এলো। সম্ভ্রমভবে রানী হেকিউবাব বস্ত্র স্পর্শ কবে বললে—

এঁকে তোমরা ছুঁয়োনা—আমি এঁকে আশ্রয় দেব।

বেশ বেশ, আর তুমি? সর্বাধিনায়ক অ্যাগামেমনন?

অ্যাগামেমনন চেপে ধরলেন কুমারী ক্যাসানড্রাকে। শত্রুর রক্ত তাঁর রক্তে কামনার আগুন জ্বেলেছে।

এই ক্যাসানড্রাকে আমি চাই।

বেশ বেশ, বলেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠল নিঅপটলেমাস—

কী বললে? ক্যাসানড্রাকে তুমি নেবে? বড়ো রাজকুমারীকে? কেন? মাইকেনির রাজা বলে? সেনাপতি বলে? আর আমার বাবা? বাবা কাকে পাবে? আমার বাবার হাত থেকে ব্রাইসিইসকে তুমি ছিনিয়ে নিয়েছিলে—আমি জানিনে?

নির্বাক অ্যাগামেমনন। ত্রস্ত গলায় ইউলিসিস বললে—

বলছ কী? তোমার বাবা অ্যাকিলিস তো বেঁচে নেই!

ঠিকই বলছি!

পলিকসেনাকে চেপে ধরল নিঅপটলেমাস। বাঁ হাত বাড়িয়ে ফাঁসির দড়ির মতো জড়িয়ে ধরল তার গলা। তারপর আগুন-রাঙা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে—

পিতা অ্যাকিলিস, এরা তোমাকে ভুলে গেছে, এরা কৃতঘ্ন—কিন্তু আমি

জানি আজকের এই বিজয় তোমার। এই উৎসবের অংশভাগী তুমি হও। প্রেতলোকে বসে আমার অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ করো। যে পুত্রকে কখনো চোখে ছাখো নি, তাকে তুমি আশীর্বাদ করো।
ডান হাতে ছিল তীক্ষ্ণ ছুরি। আমূল বসিয়ে দিল পলিকসেনার বুকে। তারপর তাকাল অ্যানড্রোম্যাকির দিকে। রক্তমাখা হাতের এক ঝটকায় খসিয়ে দিল তার বুকের আঁচল। আঁচলের নিচে হেকটরের শিশুপুত্র। প্রায়ামের শেষ বংশধর। এক টানে মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে এনে পা ধরে শিশুকে মাথার ওপর বনবন করে ঘোরালো—তারপর প্রাচীরের পাথরে আছড়ে শেষ করে ফেলল।
দু চোখ বন্ধ করে রেখেছে অ্যানড্রোম্যাকি। চোখ খুললেই মৃত পুত্রের ছিন্নভিন্ন দেহাবশেষ তাকে দেখতে হবে। তখন সেই সর্বহারা বন্দিনীর গলার রত্নহার ধরে হিড়হিড়িয়ে কাছে টানল নিঅপটলেমাস। তার শ্মশান-হৃদয়কে চেপে ধরল নিজের বুকে। কানের কাছে মুখ এনে কৃতান্তের কর্কশ কণ্ঠকে নরম করে হিসহিসিয়ে উঠল—
এই যুদ্ধে অনেক শিক্ষা পেয়েছি—হেকটরের শিশুটাকে মেরে তার সব ঋণ শোধ। তবে একটি শিক্ষার সুযোগ এখনো পাই নি। জানো? এখনো আমি কুমার! প্রথম স্ত্রীসম্ভোগের শিক্ষা তোমার কাছ থেকে নেব। দেবে তো?

২৬

রাম-রাবণের লড়াই শেষ হয়েছে। ক্ষাত্রসূর্য রাম রাক্ষসাধম রাবণকে বধ করেছেন। মর্ত্যবাসীরা রামের জয়ধ্বনি করছে, দেবতারা আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করে সাধু সাধু বলে রামের স্তুতিবাদ করছেন।

এদিকে শোণিতকর্দমময় রণভূমিতে পড়ে আছে দশাননের নিস্পন্দ দেহ। সেই মৃতদেহকে জড়িয়ে ধরে করুণ কণ্ঠে বিলাপ করছেন সদ্য-বিধবা মুক্তকুন্তলা মন্দোদরী।

শত্রুবধেই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য সম্পূর্ণ হয় না। অনেক দায়িত্ব এখনো যা অবিলম্বে সম্পন্ন করতে হবে। রাম রাবণের অন্ত্যেষ্ঠির ব্যবস্থা করলেন, বিভীষণকে সিংহাসনে বসালেন, শোকার্তা মন্দোদরীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—

দুঃখ করো না লঙ্কামহিষি, তুমি রানীই থাকবে। সুগ্রীবের সঙ্গে যেমন তারার বিবাহ দিয়েছি, তেমনি বিভীষণের সঙ্গে তোমার বিবাহের ব্যবস্থা এখুনি আমি করছি।

বিজয়, অভিষেক আর বিবাহ—একসঙ্গে তিন মহোৎসবের ঘন ঘটা। বশংবদ বিভীষণের কাছ থেকে নানা উপঢৌকন পেয়ে রাম যখন গর্বোৎফুল্ল, প্রচুর পানাহারে বানর সেনারা যখন পরিতৃপ্ত আর লঙ্কা-রাজ্যের সাধারণ প্রজাদের দেহমন এই ত্রিবিধ উৎসবের ধাক্কায় যখন ত্রিভঙ্গ, তখন হনুমান একান্তে রামকে বললেন—

প্রভু, এই প্রচণ্ড যুদ্ধবিগ্রহের কী ফল? বিভীষণের রাজ্যাভিষেক? মন্দোদরীর পুনর্বিবাহ?

রাম উদার হাস্য করে উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিলেন—

না, এসব ফলাবশেষ মাত্র। ফল ক্ষত্রিয়ের জয় আর রাক্ষসের পরাজয়!
হনুমান সবিনয়ে বললেন—
মনে হয় রণক্লান্তিতে আপনার কিছুটা চিত্তভ্রান্তি ঘটেছে। নইলে নিশ্চয়ই বলতেন এ যুদ্ধের ফল বন্দিনী সীতার মুক্তি। অনুমতি করুন, আমি জানকীকে আপনার কাছে নিয়ে আসি।
ক্ষাত্রশ্রেষ্ঠ রাম বিস্মিত হলেন।
আমি? আমি অনুমতি দেবাব কে? সীতা রাজবন্দিনী, রাজা অনুমতি দিলে তবে তিনি মুক্তি পাবেন। লঙ্কার বাজা এখন বিভীষণ, তুমি তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করো।
দয়ালু বিভীষণ অনুমতি দিলেন। তখন রাম বললেন—
সীতাকে বোলো সে যেন উত্তমরূপে স্নান কবে দিব্য আভরণ আর অঙ্গরাগে সজ্জিত হয়ে এখানে আসে।
হনুমান বললেন—
বলেন কি? একবার আপনাব ডাক শুনলে তিনি যেমন আছেন তেমনি ভাবে ছুটে আসবেন প্রভু!
রাম বললেন—
ছিঃ! আমার একটা আভিজাত্য আছে না?
বিভীষণ বললেন—
ঠিকই তো! সীতা তো আর বান্দনী নন! তাঁকে যখন মুক্তিই দিলাম তখন তিনি বেশ ভালোভাবে সেজেগুজে রাজসভায় আসবেন, তাই তো দস্তুর। কোনো ভাবনা নেই—আমি চেড়ীদের বলে দিচ্ছি, তারা সব ব্যবস্থা করে দেবে!
তারপর রামের কানে কানে বললেন—
বহুদিন পরে তো প্রেয়সীদর্শন হবে। একটু নিভৃত পরিবেশই ভালো—তাই না? এইসব বানর-রাক্ষসদের ভিড় আমি সরিয়ে দেব নাকি?
রাম বললেন—

পাগল ? এরাই তো আমার স্বজন। কোনো প্রয়োজন নেই।[১০]

অশোক বনে হনুমান সীতাকে দেখে এসেছেন। একবস্ত্রা বন্দিনী—অঙ্গে কোনো ভূষণ নেই, আভরণ নেই, বস্ত্রালঙ্কার নেই। তৈলহীন রুক্ষ কেশ, ব্যথামলিন পাণ্ডুর মুখ। অশ্রুভরা কালিপড়া চোখ। উপবাসকৃশ দেহ—তবু রূপ যেন ধূম্রাচ্ছাদিত বহ্নিশিখা।

রামের নির্দেশে সেই সীতাসতী চোখে কাজল আর মুখে রঙ মেখে ধার-করা গহনা আর চেলী পরে সভাস্থলে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর প্রিয়মিলন-আকুল আঁখি রামের মুখ ক্ষণেক নিরীক্ষণ করেই সন্নত হলো।

রাম সীতাকে উদ্দেশ করে তখন সর্বসমক্ষে ঘোষণা করলেন—

আমি আমার অদম্য ক্ষাত্রবীর্যে শত্রুকে জয় করেছি। তোমাকে উদ্ধার করেছি। ত্রিভুবনে ধন্য ধন্য রব তুলেছি। কেন করেছি জানো ? ক্ষাত্রধর্ম পালনের জন্যে। আমার মহান্ ক্ষত্রিয় বংশের গ্লানি দূব করার জন্যে। তোমার জন্যে নয়। তোমার সতীত্বরক্ষার আজব কাহিনী হনুমান আমাকে শুনিয়েছে। কিন্তু আমি মুগ্ধ ভক্ত বানর নই, আমি ক্ষত্রিয়। রাবণ মুঠোর মধ্যে পেয়েও তোমাকে ভোগ কবে নি ? তার অঙ্ক-শায়িনী তুমি হও নি ? এমন ছেঁদো কথায় বিশ্বাস করে তোমাকে আমার ঘরে নিতে হবে ? ছি ! জেনে রাখো তোমার প্রতি আমার কোনো আসক্তি নেই। আমি স্থিরমতি হয়ে তোমাকে বলছি, যেখানে খুসি যার কাছে খুশি তুমি যেতে পারো। এমন কি লক্ষ্মণ বা ভরতের হাত ধরেও যদি যাও, তাতেও আমার আপত্তি নেই।

এই বর্ণনা বাল্মীকিরই বর্ণনা। রামের মুখে এমন সংলাপ বাল্মীকিই দিয়েছেন—এ কোনো অর্বাচীনের প্রক্ষিপ্ত রচনা নয়।

সীতা বুঝলেন। ঘোর লজ্জায় তিনি যেন নিজের গায়ে মিশে যেতে চাইলেন। তার পর চোখ তুলে তাকালেন। না, রামের দিকে নয়, ঐ দূরে দক্ষিণের শ্মশানের দিকে। যেখানে সদ্যনিহত রাবণের চিতা জ্বলছে। অগ্নির কটাহে এক অতৃপ্ত পিপাসা পুড়ছে।

মন স্থির করতে সীতার দেরি হলো না। যে পথে রাবণ গিয়েছেন সে পথেই তিনি যাবেন। রামের নিষ্করুণ দৃষ্টির সামনে মহাকাব্যের মহা-নায়িকা দৃঢ় পায়ে চিতার আগুনে প্রবেশ করলেন।

মহাকাব্যের আর এক নায়িকা হেলেন।
হেলেন তখন কোথায়? ট্রয় যখন ধ্বংস হচ্ছে, সেই মৃত্যু আর বহ্নি, লুণ্ঠন আর ধর্ষণের মাঝখানে কোন্ নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে হেলেন অতিবাহিত করছে তার অবসর?
নানা বিপরীত ভাষ্যের মধ্যে মহান নাট্যকার ইউরিপিডেসের বর্ণনাই সবচেয়ে মনকে নাড়া দেয়। তাঁর ট্রোজান নারী নাটকের বর্ণনা।
ক্ল্যাসিক্যাল গ্রীসের শ্রেষ্ঠ মানবতাধর্মী নাট্যকার ইউরিপিডেস। চিন্তার বৈশিষ্ট্যে ও সংস্থাপনের বৈচিত্র্যে তিনি সে যুগের নাটকে বিপ্লব এনেছিলেন বলা চলে। নাট্যসৃষ্টির মাধ্যমে তিনি যুগকে অতিক্রম করে-ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের লোলুপতা, যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা, ধর্মের কুসংস্কার আর সমাজের মূঢ়তাকে তিনি ধিক্কৃত করেছেন—সেই সঙ্গে গেয়েছেন গণতন্ত্র ও মানবতার জয়গান। বঞ্চিতের কান্নায় মিশিয়েছেন নিজের চোখের জল, লাঞ্ছিতা নারীর মূক মনকে নিজের মরমী মনের ভাষায় মুখর করেছেন।
ইউরিপিডেসের জন্ম এথেন্সে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। এথেন্সের তখন সুবর্ণময় যুগ। শিল্পী ফিডিয়াস, ইতিহাসকার থিউকিডিডেস, দার্শনিক সক্রেটিস আর জননেতা পেরিক্লেস তাঁর সমসাময়িক। এথেন্সের গৌরব যেমন ইউরিপিডেস দেখেছিলেন তেমনি আর তার পতনেরও তিনি ছিলেন সাক্ষী। পেলোপনীসিয় যুদ্ধ তাঁর জীবনকালেই ঘটেছিল।
সে যুদ্ধের একটি ঘটনা।
এথেন্সের সাম্রাজ্য-সূর্য তখন মধ্যগগনে—অজেয় তার নৌশক্তি। তাদের কজন জবরদস্ত জেনারেল হানা দিল ঈজিয়ানের এক ক্ষুদ্র দ্বীপে।

দ্বীপের নাম মেলস। এই অন্তর্যুদ্ধে মেলসবাসীরা কোনো পক্ষেই যোগ দেয় নি।

এথেন্সের রণনেতারা চড়া গলায় হাঁক দিয়ে উঠল—

এখুনি তোমরা আমাদের বশ্যতা স্বীকার করো!

মেলসের জনপ্রতিনিধিরা বললে—

আমরা শান্তিতে স্বাধীনভাবে সমুদ্রঘেরা এতটুকু জায়গায় পড়ে আছি, আমাদের ওপর এ হুকুম কেন?

বুঝতে পারছ না? আমরা যুদ্ধ করছি যে! স্পার্টাকে আমরা দেখে নেব!

তাতে আমাদের কী? আমরা স্পার্টার দলে নেই, তোমাদের দলেও নেই—তোমাদের বশ্যতা মেনে আমাদের লাভ? তা ছাড়া আমাদের সৈন্যও নেই যুদ্ধজাহাজও নেই। আমাদের তাঁবে টেনে তোমাদেরই বা কী লাভ?

লাভ? আমাদের লাভ তোমাদের বশ্যতা আর তোমাদের লাভ জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান।

মেলসবাসীরা বললে—মাপ করো, তোমাদের লাভে আমাদের মাথা-ব্যথা নেই। আমাদের জীবনমরণ নিয়েও তোমরা মাথা ঘামিয়ো না।

মাথা ঘামল, মাথা আগুন হয়ে উঠল। চল্লিশটা যুদ্ধজাহাজ সেই ছোট দ্বীপটিকে বেড়াজালে বাঁধল, জাহাজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার সৈন্য দ্বীপে নামল। দ্বীপের প্রতিটি পুরুষকে তারা হত্যা করল, প্রত্যেক নারীকে ধর্ষণ করল, প্রত্যেকটি শিশুকে ভাসিয়ে দিল জলে। প্রত্যেকটি বাড়ি আর মন্দির আগুনে খাক করল।

এই অমানুষিক বর্বরতার সাক্ষী ছিলেন ইউরিপিডেস। এই অভিজ্ঞতা মনে রেখে তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর অবিস্মরণীয় নাটক ট্রোজান নারী। পরাজিত বিধ্বস্ত ট্রয়ের সর্বহারা নারীকুলের বিপন্ন ভাগ্যের চিত্র। হেকিউবার দুঃসহ শোক, পলিকসেনার নিষ্ঠুর হত্যা, উন্মাদিনী ক্যাসানড্রার ধর্ষণ, স্বামীহারা অ্যানড্রোম্যাকির লাঞ্ছনা—বেদনার সঙ্গে

বীভৎস, কান্নার সঙ্গে কামোন্মাদনা, হতাশার সঙ্গে হত্যা, আর আর্তনাদের সঙ্গে অট্টহাস্যের এক ভয়াল সংমিশ্রণ এই নাটকে।

আর আছে এক অসতী কুলত্যাগিনী নারী আর তার কৃতান্তরূপী শাস্তিদাতা স্বামী—হেলেন আর মেনিলাওস।

গ্রীক সেনাপতিরা যখন জয়ের নেশায় পাগল, প্রতিটি গ্রীক সৈন্য যখন লুটের নেশায় লোলুপ, তখন মেনিলাওস কী করছিল? কোনো দিকে তার লক্ষ্য ছিল না, কোনো কিছুতে তার মন ছিল না, খাপ খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে সে শুধু খুঁজে বেড়িয়েছিল হেলেনকে—রাতের শ্বাপদ যেমন তার নির্দিষ্ট শিকারকে খুঁজে বেড়ায়!

দ্বিচারিণী হেলেন, ব্যাভিচারিণী হেলেন—যার দুর্নীতির শাস্তি দিতে বীর সঙ্গীদের নিয়ে দশ বছর ধরে ট্রয়ের বালুকাবেলায় অপেক্ষা করেছে সে। রক্ত ক্ষরণ করেছে দিনের পর দিন। সব রক্তের এবার শোধ হবে পাপীয়সীর রক্তে।

জ্বলন্ত প্রাসাদের বাইরে বিধ্বস্ত মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন হেকিউবা। স্বামীহারা সন্তানহারা রাজ্যহারা রাজমহিষী। তাঁর শেষ ভাগ্যও নির্ধারিত হয়ে গেছে। এখুনি উঠতে হবে ইউলিসিসের জাহাজে।

এমন সময় তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল মেনিলাওস।

কোথায় হেলেন?

কে তুমি?

আমি হেলেনের স্বামী?

হেলেনের স্বামী? বললেই হলো? সে ছিল আমার ছেলে প্যারিস। সে আর নেই।

আমি হেলেনের আসল স্বামী। স্পার্টার রাজা মেনিলাওস।

বটে? তা হেলেনকে নিয়ে তুমি করবে কী এখন? কোলে তুলে নাচাবে? আর নিজে নাচবে?

নাচব? সে ভ্রষ্টা কুলটাকে আমি খুন করব!

আহা, খুন করবে? হেলেনকে? যার জন্যে আমার সর্বনাশ, আমার দেশের সর্বনাশ, আমার জাতির সর্বনাশ, তাকে খুন করতে তুমি পারবে? হিহি, আমি নিজে চোখে তা দেখব?

অট্টহাস্য করে উঠলেন হেকিউবা।

আলবৎ পারব। সর্বনাশ আমাদের হয় নি? এই দুরন্ত বিদেশে মরে নি শত শত গ্রীক যোদ্ধা? বিধবা হয় নি শত শত গ্রীক নারী? কার জন্যে? কোথায় সে? কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছ?

হেলেন লুকিয়ে থাকে নি।

সামনে এসে দাঁড়াল। বিশ বছরের অদর্শনের পর মেনিলাওসের রক্ত চক্ষুর সামনে প্রতিভাত হলো তার ভুবনমোহন রূপ।

তুমি আমাকে শাস্তি দেবে মেনিলাওস?

শাস্তি? আমি তোমাকে খুন করব! এই তলোয়ার দিয়ে কুচি কুচি করে কাটব!

কেন মেনিলাওস? আমার তো কোনো অপরাধ নেই!

অপরাধ নেই? কেন কুলত্যাগ গৃহত্যাগ করেছিলে? কেন পালিয়ে এসেছিলে সংসার ছেড়ে, আমাকে ছেড়ে?

অপরাধের মোহে নয়, প্রেমের আহ্বানে। প্রেমের ডাক একবার কানে বাজলে না ছুটে কেউ পারে? আব তুমিই বা কেন দশ বছরের এই মহাযুদ্ধের শেষে ছুটে এসেছ আমার কাছে? আমাকে খুন করতে? সত্যি?

স্তব্ধ মেনিলাওস, নিরুক্ত উত্তর।

মেনিলাওস মাথা নিচু করল।

বুকের বসন ফেলে দিল হেলেন, নির্ভূষণা নগ্নিকা নায়িকা। বললে— তাকাও আমার দিকে। তারপর এই বুকে তোমার অস্ত্র বিঁধিয়ে দাও!

সেই বিশ্ববিমোহিনী রত্নরমণীর দিকে তাকিয়ে মেনিলাওসের হাত থেকে অস্ত্র পড়ে গেল।

২৫

মনোহর হৃদয়গ্রাহী উপসংহার।

পাপের পরাজয়, পুণ্যের জয়। অনুশোচনার অশ্রুজল, ক্ষমার মার্জনা। ভ্রান্তির স্বীকৃতি, ঔদার্যময় আশ্রয়। দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে হেলেন-মেনিলাওসের আবার দেখা। এই পুনর্দর্শন আর পুনর্মিলনের চিত্রটি আঁকবার জন্যে পুরাণকারদের উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা, ব্যাকুল প্রয়াস। কল্পনার কুশল সঞ্চরণ।

মেনিলাওস ক্রোধে উন্মাদ হয়ে তলোয়ার উঁচিয়েছে হেলেনের মাথায়। চিৎকার করছে—

বলো বলো, কেন আমার ঘর ভেঙেছিলে, কেন পালিয়ে এসেছিলে পরপুরুষের হাত ধরে?

হেলেন মাথা নিচু করে মেনে নিচ্ছে মেনিলাওসের অভিযোগ। কাতর কণ্ঠে শুধু বলছে—

ভুল করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলের জন্যে দায়ী আমি নই। দায়ী আমার ভাগ্য।

তুমি দায়ী নও? প্যারিসের হাত ধরে নিজের ইচ্ছেয় তুমি বেরিয়ে আসো নি?

নিজের ইচ্ছেয়? না, দেবী ভিনাসের ইচ্ছেয়?

রাখো, রাখো, প্যারিস তোমাকে জোর করে টেনে এনেছিল? তোমার জোর ছিল না? মনের জোর? তুমি শক্ত হতে পারো নি?

ম্লান উদাস গলায় হেলেন বললে—

শক্ত হব? দেবতার বিরুদ্ধে? বাধা দেব দেবতার অভিপ্রায়কে? বুক

পেতেছি, তলোয়ারটা বসিয়ে দাও। কিন্তু আমি তো দুর্বল নারী, তুমি পারো দেবতার বিরুদ্ধে লড়তে ?

ঠিকই তো, প্যারিস নয়, ভিনাস। দেবী ভিনাসের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়েছে হেলেনের জীবনে। প্যারিস উপলক্ষ মাত্র। উলটো করেও বলা চলে। ভিনাসের আশীর্বাদ সত্য হয়েছে প্যারিসের জীবনে। উপলক্ষ মাত্র হেলেন। দেবতার লীলায় মানুষের কোনো হাত নেই।

ট্রয় যুদ্ধের অন্তিম পরিচ্ছেদকে সামনে রেখে গ্রীক-আইওনিয়ান কবি-লেখকরা নানা রকম খণ্ড-কাহিনীর মাধ্যমে হেলেন চরিত্রকে চুনকাম করার চেষ্টা করেছেন।

হেলেন-হরণ নিয়েই এক নতুন ভাষ্য। ভূগোল তার সহায়। কে বলে স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে স্পার্টার রানী হেলেন প্রাসাদ থেকে পালিয়েছিল ? সোজা প্যারিসের জাহাজে গিয়ে উঠেছিল ? প্রাসাদে আর কেউ ছিল না ? প্রাসাদরক্ষীরা ছিল না? কাছে পিঠে সৈন্যসামন্ত ছিল না ? রাজ্যের রানী গৃহত্যাগ কুলত্যাগ করছে—আর সবাই তা চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে দেখেছিল ? তা ছাড়া স্পার্টা তো দক্ষিণ গ্রীসের ঠিক মাঝখানে ! তার ধারে কাছে সমুদ্র কোথায়, বন্দর কোথায় ? কোথায় ভিড়েছিল প্যারিসের তরী ?

আসলে হেলেন প্রাসাদসঙ্গিনীদের নিয়ে গিয়েছিল কাইথেরা দ্বীপে। কাইথেরা দ্বীপ গ্রীসের দক্ষিণে। সেখানে ভিনাস দেবীর নাম করা মন্দির। হেলেন গিয়েছিল সেই মন্দিরে পূজো দিতে। প্যারিসের জাহাজও কাইথেরার বন্দরে ভিড়েছিল। দূর থেকে স্পার্টার রানীকে দেখে ক্ষেপে গিয়েছিল প্যারিস। সুযোগ বুঝে দলবল নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মন্দিরে। নিরীহ পুরোহিত আর অসহায়া নারীদের মাঝখান থেকে ছিনিয়ে এনে জোর করে হেলেনকে তুলে নিয়েছিল তার জাহাজে। অপহৃতা রাজবধূ বাধ্য হয়েছিল লুব্ধ তস্করের হাতে আত্মসমর্পণ

করতে।

চরিত্রভ্রষ্টা হেলেনের বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্যে কম বিপদে পড়েন নি খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি স্টেসিকোরাস। তাঁর কাব্যে তিনি হেলেনকে বেশ কিছু ঘৃণ্য বিশেষণে ভূষিত করেছিলেন। ফলে দেবী ভিনাসের অভিশাপ তাঁর মাথায় নেমে এসেছিল। সেই অভিশাপ থেকে বাঁচবার জন্যে তিনি দেবীর পায়ে মাথা খুঁড়ে মার্জনা ভিক্ষা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এক সংশোধনী গাথায় লিখেছিলেন—

কে বলে হেলেন ট্রয়ে গিয়েছিল? প্যারিসের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিল? প্যারিস হেলেনকে হরণ করেছিল বটে, কিন্তু দেবরাজ জুপিটার এই অন্যায় সহ্য করতে পারেন নি। প্যারিসের জাহাজ যখন মিশরের বন্দরে, তখন দেবনির্দেশে মিশররাজ প্রোটিউস তাকে গোপনে উদ্ধার করে নিজের অন্তঃপুরে রেখে দিয়েছিলেন। দেবরানী জুনো এ সুযোগ ছাড়েন নি। প্যারিসের শাস্তি তাঁর চাই—তাই এক মায়া-হেলেন তৈরি করে রেখে দিয়েছিলেন প্যারিসের জাহাজে। আসল হেলেনকে চুরি করলেও স্পর্শটুকু করতে পারে নি প্যারিস। তার বিভ্রান্ত বাসনা তৃপ্ত হয়েছিল ছায়াময়ী ছলনায়।

এই ভাষ্যের ওপর ইউরিপিডেসও এক নাটক লিখেছিলেন—যার নামই হেলেন। আর এই ভাষ্য মনে রেখে আধুনিক কালের গ্রীক কবি জর্জ সেফেরিসের প্রশ্ন—

> ট্রয়ের হেলেন?
> সত্যি নাকি?
> আমি যে তাকে দেখেছি
> মরুভূমির প্রান্তে এক ব-দ্বীপের তীরে।
> ট্রয়ে ছিল ছায়া-হেলেন,
> আর সেই ছায়াকেই জড়িয়েছিল প্যারিস।
> আর সেই ছায়ার জন্যেই

দলে দলে
মরেছি আমরা মুখ থুবড়ে
দশ বছর ধরে !
সত্যি নাকি ?

স্বপ্ন-হেলেনের এই স্বপ্ন কাহিনীকে সত্য বলে মানতে স্বপ্নও হার মানে। তবে সে যুগের সব গ্রীক লেখকরাই বলেছেন যে প্যারিসের বাহুবন্ধনে নয়, ভাগ্যেরই নিগড়ে বাধা পড়েছিল হেলেন। সেই নিগড় খসল প্যারিস যখন মরল। মুক্ত হলো রাহুগ্রাস থেকে। তখন থেকে হেলেন আর প্রিয় রাজবধূ নয়, বন্দিনী বিদেশিনী। এতোদিন ভাগ্য ছিল দেবতার হাতে বাঁধা। এবার নিজের ভাগ্য নিজের হাতেই নেবার চেষ্টা করল হেলেন। ভাগ্যের হাত থেকে সে মুক্তি পেয়েছে, এবার মুক্তি পেতে হবে বন্দীদশা থেকে।

ইউলিসিস একদিন এক বিপন্ন ক্রীতদাসের ছদ্মবেশে ট্রয় নগরে ঢুকল। উদ্দেশ্য মিনার্ভার মন্দির থেকে প্যালেডিয়াম মূর্তি চুরি করা। ঐ প্যালেডিয়াম যতোদিন ট্রয়ে থাকবে ততোদিন বরাভয়।

হেলেন ইউলিসিসকে চিনতে পারল। চুরিতে সাহায্য তো করলই, তার ওপর নিজের প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে প্রচুর পরিচর্যা করল তার। দেখাল চোখের জল, শোনাল কাতর অনুনয়—

বোঝো না আমি দুঃখিনী বন্দিনী? তোমরা কবে আমাকে উদ্ধার করবে? কবে আবার মেনিলাওসের বুকে পাব ঠাঁই ?

এতেও শান্ত হলো না হেলেন। প্যারিসের প্রাসাদে সে একলা থাকত, একদিন গভীর রাতে প্রাসাদ থেকে চুপিচুপি বার হয়ে গেল। প্রাচীরের মাথায় উঠল—সেখান থেকে দড়ি ঝুলিয়ে ওপারে নামবার চেষ্টা করল। প্রাচীরের বাইরে পা দিতে পারলেই মুক্তি। ওখানে গ্রীক—ট্রোজানদের শত্রু হলেও তারা স্বজন। তারা রাখলে রাখুক মারলে মারুক।

ট্রয়ের প্রহরীদের হাতে ধরা পড়ল হেলেন। তারা তাকে ধরে নিয়ে গেল রাজদ্বারে।

সকালবেলা বিচার। বিচারকর্তা রাজা। প্রায়াম কথা শুরু করবার আগেই চিৎকার করে উঠল রাজপুত্র ডিইফোবাস—

ওর আর ঐ প্রাসাদে একলা থাকা চলবে না। থাকলেই আবার পালাবার চেষ্টা করবে। ও প্রাসাদ বন্ধ করে দাও!

তাহলে ও থাকবে কোথায়? আমার প্রাসাদে? শুধোলেন প্রায়াম।

না, আমার প্রাসাদে। আমি পাহারা দেব।

রাজসভা থেকে টানতে টানতে হেলেনকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে গেল ডিইফোবাস। এবার শাস্তির পালা। দুহাতে আঁচড়ে আঁচড়ে ছিন্নভিন্ন করল হেলেনের সারা গায়ের বস্ত্র—তারপর তাকে ছুড়ে ফেলল বিছানায়।

শেষের সেই রাত্রি। ট্রয়ের সমুদ্রতীর ফাঁকা, ট্রয়ের প্রাচীরের মধ্যে গ্রীকদের কাঠের ঘোড়া। উদ্দাম উৎফুল্ল ট্রয়ের নরনারী। সারা ট্রয়ে সেই কাঠের ঘোড়াব রহস্য দুজনই মাত্র জানত। প্রাচীরের বাইরে একজন—সেই ছদ্ম গ্রীক দূত—যার নাম সিনন। আর একজন প্রাচীরের ভেতরে—হেলেন। একজন জানত নিশ্চিত, আর একজনের অনুমান ব্যর্থ হয় নি। ঘোড়ার ভেতরকার বীররা হেলেনের ডাকে সাড়া দেয় নি—তবু হেলেন ধারণা করেছিল ওর মধ্যে একটা সাংঘাতিক সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। গ্রীক রণতরী ট্রয়ের সমুদ্রতীরে একটি নেই। হেলেনের স্থির বিশ্বাস ছিল ওরা আবার ফিরে আসবেই।

অন্ধকার আকাশ। উৎসবক্লান্ত নগরীর ঘরে ঘরে আলো নিভেছে। ঘুমে জড়িয়েছে পুরবাসীর ক্লান্ত চোখ। জেগে ছিল শুধু দুজন—দুইই গ্রীক। একজন পুরুষ আর একজন নারী। ঐ সিনন আর হেলেন।

ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে। এবার চুপিচুপি কাঠের ঘোড়ার দরজা খুলবে। ওরা এবার মাটিতে নামবে, চুপিচুপি হাঁটবে প্রাচীরের দিকে, হাট করে

খুলে দেবে স্কীয়ান মহাদ্বার।
এবার জানাতে হবে সংকেত। টেনেডস দ্বীপের ওপার থেকে সৈন্য আর অস্ত্রভর্তি জাহাজদের ডেকে আনতে হবে। যবনিকা তুলতে হবে শেষ অঙ্কের।
সন্ধ্যেবেলাকার উৎসবে হেলেনের ঠাঁই নেই। রাজপ্রাসাদ যখন আনন্দ মুখরিত, প্রতিটি গৃহ প্রতিটি পরিবার যখন উল্লাস-বিভোল, হেলেনকে কেউ তখন ডাকে নি। সে বন্দী থাকুক প্রাসাদের কোণায় তার নিভৃত কক্ষে।
দ্বিতীয় প্রহর পার হলো। আকাশের প্রান্তে তখন একটু চাঁদ। সিনন গুটিগুটি এগোলো। অ্যাকিলিসকে যেখানে দাহ করা হয়েছিল সেখানে আরো অনেকগুলো শুকনোকাঠ পড়েছিল। কাঠগুলো চুপিচুপি জড়ো করে সিনন আগুন জ্বেলে দিল। ঐ অগ্নিসংকেত চক্রবাল থেকে চোখে পড়বে। সেই সংকেত দেখে ট্রয়ের তীরে ফিরে আসবে গ্রীক জাহাজের পাল।
প্রাসাদের জানলা থেকে হেলেনও দেখল ঐ অগ্নিকুণ্ড। আর তার সন্দেহ রইল না। সে তার কক্ষের জানলায় উজ্জ্বল একটি মশাল জ্বেলে দিল। সারা শহর ঘুমে অচেতন, সব গৃহ অন্ধকার। শুধু হেলেনের চোখে ঘুম নেই—তার বাতায়নে মশালের আলোয় ধ্বংসের আমন্ত্রণ।
রকমফের এক কাহিনী। হেলেনের দেখা নাকি ঐ ডিইফোবাসের প্রাসাদেই পেয়েছিল মেনিলাওস। সে রাত এক বিশেষ রাত, স্মরণীয় রাত। গ্রীকরা হেরে গেছে, দশ বছর ব্যর্থ চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত হেলেনকে ফেলে পালিয়েছে। হেলেন প্রিয়া নয়, প্রেমিকা নয়, ডিই-ফোবাসের বন্দিনী—কামকুণ্ডলিনী স্বৈরিণী। প্যারিসের মৃত্যুর পরই ডিইফোবাস হেলেনকে পাকড়েছে। রক্ষিতার মতো ভোগ করছে তার দেহ।
কিন্তু আজকের রাত অন্য রাতের মতো নয়। হেলেনকে বুকে জাপটে

তার শরীর নিংড়ে নিংড়ে আজ রাতের রতিসম্ভোগ জাতির জয়-ঘোষণার প্রতীক।

রতিলাঞ্ছিতা বন্দিনী হেলেন যখন লজ্জা-আবরণ থেকে বিচ্যুতা হয়ে ডিইফোবাসের লালসা-প্রহার নীরবে সহ্য করছে, অবাঞ্ছিত কামমন্থনে শিহরিত হচ্ছে তার নিরুপায় স্নায়ুমণ্ডলী—তখন কোথায় তার মন? সে কি জানে তার আর্ত মনোভাবের প্রতিধ্বনি ট্রয়ের প্রতিটি নারীর বুকে বাজতে দেরি নেই? কয়েক প্রহর যেতে না যেতেই হেকটরের বিধবা অ্যানড্রোম্যাকি ইউরিপিডেসের সংলাপে বলবে—

আমি হেকটরের পত্নী
হেকটর ছাড়া কেউ আমাকে স্পর্শ করে নি,
হেকটর ছাড়া কারো আলিঙ্গনে
রোমাঞ্চিত হয় নি আমার শরীর,
স্পন্দিত হয়নি আমার জরায়ু।
কিন্তু স্ত্রীলোক তো মানুষ নয়,
সে শুধু জন্তু,
তাকে নিয়ে জন্তুর ব্যবহার।
যে দেহ হেকটর বুকে ধরেছে
সেই দেহ নিয়ে আর কেউ শোবে,
সেই দেহ শিউরে উঠবে
আর কারো উন্মত্ত মন্থনে
তার আগে কেন পারি নে
প্রতিটি অঙ্গকে
টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে?

খুঁজতে খুঁজতে ডিইফোবাসের প্রাসাদের হদিস পেয়েছিল মেনিলাওস। দরজা ভেঙে সে ঢুকেছিল। স্খলিতবাসা হেলেনকে জড়িয়ে ডিইফোবাস

তখন অঘোরে ঘুমচ্ছে। চকিতে জেগে উঠে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল—কিন্তু ব্যবহারের সুযোগ পায় নি। প্যারিসের শোধ মেনিলাওস মিটিয়েছিল ডিইফোবাসের ওপর। তলোয়ার দিয়ে কেটেছিল তার দুহাত। দুফাঁক করেছিল তার মাথা। খাঁচাছাড়া নাগিনীর মতো হেলেনও ফুঁসে উঠেছিল সেই মুহূর্তে। পেছন থেকে আমূল ছুরি বসিয়ে দিয়েছিল ডিইফোবাসের পিঠে।

তারপর মাথা উঁচু করে দেহ সোজা করে হেলেন দাঁড়াল মেনিলাওসের সামনে। বিস্রস্ত তার কেশপাশ, ভূলুণ্ঠিত তার বসন--শত্রুর হাতে নিগৃহীতা নারীত্ব-লুণ্ঠিতা দুর্ভাগিনী।

বেশি কথা হেলেনকে বলতে হলো না। ধূসরভাগ্যা অনুতপ্তা সে—তার ভাগ্যকে কি আরো কালো করা যায়? বেশি করে দেখতেও হলো না হেলেনকে। সুন্দরীশ্রেষ্ঠা কামিনী সে—সে সৌন্দর্যকে ফিরে পেয়ে আবার কি ধুলোয় ছুড়ে ফেলা যায়?

উদার আগ্রহে মেনিলাওস হারানিধি হেলেনকে বুকে টেনে নিল। গলায় পরল নিটোল যুগল-রত্নের লকেট-শোভিত পাকা সোনার হার—হেলেনের আলিঙ্গন।

২৮

আবার আমরা হেলেনকে দেখলাম স্পার্টার রাজপ্রাসাদে। ট্রয় যুদ্ধ শেষ হবার প্রায় দশ বছর পরে।

হোমারের অডিসিতে।

ক্ল্যাসিক্যাল গ্রীসের প্রবীণতম নাট্যকার ঈসকাইলাস তাঁর অ্যাগামেমনন নাটকে বলেছেন—

মেনিলাওসকে ছেড়ে হেলেন গেল নবপ্রণয়ীর সঙ্গে। রেখে গেল বিপুল সৈন্যসজ্জা আর অসংখ্য রণতরী। বর্মের তীক্ষ্ণতা আর তরবারির ঝনঝনি। নিয়ে গেল ট্রয়ে ধ্বংস আর সর্বনাশের যৌতুক।

হেলেন শব্দের অর্থ চন্দ্র। তাই তিনি বলছেন—

কে দিয়েছিল তোমার ঐ নাম—
আকাশিনী সার্থকনামিনী ?।
তোমার রহস্য-বাঁকা ওষ্ঠরেখার দিকে তাকিয়ে
উন্মাদ হবে মানুষ—
এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই তোমার উদ্ভব।
অপ্রাপণীয় তুমি, দূরান্তিনী দিগন্তবর্তিনী,
যুদ্ধবধূ তুমি।
তোমার সূচ্যগ্র ছটায়
নগরে জাহাজে আর হৃদয়ে হৃদয়ে
নরকাগ্নি জ্বালা।

পলিকসেনাকে যখন প্রেত-পিতার প্রীত্যর্থে বলি দেবার জন্যে

নিঅপটলেমাস খড়্গ তুলেছে তখন হেকিউবার মুখে ইউরিপিডেস সংলাপ দিয়েছেন—

না না—পলিকসেনা নয় !
তুষ্ট করতে চাও অ্যাকিলিসের প্রেতাত্মাকে ?
জানো, কেমন করে সে তৃপ্ত হবে
মিটবে তার বিফল বাসনা ?
পলিকসেনার নয়—
তোমার পিতার চিতার ধিকিধিকি আগুন
কামাগ্নিসম,—ঐ হেলেনের বুকের রক্তে
নেবাও।

ইউরিপিডেস প্রেমের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এই বলে—প্রেম মৃত্যুর মতো এক অলঙ্ঘ্য অপ্রতিরোধ্য শক্তি, চুম্বকের মতো আকর্ষণ, আগুনের মতো দীপ্তি, ঝঞ্ঝার মতো উন্মত্ততা, বিষের মতো তিক্ততা, আর ক্ষতের মতো যন্ত্রণা। প্রেম আবার প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ, পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যের মহতী মাতৃকা।

প্রেমের অপর নাম হেলেন। সেই হেলেনকে বুকে নিয়ে মেনিলাওস যখন তার জাহাজে উঠল, তখন প্রেম-পরিত্যক্তা বিপন্না ট্রোজান নারীরা তাদের শৃংখলবদ্ধ হাত আকাশে তুলে প্রার্থনা কবল—

হে ঈশ্বর, হে দেবতা,
বজ্রপাণি তুমি,
হানো তোমার অস্ত্র,
উত্তাল করো বারিধি,
ডোবাও ঐ জাহাজ।
সোনার দর্পণের সামনে বসে
ঐ যে গরবিনী মুখমার্জনা করছে,
চটুল চোখে দেখছে নিজের ছলাকলা।

কখনো যেন না ফিরতে পারে
পিতৃপুরুষের দেশে,
স্পর্শ করতে না পারে পিতৃপুরুষের সমাধি।
সমুদ্রের গভীর অতলে,
পড়ে থাক ওর প্রাণহীন রূপহীন
গলা পচা মৃতদেহ।

সৌভাগ্যবতী নায়িকা হেলেন। মানুষ যতোই নরকাগ্নি জ্বালায় জ্বলুক হেলেনের জন্যে, যতো অভিশাপই দিক, দেবতারা কোনো অভিশাপ দেন নি তাকে। তাই হোমার দেখিয়েছিলেন তার জীবনের সার্থক পরিণতি--মেনিলাওসের পাশে, স্পার্টার প্রাসাদে।

ট্রয় যুদ্ধের শেষে মেনিলাওসের মতো সৌভাগ্যও আর কোনো এখিয়ান বীরের হয়নি। ফেরার পথে বহু জাহাজ সমুদ্রে ডুবেছিল। বহু যোদ্ধা শেষ আশ্রয় পেয়েছিল জলের তলায়, না হয় কোনো অখ্যাত অজ্ঞাত সমুদ্রতটে। দেশে ফিরেও অনেক রাজা ফিরে পায় নি সিংহাসন। সবচেয়ে দুর্ভাগ্য অ্যাগামেমননের। ট্রয় যুদ্ধের বিজেতা সর্বাধিনায়ককে সম্বর্ধনা করার সুযোগ রাজ্যের প্রজারাও পায় নি। প্রাসাদে পা দিতে না দিতেই অতর্কিত আক্রমণে তি' খুন হন। খুন করে তাঁর নিজেরই স্ত্রী ক্লিটেমনেস্টা—পুরাণের নিকৃষ্টতমা কলঙ্কিনী।

মেনিলাওসের ভাগ্য সবার চেয়ে ভালো। তার নৌবহর অবশ্য সাত বছর ধরে ঘুরেছিল নানান তীরে নানান রাজ্যে। শুধু বিধ্বস্ত ট্রয়ের লুটের বখরা নয়, নানা শহর আর বন্দর থেকে প্রভূত ধনসম্পদ সে আহরণ করে এনেছিল। আর সেই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হেলেন।

প্রায় সাতাশ বছর পরে আবার স্পার্টায় ফিরে এলো হেলেন। সম্রাজ্ঞীর সম্মানে মেনিলাওসের পাশে সিংহাসন আলো করে সে বসল। দেহ বিছোলো মেনিলাওসের পাশে রাজারানীর জোড়া পালঙ্কে। ট্রয়বাসিনী

হেলেনকে দেবী ভিনাস এক আশ্চর্য উপহার দিয়েছিলেন। স্ক্যামাণ্ডার নদীর বুক থেকে কুড়োনো এক মন্ত্রপুত কালো পাথর। ঐ কষ্টিপাথরের বরে হেলেনের তনুশ্রী ছিল অম্লান, তার প্রতি প্রেমিক প্যারিসের আকর্ষণ ছিল দুর্বার, রমণকৌশলে সে ছিল অনন্যা। প্যারিসের মৃত্যুর পর ভিনাসের আশীর্বাদ আর ছিল না।

স্পার্টায় হেলেন যখন দ্বিতীয়বার রানী, হোমার এক ইঙ্গিতময় বাক্যে বলেছেন, তখন স্বামীকে শয়নসুখ দেবার বয়স আর হেলেনের ছিল না, ছিল না আর সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা। মেনিলাওস তা হলে কীসের টানে কোন হেলেনকে ফিরিয়ে এনেছিল ?

অডিসির চিত্র অনুসারে স্পার্টায় রাজারানীর সুখশান্তি ভরা জীবন। সমৃদ্ধিময় রাজ্য, ঐশ্বর্যভরা প্রাসাদ। হেলেনের মাথায় রানীর মুকুট, অঙ্গে রানীর সাজ। রানীর কর্তব্য সে পালন করে, রানীর সম্মান পায়। সুবিধে পেলেই সে চতুর সারল্যের সঙ্গে তার পুরোনো জীবনের কথা বলে, পুরোনো অভিজ্ঞতার কথা শোনায়। বলে অল্প বয়সের বুদ্ধির দোষে ট্রয়ে গিয়ে কী ভুল সে করেছিল, আর তাকে উদ্ধার করে আনতে তার বীর স্বামী আর তার বন্ধুরা কী লড়াই-ই না করেছে !

বিগতযৌবন মেনিলাওস বিহ্বল চোখে তার প্রৌঢ়া রানীর দিকে তাকায়—হেলেনই তার মান, তার সম্মান, হেলেনই তার পৌরুষের বিজয় কেতন।

শুধু মেনিলাওসের নয়—সারা এথিয়ান জাতির, সারা গ্রীসের। দশ বছর ধরে সমুদ্রপারে যুদ্ধ করে সত্যিই নাকি জিতেছে গ্রীকরা ? সত্যিই নাকি ট্রয়কে ধ্বংস করে এসেছে ?

প্রমাণ চাও ? এই ছাখো হেলেন।

মরমী মানুষের বিশ্বাস অন্য। সে ট্রয়ের হেলেনকেই মনে রেখেছে। সে হেলেন মুক্তির মন্ত্রময়ী। গোষ্ঠীকৌলীন্যের তর্জনে সে অধোমুখী নয়,

সমাজ-সংসারের শাসনে শৃঙ্খলিতা নয়। সে সীমান্তচারিণী বিহঙ্গী, তাকে সোনার খাঁচায় বাঁধবে কে? সে কুলহারা সরোবরের মূলহারা ফুল, তার একটি পাঁপড়ি ছিড়বে কে? সে পুরুষের পরম প্রেরণার অধিষ্ঠাত্রী, লোকধর্মের সংকীর্ণ প্রাঙ্গণে তার বিচার করবে কে?
বিচার করবার অধিকার কার ছিল? মেনিলাওসের ছিল কি? বিচার নয়—বিশিষ্ট আমন্ত্রণ। অডিসির হেলেন এক কুটিলা গর্বিতা স্বার্থসর্বস্বা বৃদ্ধা রানী, বৃদ্ধ রাজা মেনিলাওসের সুখমোহভাগিনী। এক মাত্র হোমার ছাড়া সেই রানীর খবর কেউ চায় নি। অডিসির চতুর্থ অধ্যায় —হেলেন-মেনিলাওস সংবাদ – প্রক্ষিপ্ত না হতে পারে, অপ্রয়োজনীয়। পরবর্তী যুগে কোনো কবি বা শিল্পী এই সংবাদ থেকে সামান্যতম প্রেরণা পায় নি।

স্পার্টার প্রাসাদে নয় - মানুষের মরমী মন ট্রয়ের আগুনজ্বলা অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে সেই হেলেনকে চিরকাল খোঁজে—যে হেলেন প্যারিসের প্রেম, প্রায়ামের স্নেহ, হেকটরের আত্মত্যাগ। সে জানে প্রেম আর প্রেমের স্মৃতি আঁকড়েই শেষ পর্যন্ত ট্রয়কে আঁকড়ে রেখেছিল হেলেন। আর হেলেনের প্রেম আর শোকের সম্মানেই তাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আঁকড়ে রেখেছিল ট্রয়।
তার কল্পনা অন্য।
শেষের সে রাত্রে মেনিলাওস হানা দিল হেলেনের প্রাসাদদ্বারে। অন্ধ নিশীথিনী অগ্নি-আহবে উজ্জ্বল—অন্ধকার প্রকোষ্ঠে হেলেন একা। মেনিলাওস তাকে দেখল—কুড়ি বছর পরে।

> হেলেন? এই সেই হেলেন?
> নিষ্প্রাণ নিশ্চল এক মূর্তি!
> শ্বেত মর্মরে যেন গড়া,
> দেবীর মতো দীর্ঘাঙ্গী

দেবীর মতো বিবর্ণদেহা
দেবকন্যা অমানবী।

শোকশিথিলবক্ষা আলুলায়িত-কুন্তলা সে, বলিরেখাঙ্কিত পাণ্ডুর তার কপোল, গ্রীক ভাস্কর্যের মতোই ভাষাহারা মণিহারা চোখ।

এই হেলেন? দশ বছর ধরে যুদ্ধ করে যাকে জিতেছি, সে এই নীরক্ত নিথর নিস্পন্দ শিলা? কথা বলো, সত্যি বলো—হেলেন তোমার নাম?

টেনিসনের ভাষায় হেলেনেব উত্তর—

নাম? জিজ্ঞাসা কোরো না আমার নাম,
চেয়ো না আমার পরিচয়।
শুধু মনে রেখো
অপূর্ব রূপ ছিল আমার একদিন,
আর ছিল অপূর্ব ভাগ্য।
ভাগ্যের চেয়ে বড়ো আর কিছু আছে?
তাই ভুলো না,
আমার জন্যে কতো তরবারি খুলেছে
কতো মানুষ মরেছে—
আমাব পায়ে পায়ে হেঁটেছে সর্বনাশ।

মেনিলাওসের হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল।

কাকে জয় করলাম? রূপকে, রূপবতী রমণীকে? কাকে ক্ষয় করলাম? প্রেমকে, প্রেমময় হৃদয়কে? কী দিয়ে জয় করলাম? শক্তি দিয়ে, অসুরত্ব দিয়ে? রূপ, প্রেম, শক্তি—ভাগ্যের কাছে কিছুই না। ভাগ্য অপূর্বতম, অমোঘতম।

মাথা নিচু করে একলা ফিরে গেল ভাগ্যহত মেনিলাওস ঈজিয়ানের পারে।

আবার অতলান্ত সাগর পেরিয়ে আসে নতুন যুগের মানুষ, নতুন যুগের

কবি। বাঁস্তব সভ্যতার রুদ্ধশ্বাস পরিবেশ থেকে মুক্তি খোঁজে তার বিহঙ্গমন—খোঁজে সৌন্দর্য, খোঁজে প্রেমের আদর্শ। খোঁজে ট্রয়ের সমুদ্রবেলার স্বর্ণ-হলুদ বর্ণালী। নব-মহাদেশ অ্যামেরিকার কবি এডগার অ্যালান পো-র কটি পংক্তিতে সেই সন্ধানেরই আবেগ—

হেলেন, আমার চিত্তে তোমার মূরতি
দূরগামী তরণীর মতো—
সে তরণী পথক্লান্ত শ্রান্ত নাবিকেরে
সুগন্ধি সমুদ্রপারে ধীরে নিয়ে যায়
পৌঁছে দেয় তৃপ্তিভ⁻া শান্ত সৌম্য তীরে।
সীমাহারা সুদুর্দাম সাগরে সাগবে
আশাহারা সন্ধানী ভ্রমণ—
তোমার ক্ল্যাসিক মুখ হায়াসিন্থ চুল
জলদেবকন্যার আহ্বান-ইঙ্গিত,
আমাকে ফিরিয়ে আনে
স্বপ্নে-দেখা স্নিগ্ধ পোতাশ্রয়ে।

ট্রয়ের শোকগাথা গেয়েছেন কবি অ্যাগাথিয়ন—

হে নগর, কে যা তব গর্বিত প্রাচীর,
ধনরত্ন বিভূষিত কোথায় মন্দিররাজি তব,
দেবতার যূপকাষ্ঠে সুপবিত্র ষণ্ডশীর্ষ বলি?
কোথা দেবী ভিনাসের স্বর্ণবর্ণ চেলী,
মন্ত্রপূত অর্ঘ্যপাত্র,
অধিষ্ঠাত্রী অ্যাথেনির বিগ্রহ কোথায়?
কিছু নেই সব গেছে।
ভাগ্যে গেছে, যুদ্ধে গেছে
কর্কশ হিংসার ঘায়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে—
সবশেষে নিশ্চিহ্ন করেছে মহাকাল!

তবু হে নগর, হে ট্রয় নগর,
সব ধ্বংস সব মৃত্যুশেষে
অনির্বাণ তোমার গরিমা,
অবিস্মরণীয় তব নাম।

কীসের গরিমা? হেলেনের, হেলেনের ভালবাসার। কেন অবিস্মরণীয়? হেলেনের জন্যে। হেলেন ছিল বলে—হেলেন আছে বলে।

কুড়ি বছর ধরে ট্রয়ে ছিল হেলেন। সব ধ্বংস সব মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত। আর ঐ নামটুকু সম্বল করে নদীসমুদ্রের এক বিস্মৃত মোহানায় পৌঁছে কুড়ি বছর ধরে খুঁড়ে খুঁড়ে ট্রয়ের ধ্বংসাবশেষ বার করেছিলেন হাইনরিখ স্লীম্যান। ঐ মাটির কন্দরেই বুঝি নিত্য-জাগর হেলেনের আত্মা।

আর সেই ধ্বংসাবশেষের ছায়ায় এক নির্জন সন্ধ্যায় স্ত্রীর মুখে স্লীম্যান খুঁজেছিলেন হেলেনের মুখ।

স্বামীর কথায় চমকে উঠল সোফিয়া। হেলেন বড়ো দুর্ভাগিনী, হেলেন বড়ো অশুভ নাম, হেলেনের নামে গায়ে কাঁটা।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে স্বামীকে ঠাট্টা করে সোফিয়া বললে—হোমার ভুলে গেছ বুঝি? হোমারের অডিসি? এই ট্রয়ে হেলেনকে পাবে কোথায়? সে তো তার পুরোনো স্বামীর হাত ধরে স্পার্টায় গিয়ে রানী হয়েছে!

চোখ নামালেন স্লীম্যান।

মৃদু হাসলেন।

না, হেলেন আছে সেখানেই, যেখানে আছে প্যারিস—আর কোথাও না।